জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্ঞান : ন্যায়মত সমীক্ষা

গবেষক

প্রসেনজিৎ বেরা

পিএইচ.ডি.(আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

তত্ত্ববধায়িকা

অধ্যাপিকা ডঃ রত্না দত্ত শর্মা

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা

২০২২

<u>Certified that the Thesis entitled</u>

জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্ঞান : ন্যায়মত সমীক্ষা submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of **Prof. Ratna Dutta Sharma** And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the Supervisor:
Dated:

Candidate:
Dated:

প্রস্তাবনা

আমার গবেষণার বিষয় হল 'জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্ঞান : ন্যায়মত সমীক্ষা' । এই গবেষণা কার্য সম্পন্ন করার জন্য আমি যাঁদের কাছে সর্বতোভাবে ঋণী তাঁরা হলেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকা । ছোট বেলার সেই স্কুল জীবন থেকে অদ্যাবধি, সেই বর্ণপরিচয় থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দর্শন' বিভাগে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তা সম্বন্ধে স্নাতক স্নাতকোত্তর সম্পন্ন, সবই তাঁদের অনুগ্রহে । সেই সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষিকার নাম নেওয়া সম্ভব নয় । তাঁদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম । তাঁদের মধ্যে পরম শ্রদ্ধেয় হারাধণ খাঁড়া, অধ্যাপক গঙ্গাধর কর, অধ্যাপক রঘুনাথ ঘোষ, অধ্যাপক গোপিনাথ মণ্ডল, অধ্যাপক দীপায়ন পট্টনায়ক, অধ্যাপিকা মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমানে দর্শন বিভাগীয় প্রধানা অধ্যাপিকা অপরাজিতা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অন্যতম ।

দর্শন বিষয়টি ছিল আমার কাছে বিশেষ পছন্দের । আর সেই দার্শনিক আলোচনার অন্যতম সেরা পীঠস্থান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দর্শন' বিভাগ । এই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক থেকে স্নাতকোত্তর অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের সহযোগিতায় ভারতীয় ও পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে প্রবেশ করি । তবে প্রথম থেকেই আমার আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিল ভারতীয় দর্শন বিশেষতঃ ভারতীয় জ্ঞানতত্ত্ব । পরবর্তীকালে তাই ন্যায়দর্শন- কে বিশেষ পত্র হিসাবে নির্বাচন করি । এই সময়েই অধ্যাপিকা রত্না দত্ত শর্মা, অধ্যাপক গঙ্গাধর কর, দীপায়ন পট্টনায়ক, গোপিনাথ মণ্ডল প্রমুখরা আমার পরিচয় ঘটান ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির আপন আপন যুক্তি-প্রতিযুক্তির গভীরতা ও সূক্ষতার সঙ্গে । তাঁরাই ন্যায়ের জটীল গ্রন্থ গুলির বিষয় বস্তুকে আমার মনোগ্রাহী ও মনোযোগী করে তুলেছিলেন সস্নেহ ভালোবাসা দিয়ে । এই সময়েই জ্ঞানের জ্ঞান প্রসঙ্গে দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে ভিন্নতা, সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বিচার সেগুলি সম্বন্ধে আমার মনে বিশেষ ভাবে অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি করেন আমার এই গবেষণা পত্রের তত্ত্বাবধায়িকা, অধ্যাপিকা রত্না দত্ত শর্মা মহাশয়া । তাঁর অনুপ্রেরণাতেই এম. ফিলে. গবেষণা নিবন্ধ হিসাবে 'ন্যায় দর্শনে অনুব্যবসায়'কে নির্বাচন । কিন্তু সময়ের সীমাবদ্ধতায় এম. ফিলে. সেভাবে আলোচনাটি বিস্তারিত করা সম্ভব হয়নি । এই গবেষণা প্রবন্ধটি জ্ঞানের জ্ঞান সংক্রান্ত পরবর্তী আলোচনাগুলির সংযোজন ।

এই গবেষণা নিবন্ধ সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আমি সম্মানীয়া প্রফেসর রত্না দত্ত শর্মার কাছে সর্বতোভাবে ঋণী। জ্ঞানের জ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণায় যতবারই ব্যর্থ হয়েছি, নিরুৎসাহিত হয়েছি ততবারই তাঁরই উৎসাহ ও পরামর্শে নতুন উদ্যমে এগোতে পেরেছি । তাঁর কাছে আমার ঋণ শোধ হওয়ার নয় । পুত্র স্নেহে তাঁর সহযোগিতা,

অনুপ্রেরণা এবং অনুগ্রহেই এরূপ একটি গুরু গম্ভীর আলোচনায় গবেষণা করা । এই গবেষণা নিবন্ধ সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে আমি সর্বতোভাবে ওনার কাছে ঋণী ।

পঠন-পাঠন, প্রবন্ধের উৎকর্ষ সবই অসম্পূর্ণ থেকে যায় যদি না উপযুক্ত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাদি যথা সময়ে পাওয়া যায় । আর সেই অভাব পূরণে সর্বোতভাবে সাহায্য পেয়েছি বিভাগীয় গ্রন্থাগারিক বিদ্যুৎদার কাছ থেকে । তাছাড়াও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, এসিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, সংস্কৃত সাহিত্য ভবন প্রভৃতি থেকে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা যথা সময়ে পেয়েছি । তাই অন্তর স্থল থেকে বিদ্যুৎদা ও এই সমস্ত গ্রন্থাগারকে আমার কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই ।

ধন্যবাদ জানাই সেই সমস্ত দাদা-দিদি ও সুহৃদবর্গকে যাঁরা গবেষণাকার্য চলাকালীন নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছে । বিশেষতঃ দিবাকর দা, আকতার দা, প্রভাকর দা, ভূতনাথ দা, অনিরুদ্ধ দা গবেষণা নিবন্ধটি সমাপ্ত করতে আমাকে সর্বদাই প্রেরণা দান করেছে । আমার গবেষণা প্রবন্ধটি সংশোধন করে সহায়তা করেছে দেবশ্রী খাঁড়া । তাকেও আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই ।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই অঘোরকামিনি প্রকাশচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পরমার্থ ঘোষ মহাশয় ও আমার সহকর্মীদের, বিশেষতঃ বিভাস দা, সুব্রত দা, জেসমিন দি, যাঁরা কলেজের একাধিক কাজ থেকে আমাকে অব্যাহতি দিয়ে আমার গবেষণার কাজটিকে তরান্বিত করেছে । তাঁদের অবদানও ভোলার মত নয় ।

পরিশেষে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই পিতা-মাতা, জেঠু-জেঠিমার চরণে, যাঁরা হয়তো নিজেরা সেভাবে উচ্চ শিক্ষার গণ্ডী পার করেননি এবং বোঝেনও না গবেষণার অর্থ কিংবা তাৎপর্য। কিন্তু তাঁদের স্নেহ ও আশীর্বাদ ছাড়া আমার পক্ষে এতদূর আসা কখনোই সম্ভব হত না । তাঁদের পদ কমলে আমার শতকোটি প্রণাম । একই সঙ্গে প্রণাম জানাই আমার পিতৃ ও মাতৃ তুল্য শ্রদ্ধেয় সন্তোষ কুমার মণ্ডল ও স্বর্গীয়া সন্ধ্যা মণ্ডলকে । যাদবপুরে থাকাকালীন ওনারাই আমাকে ওনাদের ঘরে থেকে পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছেন, সর্বদা উৎসাহ দিয়েছেন গবেষণার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে । আজ কাকিমা আর আমাদের মধ্যে নেই । পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থণা করি ওনার আত্মা যেখানেই থাকুন, সুখী থাকুন ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২২ — প্রসেনজিৎ বেরা

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা : ১

প্রথম অধ্যায় : ৯

জ্ঞানের স্বরূপ

দ্বিতীয় অধ্যায় : ৫৬

জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ে মতভেদ

তৃতীয় অধ্যায় : ১০২

জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ে ন্যায়মত

চতুর্থ অধ্যায় : ১৫০

জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ে বিরোধী মতের খণ্ডন

সিদ্ধান্ত : ১৮২

গ্রন্থপঞ্জী : ১৯১

ভূমিকা

ভারতীয় প্রমাণশাস্ত্রে জ্ঞান সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হয়েছে । এই প্রমাণশাস্ত্রে আলোচিত বিষয়ের মধ্যে– জ্ঞানের স্বরূপ তথা লক্ষণ, জ্ঞানের যথার্থতার মানদণ্ড নির্ণয়, যথার্থ জ্ঞান প্রমা পদবাচ্য হতে পারে কিনা বিচার, প্রামাণ্য নিরূপণের উপায় নির্দেশ, জ্ঞাননিষ্ঠ প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যের হেতু নির্ণয়, প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যের গ্রহণ ইত্যাদি অন্তর্গত । প্রমাণশাস্ত্রের সেই সমস্ত আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে জ্ঞান । মূলতঃ ন্যায় সম্মত জ্ঞানের জ্ঞান আলোচনাই এই গবেষণা প্রবন্ধের মুখ্য উপজীব্য । কিন্তু জ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা ব্যতিরেকে জ্ঞানের জ্ঞান সংক্রান্ত কোন আলোচনা সম্ভব নয় । কেননা জ্ঞানের জ্ঞানও স্বরূপতঃ জ্ঞান । কাজেই ন্যায় সম্মত জ্ঞানের জ্ঞান আলোচনার জন্য ন্যায় দর্শনে স্বীকৃত জ্ঞানের স্বরূপ আলোচনাও প্রয়োজন । ন্যায় সম্মত জ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা পূর্বক জ্ঞানের জ্ঞান সংক্রান্ত ন্যায়মত সবিচার পর্যালোচনা এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য হওয়ায় এই প্রবন্ধের নামকরণ করা হয়েছে **জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্ঞান : ন্যায়মত সমীক্ষা** ।

জ্ঞানই হল একমাত্র মাধ্যম যার দ্বারা কোন বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়। আবার জ্ঞানই কোন বিষয় ব্যবহারের জনক । 'ব্যবহার' শব্দটির আবার নানার্থ বহন করে । 'ব্যবহার' শব্দের দ্বারা অভিজ্ঞা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অভিলাপ বা জ্ঞানের অভিধায়ক শব্দপ্রয়োগ, হান ও উপাদান এবং অর্থক্রিয়া অর্থাৎ কার্য প্রভৃতিকে বোঝানো হয় । সুতরাং যে জ্ঞান জন্য আমাদের এরূপ বহুবিধ ব্যবহার সম্ভব হয় সেই জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে নৈয়ায়িকদের মত কী ? তাঁরা জ্ঞানের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্যের কথা বলেন– সেই দিকগুলি আলোকপাত করা আবশ্যক । কিন্তু সেই জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য বা স্বরূপ

বিষয়ে আবার দার্শনিক সমাজে মতবিরোধ বিস্তর । সেই সব মতবিরোধের মধ্যে ন্যায় সম্মত জ্ঞানের স্বরূপই মূল আলোচ্য । তবে যেহেতু এই বিষয়ে ভিন্ন মতেরও অবকাশ আছে সেহেতু সেই সমস্ত মতবাদ ও তাদের খণ্ডন অতি সংক্ষেপে আলোচিত হবে **জ্ঞানের স্বরূপ** শীর্ষক অধ্যায়ে ।

নৈয়ায়িক সম্মত জ্ঞানের স্বরূপ প্রসঙ্গে যেটি সর্বাগ্রে আলোচনা করা প্রয়োজন সেটি হল তাঁদের মতে, জ্ঞানের কী ? অর্থাৎ তাঁদের মতে, জ্ঞান স্বরূপতঃ দ্রব্য, গুণ নাকি কর্ম ? যদি বলা হয় জ্ঞান গুণ তাহলে জ্ঞানকে কেন গুণ পদার্থ বলা হবে এবং তার সাধক যুক্তি কী ?– সেই আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ । শুধু তাই নয় সেই সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে জ্ঞানকে ক্রিয়া কিংবা দ্রব্যরূপে স্বীকার করার অসুবিধা কোথায় ?– সেই প্রশ্নের আলোচনাও প্রয়োজন । কিন্তু জ্ঞানকে গুণ পদার্থ বলার সঙ্গে এই বিষয়টিও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যে, গুণ পদার্থ মাত্রই অন্যাশ্রিত । গুণ কখনই দ্রব্যকে আশ্রয় না করে থাকতে পারে না । কাজেই গুণস্বরূপ জ্ঞানও কোন না কোন দ্রব্যাশ্রিত। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে গুণস্বরূপ জ্ঞানের আশ্রয়রূপে ন্যায় দর্শনে স্বীকৃত নবম দ্রব্যের মধ্যে কোনটি স্বীকার্য ? অন্যান্য দ্রব্যেগুলিই বা জ্ঞানের আশ্রয় নয় কেন ? সেই সংক্রান্ত আলোচনাও গুরুত্বপূর্ণ ।

জ্ঞান মাত্রই কী জন্য; নাকি নিত্য জ্ঞানের কথাও স্বীকার করবেন নৈয়ায়িকগণ । যদি জ্ঞান জন্য বা অনিত্য হয় তাহলে সেই জ্ঞানের স্থায়িত্ব কতক্ষণ ? শুধু তাই নয় জ্ঞান যদি বিনাশশীল হয় তাহলে তার বিনাশের হেতুই বা কী ? অন্যদিকে জ্ঞানকে নিত্য বলা হলে সেই নিত্য জ্ঞানের স্বরূপ কীরূপ ?– সেই সব বিষয়ে আলোকপাত করা প্রয়োজন ।

জন্য জ্ঞান মাত্রই কী কোন না কোন বিষয়কে অবলম্বন করে উৎপন্ন হয় ? অর্থাৎ জ্ঞান মাত্রই কী সবিষয়ক ? যদি তা স্বীকার করা হয় হয় তাহলে সবিষয়ক বলতে ঠিক কী অর্থ নির্দেশ করা হয়েছে ? জ্ঞান সবিষয়ক বললে প্রশ্ন থেকে যায় জ্ঞান নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত কিনা ? জ্ঞান বিষয় নিরপেক্ষ উৎপন্ন হতে পারে না কিন্তু বিষয়ও কী জ্ঞান সাপেক্ষ ? যদি বিষয় জ্ঞান সাপেক্ষ হয় তাহলে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে তফাৎ কীভাবে করা যায় ? শুধু তাই নয় প্রশ্ন ওঠে এই বিষয় প্রকাশক জ্ঞানের নিজস্ব কী কোন আকার আছে, নাকি তা বিষয়ের আকারেই আকারিত ? অর্থাৎ জ্ঞান সাকার নাকি নিরাকার ? জ্ঞান সাকার কিংবা নিরাকার যেরূপেই স্বীকার করা হোক্ না কেন নিজ মতের পক্ষে যুক্তি যেমন প্রয়োজন তেমনি অন্য পক্ষ অস্বীকারের হেতু নির্দেশও আবশ্যক । **জ্ঞানের স্বরূপ** শীর্ষক অধ্যায়ে পূর্বোক্ত বিভিন্ন প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর ও নৈয়ায়িক স্বীকৃত জ্ঞানের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ।

জ্ঞান যদি সবিষয়ক হয় তাহলে প্রশ্ন হবে বাহ্য বিষয় যে অর্থে জ্ঞানের বিষয় হয় আন্তর বিষয়ও কী সেই অর্থে জ্ঞানের বিষয় হয় ? অর্থাৎ ঘট-পটাদি বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান এবং জ্ঞানের জ্ঞান উভয়ের মধ্যে কী কোন সামঞ্জস্য আছে ? জ্ঞান ঘট-পটাদি বিষয়ের ন্যায় জ্ঞানের দ্বারা একই অর্থে প্রকাশিত হয় কিনা, সেই বিষয়ক আলোচনার পূর্বে যে বিষয়টির আলোচনা সর্বাগ্রে প্রয়োজন সেটি হল জ্ঞানের জ্ঞান সংক্রান্ত এই সমস্ত আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা কোথায় ? কারণ জ্ঞানের প্রয়োজন ব্যবহারেই । আর এই ব্যবহার মূলতঃ ঘট-পটাদি বস্তু ব্যবহার । জ্ঞানের দ্বারাই সেই সব বস্তুর প্রতিপত্তি হয়, তাদের হেয়ত্ব, উপাদেয়ত্ব বোধ হয়, তদানুযায়ী বস্তুর প্রতি জিহাসা, ঈপ্সা প্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি ঘটে । সেই প্রবৃত্তি সফল হোক্ অথবা ব্যর্থ হোক্, জ্ঞানই যে তার হেতু

হয়- তা অস্বীকার করারও উপায় থাকে না । কাজেই প্রশ্ন উঠতে পারে বস্তু ব্যবহারে জ্ঞান আবশ্যক হলেও জ্ঞানের জ্ঞান স্বীকার করার প্রয়োজন কোথায় ?

জ্ঞানের জ্ঞান বা জ্ঞানের গ্রহণ সংক্রান্ত আলোচনা যে গুরুত্বহীন বিষয় নয় তা আমরা আমাদের ব্যবহার লক্ষ্য করলেই দেখতে পাব । কারণ দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে শুধু বস্তু ব্যবহার করি তা নয়, জ্ঞানেরও ব্যবহার করি । স্মৃতিচারণ, কল্পনা প্রভৃতির মতো একান্তই ব্যক্তিগত মানস ক্রিয়ার কথা বাদ দিলেও আলোচনা, উপদেশ, শিক্ষাদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে জ্ঞানের ব্যবহার যে হয়ে থাকে তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না । ব্যবহারেই 'আমি বিষয়টিকে জানি' কিংবা 'আমি জানি যে, আমি বিষয়টি জানি' এইরূপ জ্ঞান লক্ষ্য করা যায় । বস্তুর গ্রহণ ছাড়া তার ব্যবহার যেমন সম্ভব নয় তেমনি জ্ঞানের গ্রহণ ছাড়া জ্ঞানের ব্যবহারও অসম্ভব । তাছাড়া বস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাফল্যই সকলের কাঙ্ক্ষিত । আর সেই সাফল্য লাভের চাবিকাঠি হল প্রবৃত্তি জনক জ্ঞানের প্রমাত্ব । জনক জ্ঞানটি প্রমা না হলে প্রবৃত্তি সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না । লব্ধ জ্ঞানের প্রামাণ্য নিশ্চয় তাই ব্যবহর্তার অভিলষিত । জ্ঞানের এই প্রামাণ্য নিশ্চয়ও কিন্তু জ্ঞান গ্রহণের অপেক্ষা রাখে । জ্ঞানের গ্রহণ ছাড়া সেই জ্ঞানের প্রামাণ্য নিরূপণ সম্ভব নয় । জ্ঞানের জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনাকে তাই জ্ঞানের প্রামাণ্য সংক্রান্ত আলোচনার পূর্ববর্তী বলা হয়ে থাকে । কাজে কাজেই জ্ঞানের গ্রহণ বিষয়ক আলোচনাটি খুবই প্রাসঙ্গিক ।

জ্ঞানের গ্রহণ বা প্রকাশ হয় জ্ঞানের দ্বারা । কিন্তু প্রশ্ন ওঠে সেই জ্ঞান নিজ ভিন্ন অপর জ্ঞানের বিষয় হয় নাকি নিজেই নিজের প্রকাশক হয় ? নির্দিষ্ট কারণ সামগ্রীর দ্বারা কোনও বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির পর সেই জ্ঞানের দ্বারা ঐ নির্দিষ্ট বিষয়টি জ্ঞাতার

কাছে প্রকাশিত হয় । কিন্তু মূল প্রশ্নটি হল যে জ্ঞানের দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ হয় বিষয় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্ঞানটিও জ্ঞাতার কাছে প্রকাশিত হয় কিনা ? কিংবা জ্ঞাতা বিষয়কে জানার সঙ্গে সঙ্গে 'ঐ বিষয়ে তার জ্ঞান আছে'– সেটিও জানে কিনা ? যাঁরা বলেন জ্ঞান নিজেই নিজের প্রকাশক তাঁদের মত পরিচিত স্বপ্রকাশবাদ নামে । অন্যদিকে যাঁরা বলেন বিষয় প্রকাশক জ্ঞান, নিজ ভিন্ন জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাঁদের মত পরিচিত পরতঃপ্রকাশবাদ নামে । তবে স্বপ্রকাশবাদ কিংবা পরতঃপ্রকাশবাদের সমর্থকরূপে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলিকে দ্বিবিধ বিভাজন করার পরেও এই প্রশ্ন থেকে যায় যে, স্বপ্রকাশবাদী মাত্রেই কী সর্ববিষয়ে কোন অভিন্ন মত পোষণ করেন নাকি তাঁদের নিজ নিজ অভিমত ভিন্ন ? একই কথা প্রযোজ্য পরতঃপ্রকাবাদীদের ক্ষেত্রেও । যদি তাঁদের মত ভিন্ন বলে স্বীকার করা হয় তাহলে প্রশ্ন হয় তাঁদের জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ক মতের ভিন্নতার পশ্চাতে কী তাঁদের জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ক মত কোন ভাবে দায়ী ? অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ক মত তাঁদের স্বীকৃত জ্ঞানের স্বরূপ দ্বারা কোন ভাবে প্রভাবিত হয় কী ?- সেই বিষয়ক আলোচনার অবকাশ থেকে যায় । ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সাধারণতঃ স্বপ্রকাশবাদের সমর্থক রূপে খ্যাত বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, বেদান্ত, প্রাভাকর মীমাংসক প্রমুখ সম্প্রদায়ের মত এবং পরতঃপ্রকাশবাদের সমর্থক বলে পরিচিত ভাট্ট মীমাংসক ও মিশ্র সম্প্রদায়ের নিজ নিজ অভিমত সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে **জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ে মতভেদ** শীর্ষক অধ্যায়ে ।

জ্ঞানের প্রকাশ বিষয়ক নৈয়ায়িকদের মত আলোচনাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। কাজেই জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ে ন্যায় মতটি কী তা আলোচনা করা প্রয়োজন । নৈয়ায়িক মতে, বিষয় প্রকাশক জ্ঞান নিজ ভিন্ন বিষয়ের প্রকাশক হতে পারে । অর্থাৎ উৎপন্ন জ্ঞান, নিজেই নিজের বিষয় হতে পারে না, নিজ ভিন্ন জ্ঞানের বিষয় হতে পারে।

কাজেই জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ক নৈয়ায়িকদের মত যে পরতঃপ্রকাশবাদকেই সমর্থন করে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না । কিন্তু প্রশ্ন হল তাঁদের এরূপ স্বীকার করার কারণ কী ? অর্থাৎ জ্ঞানকে নৈয়ায়িকগণ পরতঃপ্রকাশ বলার পশ্চাতে হেতু কী ? জ্ঞান প্রকাশক এই জ্ঞানের প্রকৃতিই বা কীরূপ ?

জ্ঞানের প্রকাশক জ্ঞানের স্বরূপ কী ? জ্ঞানটি প্রত্যক্ষ নাকি অনুমান ? যদি প্রত্যক্ষ বলা হয় তাহলে সেটি কোন্ ধরণের প্রত্যক্ষ ? তাকে বাহ্য প্রত্যক্ষ বলা যাবে নাকি মানস প্রত্যক্ষ ? জ্ঞানের প্রকাশক এই জ্ঞানকে মানস প্রত্যক্ষ বলা হলে এই প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, এই প্রত্যক্ষকে মানস বলার কারণ কী ? জ্ঞান গ্রাহকরূপে এই অনুব্যবসায়রূপ মানসপ্রত্যক্ষ স্বীকারের পশ্চাতে কারণগুলিই বা কী কী ? অন্যভাবে বললে এই অনুব্যবসায় স্বীকার পক্ষে নৈয়ায়িক পক্ষ থেকে কোন্ কোন্ যুক্তির উপস্থাপনা করা যায়?- তা আলোচনা করা আবশ্যক ।

সমস্ত জ্ঞান কিংবা সমস্ত ব্যবসায়রেই কী অনুব্যবসায় হয় ? যদি জ্ঞান মাত্রের অনুব্যবসায় স্বীকার না করা হয় তাহলে প্রশ্ন হয় অনুব্যবসায়গম্য হওয়ার জন্য জ্ঞানকে কোন্ আবশ্যিক শর্ত পূরণ করতে হয় ? সেই আবশ্যিক শর্ত পূরণ করলেও প্রশ্ন থেকে যায়, জ্ঞানের উৎপত্তির কতক্ষণ পরে অনুব্যবসায় হয় ? এই বিষয়ে কী কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম আছে ? সেই নিয়ম সংক্রান্ত অর্থাৎ ব্যবসায় ও অনুব্যবসায় উৎপত্তির কাল বিষয়ক আলোচনাটিও ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে ।

অনুব্যবসায় ব্যবসায়ের অনন্তর উৎপন্ন হয় । কিন্তু প্রশ্ন হল অনুব্যবসায়ে বিষয় কী ? কেবল ব্যবসায় অনুব্যবসায়ের বিষয় হয় নাকি সেই ব্যবসায়ের বিষয়কেও অনুব্যবসায়ের বিষয়রূপে স্বীকার করেন ? যদি ব্যবসায়ের বিষয়কেও স্বীকার করা হয়

তাহলে প্রশ্ন হয় ব্যবসায়ের বিষয়টা কীভাবে অনুব্যবসায়ে ভাসমান হয় ? অনুব্যবসায় ও ব্যবসায়ের বিষয় উল্লেখপূর্বক উভয় প্রকার জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যের দিকটিও আলোচিত হবে এই অধ্যায়ে ।

অনুব্যবসায়ের কাজ কী ? অনুব্যবসায় কী কেবল পূর্ববর্তী জ্ঞানটি হয়েছে সেটি জানায় নাকি পূর্ববর্তী জ্ঞানের স্বরূপ অবগত করে ? পূর্ববর্তী জ্ঞান বিষয়ে যা অবগত করে তা কী প্রমা পদবাচ্য নাকি সেটি ভ্রমও হতে পারে ? এখন পূর্ববর্তী জ্ঞানটি যেমন প্রমাত্মক হতে পারে তেমনি ভ্রমাত্মকও হতে পারে । ফলে সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে ভ্রমাত্মক জ্ঞানের অনুব্যবসায় কি ভ্রমাত্মক হবে, নাকি প্রমাত্মক হবে ? প্রমাত্মক কি ভ্রমাত্মক, জ্ঞান মাত্রের অনুব্যবসায় যদি প্রমাত্মক হয় তাহলে অনুব্যবসায়ের প্রমাত্ব বা প্রামাণ্য স্বতঃ একথা স্বীকার করতে হবে । এইরূপে অনুব্যবসায়ের ভ্রমের সম্ভাবনা যদি স্বীকার না করা যায় তবে কী নৈয়ায়িক সম্মত পরতঃপ্রামাণ্যের সঙ্গে তার কোনরূপ বিরোধের সম্ভাবনা থেকে যায় ? আর অনুব্যবসায় ভ্রমাত্মক হতে পারে একথা বলা হলে অনুব্যবসায় দ্বারা নির্ণীত পূর্ববর্তী জ্ঞানের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি বিষয়েও সংশয় দেখা দিতে পারে । কেননা সেক্ষেত্রে অনুব্যবসায় অযথার্থ বা ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় অনুব্যবসায় দ্বারা নির্ণীত জ্ঞানের উৎপত্তি ও প্রকৃতি বিষয়ে জ্ঞান যথার্থই হবে একথা বলা যাবে না । এরূপ সমস্যার সমাধান নৈয়ায়িকগণ কীভাবে করবেন ? এছাড়াও অনুব্যবসায় সংক্রান্ত পূর্বপক্ষীদের বিবিধ আপত্তি ও ন্যায় পক্ষ থেকে সেগুলির সম্ভাব্য সমাধান আলোচিত হবে **জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ে ন্যায়মত** শীর্ষক অধ্যায়ে ।

জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ে ন্যায় মতের অনুসন্ধানই আমার মূল উদ্দেশ্য, কিন্তু নিজ মত প্রতিষ্ঠার জন্য সাধক প্রমাণের উপস্থাপনাই যথেষ্ট নয় বিরোধী মতের নিরসনও

সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ । কাজেই নৈয়ায়িক সম্মত অনুব্যবসায়ের আলোচনার পাশাপাশি বিরোধী মতগুলির খণ্ডনও আবশ্যক । এখন বিবেচ্য ন্যায় মতে পূর্বপক্ষী কারা ? পরতঃপ্রকাশবাদী নৈয়ায়িকদের মত স্বপ্রকাশবাদীদের মত অপেক্ষা যেমন পৃথক্ তেমনি পরতঃপ্রকাশবাদের সমর্থক অন্যান্য মত থেকেও স্বতন্ত্র । সেই দিক থেকে স্বপ্রকাশবাদের পাশাপাশি অন্যান্য পরতঃপ্রকাশ বাদীরাও ন্যায়ের অন্যতম প্রতিপক্ষ । কিন্তু গবেষণা নিবন্ধের বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমস্ত পূর্বপক্ষের যথাযোগ্য আলোচনা মন্দবুদ্ধি আমার পক্ষে সম্ভব নয় । আবার একই গবেষণা পত্রে পূর্বোক্ত সব সম্প্রদায়ের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করলে সব সম্প্রদায়ের প্রতি যথাযোগ্য বিচার কিংবা গুরুত্ব দেওয়া আমার সীমিত ক্ষমতায় সম্ভব নয় । তাই আলোচনার সুবিধার্থে পূর্বপক্ষরূপে মূলতঃ পরতঃপ্রকাশবাদের সমর্থক কুমারিল ভট্টের মত ও স্বপ্রকাশবাদের সমর্থক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ মতকেই গ্রহণ করা হবে । কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ হিসাবে ভাট্ট মীমাংসক মত ও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ মতকেই পূর্বপক্ষরূপে কেন গ্রহণ করা হচ্ছে ?- তার কারণ নির্দেশ করা প্রয়োজন । অন্যদিকে পরপ্রকাশবাদী মিশ্র মত কিংবা স্বপ্রকাশবাদী প্রভাকর, শঙ্করাচার্য প্রভৃতির মতকে কেন পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করা হচ্ছে না সেই বিষয়ও আলোচনার দাবী রাখে । পরতঃপ্রকাশবাদী নৈয়ায়িকের প্রতিপক্ষ হিসাবে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ ও ভাট্ট মতবাদ বিশেষের খণ্ডন এই গবেষণা নিবন্ধের **জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ে বিরোধী মতের খণ্ডন** শীর্ষক পরিচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।

এরূপ বহুবিধ আলোচনার পরেও যে প্রশ্নটি থেকে যায় সেটি হল জ্ঞানের জ্ঞান আলোচনায় ন্যায় দর্শনে অনুব্যবসায়ের আলোচনা কেন গুরুত্বপূর্ণ ? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মাধ্যমেই এই গবেষণামূলক এই নিবন্ধটি সমাপ্ত হয়েছে ।

জ্ঞানের স্বরূপ

জ্ঞানের প্রকাশ বা জ্ঞানের জ্ঞান হল জ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান । নৈয়ায়িক মতে জ্ঞানের জ্ঞান তাই জ্ঞানকে বিষয়রূপে অপেক্ষা করে । আবার জ্ঞানের জ্ঞানও স্বরূপতঃ এক প্রকারের জ্ঞান । কাজেই জ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা না করলে জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ক আলোচনা সম্ভব না । সুতরাং জ্ঞান স্বরূপ বা জ্ঞান কী– সেই বিষয়ক আলোচনা আবশ্যক । ন্যায়দর্শন সম্মত জ্ঞানের স্বরূপ মূল আলোচ্য হলেও যেহেতু এই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতেরও অবকাশ আছে সেহেতু সেই সমস্ত মতগুলিও জ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচ্য ।

জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে দার্শনিক সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কোন একটি অভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায় না । তাঁদের মধ্যে কেউ বলেন জ্ঞান গুণ পদার্থ, কেউ বা বলেন জ্ঞান ক্রিয়া, আবার কারো মতে জ্ঞান দ্রব্য । যেমন- কোনো কোনো দার্শনিকের মতে, কোনো বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির অনন্তর ‘আমি বিষয়টিকে জানলাম’, বা ‘আমাতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে’– এইরূপ বাক্য ব্যবহারই বুঝিয়ে দেয় জ্ঞান এক ধরণের জন্য গুণ পদার্থ । উক্ত বাক্য ব্যবহারের মূলে আমাদের উদ্দেশ্য থাকে এটাই বোঝানো যে, বিষয় বা বস্তুটির সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থার মধ্যে ‘আমি’ অর্থাৎ আত্মায় কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । ‘আমি’ অর্থাৎ দেহাদি সংঘাত অতিরিক্ত আত্মায় এক বিশেষ গুণের সমাবেশের দরুণই ঐরূপ পরিবর্তন অনুভূত হয় যা উক্ত বাক্য ব্যবহারের হেতু হয় । কিন্তু এই অর্থে আত্মা সর্বজন সিদ্ধ নয় । নৈয়ায়িক মতে জ্ঞান এরূপ আত্মার গুণরূপেই বিবেচিত । কাজেই তাঁদের মতে, জ্ঞান হল আত্মবৃত্তি গুণ পদার্থ । জ্ঞান দুই প্রকার হতে পারে নিত্য জ্ঞান ও জন্য জ্ঞান। যেমন ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য কিন্তু

জীবের জ্ঞান অনিত্য । আমরা জ্ঞানের আলোচনায় মূলতঃ জন্য জ্ঞানের আলোচনাতেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখব । কোনো বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পর আমরা ‘আমি জানি’ এইরূপেই বাক্য ব্যবহার করি । আবার কোন বস্তু বিষয়ে আমার জ্ঞানাভাব আছে একথা বোঝানোর জন্য ‘আমি বিষয়টি জানি না’ এরূপ বাক্য ব্যবহার করি । সেই বিষয়টিকেই আবার যখন জানতে পারি তখন ‘আমি বিষয়টিকে জানি’ এরূপ বাক্য ব্যবহার করি । সুতরাং আমি কোন সময়ে যে বিষয়টা জানতাম না অন্য সময়ে তা জানতে পেরেছি । অর্থাৎ জ্ঞানটা পূর্বে না থাকলেও পরে উৎপন্ন হয়েছে । সুতরাং ঐ জ্ঞানটা, তাঁদের মতে, জন্য বা উৎপন্ন । আমি অনেক সময় একথাও বলি যে ‘বস্তুটি অনেক দূরবর্তী তাই আমি তাকে জানি না’ । এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় বস্তুটি থাকলেও আমি তাকে জানি না । সুতরাং তাঁদের মতে, এই জ্ঞান জীবাত্মার আগন্তুক গুণ ।

‘আমি খাই’, ‘আমি করি’ প্রভৃতি বাক্যে খাওয়া, করা প্রভৃতি যেরূপ ক্রিয়াকে নির্দেশ করে ‘জানি’ বা জানা পদটিও সেইরূপ এক প্রকার ক্রিয়ার বাচক বা নির্দেশক মনে করেন কেউ কেউ । জ্ঞান তাই তাঁদের কাছে গুণ নয়, ক্রিয়াই । আবার কেউ কেউ জ্ঞানকে দ্রব্যরূপেও স্বীকার করেছেন । এখানে মূলতঃ ন্যায় সম্মত জ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা করা হবে । সেক্ষেত্রে তার পূর্বে জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞানকে যাঁরা ক্রিয়া বলে স্বীকার করেন কিংবা দ্রব্য বলে স্বীকার করেন তাঁদের পক্ষ ন্যায় দর্শনের দিক থেকে কিভাবে খণ্ডন করা যায় তাই দেখার চেষ্টা করতে হবে । কিন্তু উক্ত মতদ্বয় খণ্ডনের পূর্বে তাদের নিজ নিজ পক্ষসাধক যুক্তির অনুসন্ধানও প্রয়োজন ।

প্রথমে আসা যাক্ 'জ্ঞান হল একধরণের ক্রিয়া'– এই পক্ষের আলোচনায় ।[১] জ্ঞানকে ক্রিয়া বলে স্বীকার করেন মীমাংসক কুমারিল ভট্ট । জ্ঞানকে ক্রিয়া বলার পক্ষে তাঁর যুক্তিগুলি লক্ষণীয় । কুমারিলের মতে 'জ্ঞান' শব্দটি 'জ্ঞা' ধাতু থেকে নিঃসৃত । পাণিনীর নিয়মানুসারে 'ধাত্যর্থং ক্রিয়াপদম্'– অর্থাৎ ধাতুর অর্থ মাত্রই ক্রিয়াপদ । একই নিয়মানুসারে 'জ্ঞা' ধাতুর অর্থ জ্ঞানও ক্রিয়াপদ । কেননা 'জ্ঞান' পদের ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম লঙ্ঘনের কোন বিশেষ হেতু নেই । কিন্তু জ্ঞান ক্রিয়া হলে গমনাদি ক্রিয়ার ন্যায় জ্ঞান অপ্রত্যক্ষযোগ্য হবে । যেহেতু ক্রিয়া মাত্রই অপ্রত্যক্ষযোগ্য । কিন্তু জ্ঞান অপ্রত্যক্ষযোগ্য হলে জ্ঞান হয়েছে কি না– সেই বিষয়ে অবহিত হওয়া কীরূপে সম্ভব হবে ?

কুমারিল ভট্ট ও তাঁর অনুগামীদের মতে, জ্ঞান ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ সম্ভব নয় তবে জ্ঞানকে আমরা অনুমান করতে পারি ।[২] পাক, গমনাদি ক্রিয়া যেরূপ ফলের দ্বারা অনুমিত হয়, জ্ঞান ক্রিয়াও তেমনি বিষয়গত ফলের দ্বারা অনুমিত হয় । অর্থাৎ জ্ঞানের গ্রাহক জ্ঞানকে তাঁরা অনুমান বলে স্বীকার করেন ।

মীমাংসক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কুমারিল ভট্টের ন্যায় জ্ঞানকে অপ্রত্যক্ষযোগ্য বলতে রাজী নন মীমাংসক প্রভাকর । প্রভাকর মতে, জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া মাত্রই গৃহীত হয়ে যায়, জ্ঞানের গ্রহণ বা প্রকাশের নিমিত্ত অন্য কোনো কিছুর অপেক্ষা করে না । অন্যদিকে ভাট্ট মতে, জ্ঞান মাত্রই ক্রিয়া এবং ক্রিয়া মাত্রই অপ্রত্যক্ষযোগ্য হওয়ায়, অনুমানের দ্বারা জ্ঞানের প্রকাশ বা গ্রহণ সম্ভব । ভাট্ট মতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে প্রভাকর পন্থীদের মূল যুক্তি হল, জ্ঞান জ্ঞাততা লিঙ্গক অনুমানগম্য নয় । তাঁদের মতে 'জ্ঞান' শব্দ ধাতুর অর্থ বা ক্রিয়া[৩] হলেও জ্ঞান ভিন্ন

ধাতুর অর্থ মাত্রই বা ক্রিয়া মাত্রই ফলানুমেয় হয় । জ্ঞান তাই অনুমানগ্রাহ্য নয়, স্বপ্রকাশ । তাঁদের মতে, যা অন্য বস্তুকে প্রকাশ করতে পারে তা নিজের প্রকাশে অক্ষম হতে পারে না । প্রদীপ যেরূপ ঘট-পটাদি বিষয় প্রকাশের সঙ্গে নিজের প্রকাশেও সক্ষম, প্রদীপের প্রকাশে প্রদীপান্তরের প্রয়োজন হয় না, জ্ঞানও ঠিক তেমনি বিষয় প্রকাশের সঙ্গে নিজের প্রকাশেও সক্ষম, জ্ঞানের প্রকাশে জ্ঞানান্তরের আবশ্যকতা থাকে না ।[৪]

যাঁরা সত্তার দ্বিত্ব কিংবা বহুত্ব স্বীকার করেন অর্থাৎ এই দৃশ্যমান জগতের মূলে অন্ততঃপক্ষে দ্বিবিধ সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, সেই দ্বিত্ব ও বহুত্ববাদীদের পক্ষে গুণ-গুণী কিংবা ক্রিয়া-ক্রিয়াবান্ রূপে যথাক্রমে জ্ঞান ও জ্ঞানবান্-কে ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব । কেননা জ্ঞানকে গুণ অথবা ক্রিয়া, যা বলেই স্বীকার করা যাক্ না কেন গুণ ভিন্ন গুণী, ক্রিয়া ভিন্ন ক্রিয়াবানের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় । যেহেতু গুণ ও গুণী, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবান্ অভিন্ন নয়, সেহেতু গুণ-গুণী, ক্রিয়া-ক্রিয়াবান্‌রূপে কোন কিছু ব্যাখ্যার জন্য কমপক্ষে দ্বিবিধ সত্তা স্বীকার করে নেওয়া আবশ্যক হয় । সত্তার দ্বিত্ব ও বহুত্ববাদীদের পক্ষে গুণ-গুণী কিংবা ক্রিয়া-ক্রিয়াবান্ রূপে যথাক্রমে জ্ঞান ও জ্ঞানবানের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হলেও সত্তার একত্ব বা অদ্বৈতবাদীর পক্ষে অর্থাৎ যারা কেবলমাত্র একটি বস্তুর সত্তাই স্বীকার করেন তাদের পক্ষে, জ্ঞানের উক্তরূপে ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয় । কেননা তাঁদের দর্শনে সত্তা এক ও অদ্বৈত । অদ্বৈত বৈদান্তে পরমার্থতঃ অর্থাৎ পারমার্থিক দিক থেকে তাই একমাত্র ব্রহ্মকেই সৎ পদার্থরূপে স্বীকার করেন । তাঁদের দর্শনে জ্ঞান যেমন সেই অদ্বৈতসত্তা তথা ব্রহ্মের গুণ হতে পারে না, তেমনি ক্রিয়াও হতে পারে না । জ্ঞানকে গুণ বললে গুণাশ্রয়রূপে গুণী, ক্রিয়া বললে কর্তারূপে ক্রিয়াবান্ কোন কিছু অবশ্যই মানতে হবে অর্থাৎ কিনা অন্তত দ্বিবিধ সত্তা মানতেই হবে । ফলতঃ জ্ঞানকে

গুণ কিংবা ক্রিয়ারূপে ব্যাখ্যা করলে তাতে অদ্বৈতবাদের হানি অনিবার্য । তাই তাঁরা জ্ঞানকে ব্রহ্ম স্বরূপ বা স্বরূপতঃ ব্রহ্মই এইরূপে ব্যাখ্যা করেন ।

বৌদ্ধ দর্শনেও জ্ঞানকে ক্রিয়া বলে স্বীকার করা হয় না । কেননা তাঁরা পূর্বাপর কালস্থায়ী কোন নিত্য আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না । জ্ঞানকে ক্রিয়া হতে গেলে জ্ঞানের পূর্বে, জ্ঞানোৎপত্তি কালে ও জ্ঞানের পরে এক অভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় । কিন্তু আত্মা, তাঁদের মতে, ক্ষণিক বিজ্ঞান প্রবাহমাত্র । সুতরাং তাঁরা জ্ঞানকে যখন স্বপ্রকাশ বলেন তখন জ্ঞান নিজেই নিজের কাছে প্রকাশিত হয় একথা মনে করেন । নিত্য আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করার ফলে তাঁরা জ্ঞানকে ক্রিয়া বলে স্বীকার করেন না । জ্ঞানকে ক্রিয়া বলে স্বীকার করেন না বলে প্রমাণ ও প্রমাণের ফলের মধ্যে পার্থক্যও করতে পারেন না । আবার প্রমাণ ও প্রমাণের ফলের মধ্যে পার্থক্য অস্বীকার করার অর্থ হল কারণ ও কার্যের মধ্যে পার্থক্য অস্বীকার করা । আমরা দেখতে পাই ধর্মকীর্তি তাঁর ‘ন্যায়বিন্দু’ গ্রন্থে প্রমাণ ও প্রমাণের ফলের মধ্যে ভেদ অস্বীকার করেছেন এবং ‘অবিসংবাদকং জ্ঞানং সম্যগ্‌জ্ঞানম্‌’ এইরূপে প্রমাণের লক্ষণ দিয়েছেন ।[৫] বস্তুতঃ অবিসংবাদক জ্ঞানকে প্রমাণ বলায় এটি প্রমারও লক্ষণরূপেও পরিগণিত হতে পারে । সুতরাং তাঁদের মতে, প্রমা ও প্রমাণের লক্ষণ অভিন্ন । জ্ঞানকে ক্রিয়া বলে স্বীকার না করলে যাতে জ্ঞান ক্রিয়া আছে তাকে জ্ঞান কর্তা বলা যায় না । সাধারণতঃ ন্যায় মতে যিনি জ্ঞান লাভার্থে করণ প্রয়োগ করেন তিনি জ্ঞাতা । জ্ঞাতা সেই জ্ঞানের করণ প্রয়োগের মাধ্যমেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়র মধ্যে সম্বন্ধ ঘটাতে পারে । বস্তুতঃ জ্ঞান বস্তুকে বিষয়ে রূপান্তরিত করে এবং সেই ক্ষেত্রে করণরূপে প্রযুক্ত প্রমাণ হয় প্রমার করণ । এই মত মানলে কেউ জ্ঞান উৎপাদনে প্রযুক্ত হওয়ার অর্থ হয় জ্ঞান লাভার্থে উপযুক্ত প্রমাণ প্রয়োগ করা বা ব্যবহার করা । সুতরাং জ্ঞানোৎপত্তিস্থলে যে

সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বর্তমান তাদের মধ্যে জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, করণ ইত্যাদি অন্তর্গত তা শব্দ ব্যবহারের দ্বারাই নির্দিষ্ট হয় । যেমন আমরা বলি যে আমি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঘটকে জেনেছি । এখানে 'আমি' বলতে বোঝায় জ্ঞানের কর্তা বা জ্ঞাতা, ঘট হল সেই জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয় এবং জ্ঞান লাভের জন্য প্রযুক্ত করণ ইন্দ্রিয় হল প্রমাণ ।

নৈয়ায়িক মতে, জ্ঞানের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বিষয়াপেক্ষতা বা সবিষয়কতা। উৎপন্ন জ্ঞান মাত্রই, তাঁদের মতে, সবিষয়ক ।[৬] তাঁদের মতে, জ্ঞান সবিষয়ক– একথার অর্থ হল জ্ঞান নিজ ভিন্ন বিষয়কে নিজ বিষয়রূপে গ্রহণ করে । অর্থাৎ কোন জ্ঞান উৎপন্ন হলে তার কোন না কোন বিষয় থাকে এবং সেই জ্ঞানেরই বিষয় জ্ঞানটা নিজে হতে পারে না । নৈয়ায়িক মতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে বলতে যেমন আশ্রয়রূপে কোন না কোন আত্মায় উৎপন্ন হয়েছে– এটি বোঝায়, তেমনি একই সঙ্গে কোন না কোন অর্থ বা বিষয়, যা ঐ জ্ঞানের থেকে ভিন্ন, তা অবলম্বনে জ্ঞান হয়েছে এটিও সিদ্ধ হয় । জ্ঞাতার জ্ঞান হয়েছে অথচ কোন বিষয় অবলম্বনে জ্ঞান হয়নি তা বলা যায় না । অর্থাৎ নিরালম্বন জ্ঞান সম্ভব না । একইভাবে পূর্বে বলা হয়েছে জ্ঞান আত্মায় উৎপন্ন হয় । আত্মা ও জ্ঞান যে অভিন্ন নয়, বিজ্ঞান তথা জ্ঞান থেকে আত্মা যে ভিন্ন তা সিদ্ধ করার জন্য তাই নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, আত্মার সবিষয়কত্বের অনুভব হয় না কিন্তু 'নির্বিষয়স্য জ্ঞানত্বে মানাভাবাৎ'[৭] অর্থাৎ আত্মা স্ববিষয়ক এরূপ অনুভব হয় না আর নির্বিষয়ক জ্ঞানের অস্তিত্ব নেই । এর দ্বারাই আত্মা ও জ্ঞান যে ভিন্ন তা প্রমাণিত হয় । তবে জ্ঞান বিষয়াপেক্ষী ও বিষয় প্রকাশক হলেও ন্যায় মতে জ্ঞান ও বিষয় অভিন্ন নয় । ন্যায়-বৈশেষিক দর্শনে বিষয়ের যেমন সত্তা আছে তেমনি গুণ পদার্থরূপে জ্ঞানেরও পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে । বিষয় থাকলেও যেমন সেই বিষয়ে জ্ঞান থাকবে এটি আবশ্যিক নয়, তেমনি জ্ঞানত্ব ধর্ম বিশিষ্টরূপে জ্ঞান বিষয়াপেক্ষী

হলেও বিষয় অতিরিক্তরূপে জ্ঞানের সত্তা স্বীকার করতে হয় । জ্ঞান বিষয় প্রকাশক । তার কার্য বিষয় প্রকাশ । কার্য ও কারণ যেমন, ন্যায় মতে, অভিন্ন হতে পারে না; তেমনি প্রকাশক জ্ঞান ও বিষয়ের প্রকাশরূপ কার্য এক হতে পারে না । আবার বিষয় ও জ্ঞান অভিন্ন বলা হলে বিষয় থাকা মানেই তার জ্ঞান থাকবে একথা স্বীকার করতে হবে । ফলতঃ জ্ঞাতা তথা ব্যক্তির সর্বজ্ঞ হওয়ার আপত্তি উঠবে । কাজেই একথা মানতে হবে যে, জ্ঞান ও তার বিষয় পরস্পর ভিন্ন । তবে জ্ঞান ও তার বিষয় ভিন্ন হলেও কোন জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার অর্থই হল কোন বিষয়ে জ্ঞান হওয়া ।

এই জ্ঞান কিন্তু ন্যায় মতে নিরাকার । তাঁদের মতে, জ্ঞান বস্তুর আকারই গ্রহণ করে । সেই বস্তু, তাঁদের মতে, জ্ঞান নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল । অপরপক্ষে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ জ্ঞানকে সাকার বলে স্বীকার করেন । কাজেই জ্ঞানগত আকারকে তাঁরা বস্তুর আকার বলেন না । তাঁদের মতে, বিজ্ঞান বা জ্ঞানই সাকার । জ্ঞান সাকার একথার অর্থ হল জ্ঞান আকার বিশিষ্ট আর আকার হল অবয়ব সংযোগ । কাজেই যা সাকার হবে তা অবশ্যই সাবয়ব হবে । আর অবয়ব বিশিষ্ট কেবলমাত্র দ্রব্যই হতে পারে । সেই দিক থেকে জ্ঞানকে সাবয়ব রূপে স্বীকার করায় বৌদ্ধ সম্মত জ্ঞানকে দ্রব্য বলে গণ্য করা ছাড়া রাস্তা নেই । আবার নিরবয়ব দ্রব্য নিত্যই হয় । জ্ঞান যদি দ্রব্য হোত তা নিরবয়ব বলে নিত্যই হোত । ন্যায় মতে জ্ঞানকে দ্রব্য বলে গণ্য করার বিপক্ষে এটি অন্যতম যুক্তি ।

জ্ঞানের গুণত্ববাদীদের মধ্যে ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য ।[৮] জ্ঞানকে দ্রব্যস্বরূপ স্বীকার করে নেওয়া নৈয়ায়িকদের পক্ষে সম্ভব নয় । কেননা জ্ঞানে ক্রিয়াধিকরণত্ব, গুণাধিকরণত্ব কিংবা সমবায়ীকারণত্ব প্রভৃতি দ্রব্যের কোন বৈশিষ্ট্যই নেই

অথচ তা দ্রব্য– দ্রব্যবাদীদের এই যুক্তি তাঁদের দর্শনে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না । ন্যায় মতে, ‘ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়ীকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্’– অর্থাৎ যা ক্রিয়ার আশ্রয়, যা গুণের আশ্রয় এবং যা সমবায়ী কারণ তাই দ্রব্য । এইরূপে তাঁরা দ্রব্যের লক্ষণ দিয়ে থাকেন । তাঁদের মতে কোনও বস্তু তখনই দ্রব্য পদবাচ্য হতে পারে যদি বস্তুটি হয় ক্রিয়াধিকরণ নতুবা গুণাধিকরণ কিংবা সমবায়ীকারণরূপে সিদ্ধ হয় । কোন বস্তু দ্রব্য হলে দ্রব্যের উক্ত কোন না কোন লক্ষণ ধর্ম অবশ্যই থাকবে । কিন্তু দ্রব্যের উক্ত আবশ্যিক ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যগুলি জ্ঞানে থাকে না । কাজেই নৈয়ায়িক মতে, জ্ঞানকে দ্রব্য বলা যাবে না ।

জ্ঞানকে ক্রিয়া বলেও স্বীকার করেন না ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ । জ্ঞান প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, যেহেতু তা ক্রিয়া এবং ক্রিয়া মাত্রই অতীন্দ্রিয়- ভাট্ট স্বীকৃত এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকগণ বিশেষতঃ জয়ন্ত ভট্ট তাঁর ‘ন্যায়মঞ্জরী’ গ্রন্থে একাধিক যুক্তির অবতারণা করেছেন । ‘জ্ঞা’ ধাতুর অর্থ হওয়ায় ‘জ্ঞান’ ক্রিয়া স্বরূপ যেহেতু ধাতুর অর্থ মাত্রই ক্রিয়া– মীমাংসক কুমারিল ভট্টের এই দাবী, জয়ন্ত ভট্টের মতে, ব্যভিচার দোষে দুষ্ট । তাঁর মতে, ধাতুর অর্থ মাত্রই ক্রিয়া হবে এমন কোনো নিয়ম নেই, যেমন– ‘গডি’ ধাতু । ‘গডি’ ধাতুর অর্থ বদনৈকদেশ । কিন্তু ‘গডি’ ধাতুর অর্থ বদনৈকদেশ কোনো ক্রিয়া নয় । ধাতুর যখন এইরূপ ভিন্ন অর্থও দৃষ্ট হয় তখন ধাতুর অর্থ মাত্রই ক্রিয়া হবে এমন দাবী নিরর্থক । তাঁর মতে, ‘অয়ং ঘটঃ’– জ্ঞানের প্রকাশক জ্ঞান হল ‘ঘটমহং জানামি’ । ঘট জ্ঞানের প্রকাশক ‘ঘটমহং জানামি’– এই আকারের জ্ঞান স্থলেও যা যা প্রতীতির বিষয় হয়, তাদের মধ্যে একটিও ক্রিয়া নয় ।[৯] উক্ত জ্ঞানে ঘট ক্রিয়া নয়, বিষয় ; ‘অহং’ পদের দ্বারা প্রতিপাদ্য আত্মা ক্রিয়া নয়, জ্ঞানাশ্রয় ; জ্ঞানকেও ক্রিয়া বলা যায় না । এক্ষেত্রে ধাতুর অর্থ মাত্রই ক্রিয়া না হওয়ায় ‘জানামি’ পদটি ক্রিয়ার বাচক বা ‘জানামি’ পদটি ক্রিয়াকে নির্দেশ করে এরূপ বলা যায় না ।

ন্যায় মতে, জ্ঞান আত্মাশ্রিত । আত্মা নিত্য ও বিভু পদার্থ হওয়ায় তার ক্রিয়া থাকা সম্ভব নয় । তাই জ্ঞান ক্রিয়া হতে পারে না । পূর্বেই বলা হয়েছে ন্যায়-বৈশেষিক মতে, জ্ঞান দ্রব্য কিংবা ক্রিয়া নয়, গুণপদার্থ । আরও স্পষ্ট করে বললে জ্ঞান আত্মার গুণ । তাঁদের মতে, এই জ্ঞান জীবাত্মায় উৎপন্ন হয় এবং অনিত্য । কিন্তু জীবাত্মায় এই জ্ঞান উৎপন্ন হয় কিনা বা জীবাত্মাই জ্ঞানের আশ্রয় কিনা তা প্রমাণের পূর্বে জ্ঞান আদৌ গুণ পদার্থ কিনা- তা সিদ্ধ হওয়া প্রয়োজন । জ্ঞানে গুণত্ব ধর্ম প্রমাণের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে- '...বুদ্ধ্যাদয়স্তাবদ্ গুণাঃ অনিত্যত্বে সত্যেকেন্দ্রিয়মাত্রগ্রাহ্যত্বাৎ'[১০]– অর্থাৎ, বুদ্ধি একধরণের গুণ পদার্থ যেহেতু তা অনিত্য এবং একটিমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যেমন রূপাদি পদার্থ । রূপাদি পদার্থে যেরূপ অনিত্যত্ব ও চক্ষুরিন্দ্রিয়রূপ একেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব থাকায় তা গুণপদার্থ তেমনি বুদ্ধিও অনিত্য হওয়ায় এবং মনরূপ একেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হওয়ায় গুণপদার্থ। উক্ত অনুমানে কেবলমাত্র 'গ্রাহ্যত্ব'কে হেতু করলে অনুমানটিতে ব্যভিচার দোষ দেখা যায় । কেননা সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতু থাকাই ব্যভিচার । পরমাণু প্রভৃতি দ্রব্য অনুমানের দ্বারা গৃহীত হয়ে থাকে বলে অনুমানগ্রাহ্যত্ব বা গ্রাহ্যত্বরূপ হেতু পরমাণুতে অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণে থাকে । আবার 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব'- কে হেতু করা হলে ঘট প্রত্যক্ষ প্রভৃতি সাধ্যাভাবাধিকরণে বৃত্তি হয়ে যায় । ফলে পুনরায় ব্যভিচার দোষ দেখা যায় । তাই এই দোষ বারণের জন্য পূর্বোক্ত অনুমানে 'অনিত্যত্বেসত্যকেন্দ্রিয়মাত্রগ্রাহ্যত্ব'-কে হেতু করা হয়েছে । এই 'অনিত্যত্বে সত্যকেন্দ্রিয়মাত্রগ্রাহ্যত্ব'-রূপ হেতু বুদ্ধিতে থাকায় বুদ্ধি গুণ পদার্থ । কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় বুদ্ধিরূপ গুণ কোন্ দ্রব্যাশ্রিত ?

বুদ্ধিরূপ গুণের আশ্রয় কি হতে পারে তার উত্তরে বলা হয়েছে, 'বুদ্ধ্যাদয়ঃ পৃথিব্যাদ্যষ্টদ্রব্যাতিরিক্তদ্রব্যাশ্রিতাঃ, পৃথিব্যাদ্যষ্টদ্রব্যানাশ্রিতত্বে সতি গুণত্বাৎ' ।[১১] অর্থাৎ

বুদ্ধি পৃথিবী ইত্যাদি অষ্টদ্রব্যে অনাশ্রিত হওয়ায় সেই অষ্টদ্রব্য অতিরিক্ত দ্রব্যে আশ্রিত হয় । এই অনুমানের দ্বারা বুদ্ধির আত্মদ্রব্য আশ্রয়ত্ব অনুমিত হয় । যেহেতু বুদ্ধি, ন্যায় মতে, গুণ বিশেষ এবং গুণ অবশ্যই দ্রব্যাশ্রিত । পৃথিব্যাদি অষ্টদ্রব্যে অনাশ্রিত হওয়ায় অনুমিত হয় যে, তা অবশ্যই অষ্টদ্রব্যাতিরিক্ত নবম দ্রব্য বা আত্মাশ্রিত হবে । কেননা যা পৃথিব্যাদি অষ্টদ্রব্যে অনাশ্রিত ও একইসঙ্গে তদতিরিক্তেও অনাশ্রিত তা গুণ হতে পারে না যেমন, দিক্, কাল প্রভৃতি ।

সুখ-দুঃখাদির ন্যায় আত্মার অন্যতম বিশেষগুণ হল জ্ঞান । ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের ভাষায়– 'আত্মগুণো জ্ঞানমিতি প্রকৃতং' অর্থাৎ জ্ঞান আত্মার গুণ, এটি প্রকৃত বা প্রকরণলব্ধ ।[১২] ভাষ্যকারের এরূপ অভিব্যক্তির কারণ হল সূত্রকার গৌতম ৩/২/৩৯ নং সূত্রে পরিশেষ অনুমানের দ্বারা জ্ঞান যে আত্মারই গুণ তা সিদ্ধ করেছেন। উক্ত সূত্রে জ্ঞানাধিকরণরূপে আত্মাকে স্বীকার করার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন । বাৎস্যায়নের মতে দিক্, কাল ও আকাশ জ্ঞানরূপ গুণের বা চৈতন্যের আশ্রয় হতে পারে এরূপ মত প্রসিদ্ধ নয় । কোন কোন দার্শনিকদের মতে, জ্ঞান ভূতচতুষ্টয়ের গুণ, কোন মতে তা ইন্দ্রিয়ের গুণ আবার কোন মতে জ্ঞান মনের গুণ । কাজেই ভূত, ইন্দ্রিয় কিংবা মন এদের মধ্যে কোন একটি জ্ঞানের আশ্রয় হতে পারে এরূপ বিরুদ্ধ মত লক্ষ্য করা যায় । তাই বাৎস্যায়ন জ্ঞানের আশ্রয়রূপে আত্মা অতিরিক্ত ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের প্রতিষেধ করেছেন অর্থাৎ জ্ঞানের আশ্রয় ভূত, ইন্দ্রিয় কিংবা মনের মধ্যে কোনটিই যে হতে পারে না তা সিদ্ধ করেছেন ।

ইন্দ্রিয় ও অর্থ যে বুদ্ধির আশ্রয় হতে পারে না তার সমর্থনে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন ইন্দ্রিয় অথবা অর্থ বিনষ্ট হলেও আমাদের জ্ঞান বিনষ্ট হয় না ।[১৩] ইন্দ্রিয় কিংবা

অর্থ বিনষ্ট হওয়ার পরেও 'আমি দেখেছিলাম'– এরূপ জ্ঞান জন্মায় । জ্ঞান ইন্দ্রিয় কিংবা অর্থের গুণ হলে ইন্দ্রিয় কিংবা অর্থকেই জ্ঞাতা বলতে হবে এবং জ্ঞানের বিনাশে সেই জ্ঞানজন্য সংস্কারের আশ্রয়ও সেই জ্ঞাতাই হবে । প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক ন্যায়-বৈশেষিক মতে, কোন বিষয়ে জ্ঞান বিনষ্ট হলেও সেই জ্ঞান বিনাশের পূর্বে সংস্কারের জন্ম দেয় যা পরবর্তীকালে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্মৃতির কারণ হয় । এই সংস্কার মূলতঃ তিন প্রকারের হয়ে থাকে– বেগ, ভাবনা ও স্থিতিস্থাপক । পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন এই পাঁচটি মূর্ত দ্রব্যে ক্রিয়া থেকে বেগ নামক সংস্কার উৎপন্ন হয় । অন্যান্য দ্রব্যে ক্রিয়া থাকে না বলে বেগও উৎপন্ন হয় না । যদিও কেবল ক্রিয়া বেগ উৎপাদন করতে পারে না তাসত্ত্বেও ক্রিয়া হল বেগের অন্যতম প্রধান কারণ । আসলে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন এই পাঁচটি দ্রব্যে ক্রিয়া নোদন, অভিঘাত প্রভৃতি সংযোগ বিশেষকে অপেক্ষা করেই বেগ উৎপন্ন করে । অনুপেক্ষাত্মকজ্ঞান থেকে যে সংস্কার উৎপন্ন হয় তাই ভাবনা । কোন বিষয়ে অনুভব হওয়ার পর সেই বিষয়ক অনুভব বিনষ্ট হলেও সেই বিষয়ে স্মরণ কিন্তু দীর্ঘকাল থেকে যায় । কাজেই এমন একটি গুণ স্বীকার করতে হয় যার দ্বারা অনুভব বিনাশের বহুকাল পরেও পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ হতে পারে । এই দীর্ঘকাল স্থায়ী কল্পিত গুণকেই বলা হয়েছে ভাবনা নামক সংস্কার । মূলতঃ স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা প্রভৃতি উৎপত্তির জন্য অনুভবের ব্যাপাররূপে ভাবনা নামক সংস্কার কল্পনা করা হয় । আদরজনিত জ্ঞান থেকে অর্থাৎ অতিশয় প্রযত্ন থেকে অপূর্বপদার্থের দেখার ইচ্ছা জন্য বিদ্যুৎসম্পাত দর্শনের মত যে পদার্থের জ্ঞান হয়, সেই আদর প্রত্যয় থেকে ভাবনা নামক সংস্কার উৎপন্ন হয় । অন্যদিকে স্থিতিস্থাপক সংস্কার হল অবস্থান্তর প্রাপ্ত বস্তুর পূর্ব অবস্থার জনক ক্রিয়ার কারণ সংস্কার । ঘন অর্থাৎ নিবিড় অবয়ব সন্নিবেশ বিশিষ্ট স্পর্শবৎ দ্রব্যে স্থিতিস্থাপক নামক সংস্কার বিদ্যমান থাকে, যেমন– গাছের ডাল ।

গাছের ডালকে নুইয়ে ধরে পুনরায় ছেড়ে দিলে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায় । এরূপ পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ারূপ যে সংযোগ সেই সংযোগের জনক যে ডালের ক্রিয়া, ঐ ক্রিয়া স্থিতিস্থাপক সংস্কার জন্যই হয়ে থাকে । জ্ঞান ইন্দ্রিয় কিংবা অর্থের গুণ হলে জ্ঞানের বিনাশে সেই জ্ঞানজন্য পূর্বোক্ত সংস্কারের আশ্রয়ও সেই জ্ঞাতাই হবে । সেক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় কিংবা অর্থের বিনাশ হলে সেই জ্ঞাতায় আশ্রিত যে জ্ঞান জন্য সংস্কার সেই সংস্কারও বিনষ্ট হবে । জ্ঞাতা বিনষ্ট হলে আশ্রয়াভাবে সংস্কারও বিনষ্ট হবে । ফলতঃ স্মরণ আর সম্ভব হবে না । আবার জ্ঞাতারই জ্ঞান জন্য সংস্কার থেকে কোন বিষয়ক স্মৃতি হয়ে থাকে । কাজেই জ্ঞাতা বিনষ্ট হলে সেই বিষয়ক স্মরণের সম্ভাবনাও আর থাকে না । তবে জ্ঞাতা বিনষ্ট হলেও যে সেই সংস্কার জন্য স্মৃতি অন্য জ্ঞাতার হবে এরূপও বলা যায় না । যেহেতু যে জ্ঞাতার জ্ঞানজন্য সংস্কার আছে সেই জ্ঞাতারই স্মৃতি হতে পারে । কাজেই জ্ঞাতার বিনাশ হলে সেই সংস্কার জন্য স্মৃতিরও আর অবকাশ থাকবে না । কিন্তু ইন্দ্রিয় কিংবা অর্থের বিনাশের পরেও 'আমি দেখেছিলাম' প্রভৃতি আকারের স্মরণ অনুভব সিদ্ধ হয় । এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞানের আশ্রয় ইন্দ্রিয়, অর্থ প্রভৃতি অনিত্য পদার্থ হতে পারে না ।

জ্ঞানের আশ্রয় অবশ্যই কোনও পূর্বাপরকালস্থায়ী নিত্য পদার্থই হবে । কিন্তু সেই নিত্য পদার্থ মন হতে পারে না । নিত্য পদার্থ মনের গুণ যে জ্ঞান হতে পারে না তার সমর্থনে ভাষ্যকার বলেছেন– মন জ্ঞাতা বা কর্তা না হওয়ায় জ্ঞান তার গুণ হতে পারে না ।[১৪] যিনি জ্ঞাতা বা জ্ঞানের কর্তা জ্ঞান তারই গুণ হতে পারে । কেননা ক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্যই কর্তার লক্ষণ ।[১৫] অর্থাৎ কর্তা বা জ্ঞাতা হবে স্বতন্ত্র এবং অন্যান্য করণাদি সেই জ্ঞাতার বশ্য হবে । সুখ-দুঃখ প্রভৃতির সাধনরূপে অন্তঃকরণ মনকে স্বীকার করা

হয়েছে । এই কারণে মনকে জ্ঞানের করণরূপে স্বীকার করায় আর কর্তারূপে স্বীকার করা যায় না ।

মনকে যদি জ্ঞানের আশ্রয় বলে স্বীকার করা হয় তাহলে কায়ব্যূহকারী যোগীর যুগপৎ নানা বিষয়ের জ্ঞানের উৎপত্তির ব্যাখ্যাও দেওয়া যায় না । যোগী ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয়াদি করণ থেকে বিলক্ষণ করণবিশিষ্ট হয়ে ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়যুক্ত নানা শরীরের নির্মাণ করে সেই সমস্ত শরীরে যুগপৎ নানা জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি করেন । এরূপ নানা দেহ নির্মাণই হল কায়ব্যূহ । ঐ সমস্ত দেহে যোগী নিজ শক্তির দ্বারা মুক্ত পুরুষদের মনকে আকর্ষণ করে নিজের শরীরে গ্রহণ করতে পারেন । কিন্তু ঐ সমস্ত মনে অদৃষ্ট না থাকায় যেমন সেগুলি সুখ-দুঃখের ভোক্তা হতে পারে না তেমনি সেই সমস্ত জ্ঞানের আশ্রয় হতে না পারায় ঐ সমস্ত মনকে জ্ঞাতাও বলা যায় না । এক্ষেত্রে কায়ব্যূহকারী যোগীর মনকে জ্ঞাতা বললে কিংবা সেই মনকে জ্ঞান রূপ গুণের আশ্রয় বললে কায়ব্যূহকারী যোগীর পূর্ব্বদেহস্থ নিত্য মনকেই জ্ঞাতা বলতে হবে । কিন্তু যেহেতু এই মন অণুপরিমাণ সেহেতু সমস্ত শরীরের সঙ্গে যুগপৎ সংযোগ না থাকায় যোগীর সমস্ত শরীরে উৎপন্ন নানা জ্ঞেয় বিষয়ের জ্ঞাতা হতে পারে না । সমস্ত শরীরে জ্ঞাতা না থাকলে সমস্ত শরীরে যুগপৎ জ্ঞানের উৎপত্তিও সম্ভব হতে পারে না । অথচ যোগী যুগপৎ নানা শরীরে নানা জ্ঞেয় বিষয়ের উপলব্ধি করেন । তার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে যোগীর সমস্ত শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত কোন জ্ঞাতা নিশ্চয়ই আছে । এখন সমস্ত শরীরের সঙ্গে সংযুক্ত হয় যে জ্ঞাতা সেই জ্ঞাতা অণু পরিমাণ হতে পারেনা, সেই জ্ঞাতা অবশ্যই বিভু হবে । সেই বিভু জ্ঞাতা মন হতে পারে না । যেহেতু মনের বিভুত্ব স্বীকার করা যাবে না তা মনের লক্ষণ প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে । মনকে বিভু বলে স্বীকার করলে একইক্ষণে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ সম্ভব হওয়ায় সেই সমস্ত ইন্দ্রিয়জন্য

একইক্ষণে একাধিক জ্ঞানোৎপত্তির আপত্তি হবে । কিন্তু জ্ঞানের যৌগপদ্য অর্থাৎ একইক্ষণে একাধিক জ্ঞানের উৎপত্তি অনুভব সিদ্ধ না হওয়ায় মন যে অণু পরিমাণ তা স্বীকার করে নেওয়া হয় । মন অণু পরিমাণ হওয়ায় একইক্ষণে এক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ সম্ভব হওয়ায় এক ক্ষণে কেবল সেই একেন্দ্রিয়লব্ধ বিষয়ের গ্রহণই সম্ভব হয় এবং সেই বিষয়েরই উপলব্ধি সম্ভব হয় । একইক্ষণে একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা একাধিক বিষয়ের গ্রহণ সম্ভব হলেও মনের অণুত্ব হেতু একাধিক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ সম্ভব নয় । আবার ইন্দ্রিয় মনঃসংযোগ ব্যতীত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তিও সম্ভব নয় । ফলে একইক্ষণে একাধিক বিষয়ের গ্রহণও সম্ভব নয় । এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলালের একটি বর্ণনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । অধ্যাপক বিমলকৃষ্ণ মতিলালের মতে, যখন আমরা কোন কিছু লিখি তখন চোখের সঙ্গে কলমের কালি-চিহ্নিত সাদা পৃষ্ঠার সংযোগে চাক্ষুষ সংবেদনের খবর আসে, হাতের আঙুলের মধ্যে ধরা ধাতব কলমটির স্পর্শ সংবেদনের খবর আসে, গলার ভিতরে শুষ্কতা ও পিপাসার সংবেদনের খবর, পিঠের সঙ্গে চেয়ারের ভারসাম্যরক্ষাকারী পরস্পর চাপের খবর, অন্যদিকে রাস্তার যানবাহনের আওয়াজ কানের ভেতরে ঢুকছে । কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে এক একটি সূক্ষ্মতম ক্ষণে আমরা বেছে বেছে একটি মাত্র সংবেদকেই জানছি । তিনি আরও বলেছেন, যদি একটি তীর একশোটা পদ্মপাতাকে ভেদ করে ঝটিতি চলে যায় তাহলে আমরা ভুল করে বুঝি একইসঙ্গে সবকটা পাতা ভেদ করলো । কিন্তু আসলে একটার পর একটা পাতা ফুটো করেই বাণটা শতপত্র ভেদ করতে পারে । একসাথে এককালে অনেক বিষয় ইন্দ্রিয় সংযোগ থাকলেও যে বাছাইকরা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সহযোগিতার ফলে এক এক ক্ষণে একটিই মাত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে তাকেই বলে মন ।[১৬] এরূপে মনের অণুপরিমাণত্ব সিদ্ধ

হওয়ায় মনের জ্ঞাতৃত্বও অসিদ্ধ হয় এবং মন ভিন্ন অন্য কোন নিত্য ও বিভু পদার্থেরই গুণ হল জ্ঞান তা স্বীকার করে নিতে হয় । প্রত্যক্ষের প্রতি অন্যতম কারণ হয় মহৎ পরিমাণবত্ব । মন অণুপরিমাণ হওয়ায় মন নিজেই প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য নয় । মন প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য না হওয়ায় তদাশ্রিত জ্ঞান, সুখ, দুঃখ প্রভৃতিও অপ্রত্যক্ষযোগ্য এরূপ আপত্তি দেখা দেবে ।[১৭] কিন্তু জ্ঞান, সুখ, দুঃখ প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষত্ব ধর্ম সিদ্ধ হওয়ায় মনকে এই সমস্ত ধর্মের আধাররূপে স্বীকার করা যায় না । তাছাড়া এই মন অচেতন পদার্থ । সুতরাং সেই অচেতন মন চৈতন্যরূপ জ্ঞানের আশ্রয় হতে পারে না ।

যে সমস্ত হেতুর দ্বারা ভূত, ইন্দ্রিয় ও মনের জ্ঞানাশ্রয়ত্ব প্রতিষেধ করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম আরেকটি হল পারতন্ত্র্য । ন্যায় মতে ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন হল পরতন্ত্র পদার্থ । যে সমস্ত পদার্থ কোন বস্তুর ধারণ, প্রেরণ এবং ব্যূহন বা নির্মাণ ক্রিয়ায় অপরের প্রযত্ন জন্যই প্রবৃত্ত হতে পারে, যাদের নিজেদের প্রযত্নজন্য প্রবৃত্তি বা স্বাতন্ত্র্য থাকে না তাদের পরতন্ত্র পদার্থ বলা হয় । ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন কোন বস্তুর ধারণ, প্রেরণ এবং ব্যূহন বা নির্মাণ ক্রিয়ায় অপরের প্রযত্ন জন্যই প্রবৃত্ত হতে পারে, এদের নিজেদের প্রযত্নজন্য প্রবৃত্তি বা স্বাতন্ত্র্য নেই । কাজেই এগুলি পরতন্ত্র পদার্থ । কিন্তু কোন কিছু, যা চৈতন্য বা জ্ঞানের আশ্রয় হয়, তার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করতেই হয় । সেই কারণে পরতন্ত্র পদার্থ হওয়ায় ভূত, ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির চৈতন্য স্বীকার করা যায় না।[১৮] জ্ঞাতা বা কর্তা হয় স্বতন্ত্র । সেকথা পূর্বে কর্তার লক্ষণ প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে। কাজেই যিনি জ্ঞাতা অর্থাৎ জ্ঞানের কর্তা হবেন জ্ঞান তারই গুণ হবে । অন্যদিকে ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞানের করণ হওয়ায় সেগুলি জ্ঞাতার বশ্য । জ্ঞানের কর্তা ও করণের মধ্যে কর্তাকেই চেতন বলতে হয় এবং ইন্দ্রিয়াদি করণ হল সেই চেতন কর্তার বশ্য । যেহেতু চেতনের অধিষ্ঠান ছাড়া অচেতন কোন কার্য করতে পারে না । কাজেই

জ্ঞাতা যেমন চেতন হবে তেমনি জ্ঞাতা হবে স্বতন্ত্র । ইন্দ্রিয়াদি স্বতন্ত্র না হওয়ায় সেগুলি যে চৈতন্যের আশ্রয় হতে পারে না তা সিদ্ধ হয় ।

চার্বাকগণ চৈতন্য বা জ্ঞানের আশ্রয়রূপে ভূতসমূহকে বা শরীরকে স্বীকার করেন। জ্ঞানের আশ্রয় যে শরীর হতে পারে না তার সমর্থনে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, শরীরকে জ্ঞানের আশ্রয়রূপে স্বীকার করলে মৃত ব্যক্তির শরীরেও জ্ঞান স্বীকারের আপত্তি হবে ।[১৯] কিন্তু সৎকারের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত মৃত শরীরে জ্ঞান থাকে তা বলা যায় না। শুধু তাই নয় শরীর যদি চৈতন্যের আশ্রয় হয় তাহলে বাল্য বয়সে যে সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান আমাদের হয় যৌবনে বা বার্ধক্যে সেই সমস্ত বিষয়ের স্মৃতি সম্ভব হত না। কেননা বাল্য কালের শরীর যৌবন বা বার্ধক্য দশায় আর থাকে না । পূর্বেই বলা হয়েছে একের অনুভূত বিষয়ে অন্যের স্মরণ হতে পারে না এই নিয়মে এক শরীরে অনুভূত বিষয় অন্য শরীরের স্মরণ হতে পারবে না । এক্ষেত্রে মানতে হয় যে বাল্য শরীরে যে অনুভূতি উৎপন্ন হয়েছে তা সংস্কারের দ্বারা যৌবন শরীর হয়ে বার্ধক্য শরীরে সংক্রমিত হয় । তবেই সেই সংস্কারের দ্বারা বাল্য শরীরে অনুভূত বিষয়ের যৌবন, বার্ধক্য শরীরে স্মরণ সম্ভব হয় । কিন্তু এরূপ স্বীকার করলে অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব শরীরের দ্বারা উত্তরোত্তর শরীরে স্মৃতির জনক সংস্কার জন্মায় বলা হলে অনন্ত সংস্কার স্বীকার করায় গৌরব দোষের আপত্তি হয় ।[২০] যদি এই পরিবর্তনশীল শরীর ভিন্ন কোন এক স্থির কর্তা স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে লাঘব হয় । কেননা সেক্ষেত্রে শরীর পরিবর্তিত হলেও অপরিবর্তনশীল সেই কর্তায় উৎপন্ন সংস্কার বারংবার উদ্বুদ্ধ হয়ে উত্তরোত্তর শরীরে স্মৃতির জনক হতে পারবে । ফলে অনন্ত সংস্কার স্বীকারের প্রয়োজনও থাকবে না । কাজেই পরিবর্তনশীল শরীর চৈতন্যের আশ্রয় হতে পারে না ।

জ্ঞান বা চৈতন্যের আশ্রয়রূপে সেই শরীর অতিরিক্ত কোন এক স্থির কর্তাকে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয় । সেই স্থির কর্তা হল আত্মা ।

শরীরকে জ্ঞানের আশ্রয়রূপে যেমন স্বীকার করা যায় না তেমনি আবার শরীরকে সেই আত্মার সঙ্গে অভিন্ন বলা যায় না । শরীরকে আত্মা বললে শিশুর স্তন্যপানের যে প্রবৃত্তি তার কারণ ব্যাখ্যা করা যায় না । ন্যায় মতে, সদ্যজাত শিশুর স্তন্যপানের যে প্রবৃত্তি দেখা যায় তার প্রবর্তক হল ইষ্টসাধনতা জ্ঞান । ‘এই বস্তু আমার ইষ্ট অর্থাৎ আমার কল্যাণজনক’ – এরূপ ইষ্টসাধনতা জ্ঞান ব্যতীত জীবের প্রবৃত্তি সম্ভব হয় না । সদ্যজাত শিশুর পূর্বজন্মে অন্য দেহের মাধ্যমে স্তন্যপানের দ্বারা স্তন্যপান সম্বন্ধে যে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল সেই ইষ্টসাধনতা জ্ঞান জন্য ইষ্টসাধনতার সংস্কার সেই সময়েই উৎপন্ন হয় । পরবর্তীকালে সেই আত্মা নতুন দেহ ধারণ করলে প্রাণধারক অদৃষ্টের দ্বারা সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় এবং ইষ্টসাধনতার স্মরণ হয় । সেই ইষ্টসাধনতা জ্ঞানের স্মরণবশতঃ শিশুর জন্মক্ষণে স্তন্যপানে প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু নিত্য আত্মায় পূর্বজন্মের ইষ্টসাধনতা জ্ঞানজন্য সদ্যজাত শিশুর স্তন্যপানের প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হলেও অনিত্য শরীরে এরূপ প্রবৃত্তির কারণ ব্যাখ্যা সম্ভব নয় । তাছাড়া চার্বাকদের অভিমত মেনে শরীরাকারে পরিণত ভূতবিশেষে চৈতন্য স্বীকার করলে শরীরের আরম্ভক হস্তাদি অবয়ব অথবা সমস্ত পরমাণুতেই চৈতন্য স্বীকার করতে হবে । যেমন করে গুড়, তণ্ডুল প্রভৃতি সহযোগে যে মাদক দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাতে যে মাদক শক্তি থাকে তা তার প্রত্যেক উপাদানের মধ্যেই থাকে । না হলে তাদের সহযোগে মাদক দ্রব্য উৎপন্ন হতে পারে না । একইভাবে শরীরের আরম্ভক প্রত্যেক অবয়বে বা প্রত্যেক পরমাণুতেই চৈতন্য আছে স্বীকার করতে হয় । অন্যথায় শরীরে চৈতন্য আছে স্বীকার করা যায় না । এখন প্রত্যেক শরীরে বহু অবয়ব বা পরমাণুতে

চৈতন্য স্বীকার করলে সেই বহু অবয়ব বা পরমাণুকেই জ্ঞাতা বলে স্বীকার করতে হবে এবং একই শরীরের একাধিক জ্ঞাতা স্বীকারের আপত্তি হবে । কিন্তু এক শরীরে একাধিক জ্ঞাতার বিষয়ে প্রমাণ না থাকায় শরীরকে জ্ঞানের আশ্রয়রূপে স্বীকার তথা ভূতচৈতন্যবাদ সমর্থন করা যায় না । এক শরীরে একাধিক জ্ঞাতা যে সমর্থন করা যায় না তা ভাষ্যকারের মত থেকেই স্পষ্ট । ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে, একাধিক জ্ঞাতার অস্তিত্ব পক্ষে বুদ্ধ্যাদি গুণের ব্যবস্থাই সাধক হতে পারে ।[২১] বুদ্ধ্যাদ্ধি গুণ ব্যবস্থা বলতে বোঝায় এক জ্ঞাতার সুখ, দুঃখ, বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ উৎপন্ন হলে সেই বুদ্ধ্যাদি গুণ সেই জ্ঞাতারই ধর্ম হয় অন্য কোন জ্ঞাতার ধর্ম হয় না । অর্থাৎ অন্য কোন জ্ঞাতায় এই বুদ্ধি উৎপন্ন হতে পারে না । এই বুদ্ধ্যাদিগুণ ব্যবস্থার দ্বারাই প্রত্যেক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞাতা সিদ্ধ হয় । কিন্তু কোন শরীরে এক জ্ঞাতার বুদ্ধ্যাদি গুণ উৎপন্ন হলে সমস্ত শরীরের সমস্ত জ্ঞাতার ঐ সমস্ত গুণ উৎপন্ন হয় না । এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে এক শরীরে বহু জ্ঞাতা নেই, এক জ্ঞাতার অস্তিত্বই আছে । কাজেই শরীরকে জ্ঞানাশ্রয়রূপে স্বীকার করা যায় না ।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে, ভূতচৈতন্যবাদীদের মত মেনে জ্ঞানাদির আশ্রয়রূপে ভূতপদার্থকেও স্বীকার করা যায় না । তাঁর মতে, যদি ভূতপদার্থকে জ্ঞানাদির আশ্রয়রূপে স্বীকার করা হয় তাহলে গুরুত্বাদি ধর্মের ন্যায় জ্ঞানাদির সার্বত্রিকত্বের আপত্তি হবে । তাঁর মতে, পৃথিব্যাদি ভূতে যে গুরুত্বাদি ধর্ম থাকে তা পৃথিব্যাদি সমস্ত ভূতেই থাকে । অর্থাৎ পৃথিবী কিংবা জলে যে গুরুত্ব আছে তা সমস্ত পৃথিবী ও সমস্ত জলেই আছে । একইভাবে জ্ঞানাদির আশ্রয়রূপে যদি পৃথিব্যাদি ভূতকে স্বীকার করা হয় তাহলে সে জ্ঞানাদি সকল ভূতেরই ধর্ম হবে । ফলে সার্বত্রিকত্বের আপত্তি হবে । কিন্তু ভূতচৈতন্যবাদীরাও এই সার্বত্রিকত্বের নিয়ম স্বীকার করেন না । কেননা ঘটাদি দ্রব্য যে

জ্ঞানাদির আশ্রয় হতে পারে না একথা তাঁরাও স্বীকার করেন । কোন জ্ঞাতার জ্ঞানজন্য ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি উৎপন্ন হলে তার দ্বারা সেই জ্ঞাতার প্রযোজ্য ভূতবিশেষরই সেই ইচ্ছা, দ্বেষ জন্য প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি জন্মায় । সেই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি সর্বভূতে যে জন্মায় না সেকথা ভূতচৈতন্যবাদীরাও সমর্থন করেন ।[২২]

ভূতচৈতন্যবাদীরা বলতে পারেন জ্ঞানাদি সর্বভূতের ধর্ম নয় । পৃথিব্যাদি পরমাণু বিশেষ সংযোগবশতঃ শরীরাকারে পরিণত হলে তবেই সেই শরীরে জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে । শরীরাম্ভক পরমাণু বিশেষের বিলক্ষণ সংযোগবিশেষই জ্ঞানাদির উৎপাদক । অর্থাৎ জ্ঞানাদি ভূতমাত্রের ধর্ম নয় । এই কারণেই ঘটাদি দ্রব্য জ্ঞানাদির আশ্রয় হতে পারে না । কিন্তু ভূতচৈতন্যবাদীদের এই যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয় । বাৎস্যায়নের মতে, শরীরাকারে পরিণত ভূতবিশেষে চৈতন্য স্বীকার করলে সেই শরীরের আরম্ভক হস্ত-পদাদি অবয়ব বা যেসমস্ত পরমাণু সংযোগে শরীর গঠিত সেই সমস্ত কিছুতেই চৈতন্য স্বীকার করতে হবে । তার পরিণতিতে যে, একই শরীরে বহু জ্ঞাতার আপত্তি হয় তা পূর্বেই বলা হয়েছে । কাজেই চার্বাকদের মত মেনে জ্ঞানাদির আশ্রয়রূপে ভূতাদি পদার্থকেও স্বীকার করা যায় না ।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে, ভূত, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে জ্ঞানাশ্রয়ত্ব ধর্ম স্বীকৃত হলে অকৃতাভ্যাগম নামক দোষও উৎপন্ন হবে ।[২৩] কর্মবাদ অনুসারে- স্বকৃত কর্মের ফলভোগ কর্তার পক্ষে বাধ্যতামূলক । তা অস্বীকার করলে কৃতপ্রণাশ দোষ হয় । তেমনি যিনি কোন কর্মের কর্তা নন তাকে সেই কর্মের ফলভোগ করতে হলে অকৃতাভ্যাগম নামক দোষের উদ্ভব হয় । কিন্তু ভূত, বাহ্যেন্দ্রিয় প্রভৃতিকে চৈতন্যের আশ্রয়রূপে স্বীকার করলে আত্মাতে পরকৃত বা অপরের দ্বারা কৃত কর্মের ফল ভোগের আপত্তি হবে ।

কেননা চৈতন্য বা চেতনাশ্রয়রূপে ভূত, বাহ্যেন্দ্রিয় প্রভৃতি স্বীকার করলে প্রবৃত্তিরূপ কর্মের কর্তা রূপেও তাদেরকেই স্বীকার করতে হবে । যেহেতু চেতন পদার্থের স্বাতন্ত্র্যই কর্তৃত্ব । কিন্তু ভূত, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে প্রবৃত্তি বা শুভাশুভ কর্মের কর্তারূপে স্বীকার করলেও সেগুলি অনিত্য পদার্থ হওয়ার কারণে সেই সব কৃতকর্মের ফলস্বরূপ পারলৌকিক ফলভোগ তাদের দ্বারা সম্ভব হয় না । এমতাবস্থায় ভূতাদি কর্তার দ্বারা কৃত কর্মের ফলভোগ নিত্য আত্মারই সম্ভব হয় একথা স্বীকার করতে হয় । ফলে আত্মায় অকৃত কর্মের ফলভোগ বা অকৃতাভ্যাগম স্বীকার করতে হয় ।[২৪] কিন্তু তা কর্মবাদের বিরোধী । এই কারণে ন্যায় মতে, ভূত, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির প্রতিষেধ হওয়ায় অবশিষ্ট আত্মাই চেতন দ্রব্যরূপে স্বীকৃত হয় অর্থাৎ ক্ষিত্যাদি ভূত, দিক্, কাল, মন প্রভৃতি কোনটিই জ্ঞানের আশ্রয়রূপে সিদ্ধ না হওয়ায় জ্ঞান যে আত্মারই গুণ এটি সিদ্ধ হয় ।[২৫]

সাধারণতঃ যেস্থলে ব্যাপ্তিসম্বন্ধের জ্ঞান বা লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ জ্ঞান লৌকিক প্রত্যক্ষের যোগ্য হয় না সেক্ষেত্রে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের দ্বারা লিঙ্গী বা সাধ্যের সিদ্ধি হয়ে থাকে । নৈয়ায়িক মতে দেহাতিরিক্ত আত্মা লৌকিক প্রত্যক্ষের যোগ্য নয় । বুদ্ধি, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ আত্মাতে উৎপন্ন হয় কিন্তু সেই সমস্ত গুণে আত্মার ব্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয় না । কেননা যেখানে বুদ্ধ্যাদি গুণ উৎপন্ন হয় সেটি দেহাতিরিক্ত আত্মা এরূপ ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের জন্য কোন প্রত্যক্ষযোগ্য উদাহরণ পাওয়া যায় না । তবে সেক্ষেত্রে যা যা গুণ পদার্থ তাই তাই দ্রব্যাশ্রিত, যেমন রূপ প্রভৃতি, এইরূপ সামান্যতঃ ব্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ হতে পারে । যেহেতু রূপাদি গুণ পদার্থ এবং সেগুলি যে দ্রব্যাশ্রিত তা প্রত্যক্ষযোগ্য । এইরূপে সামান্যতঃ ব্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রত্যক্ষের দ্বারা বুদ্ধ্যাদি গুণ পদার্থ কোন না কোন দ্রব্যাশ্রিত এটি সিদ্ধ হয় ।[২৬] আর পূর্বেই দেখানো হয়েছে

পরিশেষ অনুমানের দ্বারা প্রসক্ত প্রতিষেধ পূর্বক এটি সিদ্ধ হয় যে এই স্থলে সেই দ্রব্য হল আত্মা । অনুমানের দ্বারা জ্ঞানের আশ্রয়রূপে স্বীকৃত এই আত্মা, ন্যায় মতে, পূর্বাপরকালস্থায়ী নিত্য পদার্থ । যদিও পূর্বেই বলা হয়েছে এই অর্থে সবাই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেননি । যেমন চার্বাক দর্শনে 'আমি' শব্দ দ্বারা দেহকেই বোঝান হয়। নৈয়ায়িকরা 'আমি' বলতে দেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাত অতিরিক্ত পূর্বাপর কালস্থায়ী কিছুকে বোঝালেও বৌদ্ধরা এরূপ পদার্থ স্বীকার করেন না । ক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধ ক্ষণিক বিজ্ঞান প্রবাহকেই 'আমি' শব্দ দ্বারা নির্দেশ করে ।

জ্ঞান ন্যায়-বৈশেষিক মতে, আত্মাশ্রিত গুণ পদার্থ একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, দ্রবত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনা ও শব্দ প্রভৃতি ষোলটি গুণকে বলা হয়েছে বিশেষ গুণ । ন্যায়কন্দলীকারের মতে, 'বিশেষ' শব্দের অর্থ হল ব্যবচ্ছেদক বা পৃথক্ কারককে বোঝানো হয় । এই গুণগুলি নিজের আশ্রয়কে অন্য আশ্রয় থেকে ব্যবচ্ছিন্ন করে বা পৃথক্ করে । এই কারণে এই গুণগুলিকে বিশেষ গুণ বলা হয়ে থাকে । স্বীকৃত ষোলটি বিশেষ গুণের মধ্যে আবার আত্মগত বিশেষ গুণ ছটি । সেগুলি হল বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং প্রযত্ন । এই ছয়টি গুণ অন্তঃকরণ অর্থাৎ মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় ।[২৭] সেই মানস প্রত্যক্ষের স্বরূপ পরবর্তীতে প্রসঙ্গক্রমে বিস্তারিত আলোচিত হবে । তবে প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক মনকে, ন্যায় দর্শনে, অন্তঃকরণ বলা হলেও সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে 'অন্তঃকরণ' শব্দটার ভিন্ন অর্থও লক্ষ্য করা যায় । তবে যাই হোক্ আত্মগত এই বিশেষ ছয়টি গুণের মধ্যে বুদ্ধি বা জ্ঞানকেই মুখ্য বলা যেতে পারে । বুদ্ধি বা জ্ঞান ছয়টি গুণের মধ্যে মুখ্য এই অর্থে যে অন্যান্য পাঁচটি গুণ কোন না কোন ভাবে জ্ঞান জন্য অর্থাৎ জ্ঞানের কার্য । কোন বিষয়ে বুদ্ধি বা জ্ঞান হলে তবেই সেই বিষয়ে

ইচ্ছা উৎপন্ন হতে পারে । যে পদার্থের সঙ্গে সন্নিকর্ষের ফলে আত্মা সুখ উপলব্ধি করে সেই পদার্থের দর্শন করে গ্রহণ করার জন্যই ইচ্ছা হয়ে থাকে ।[২৮] একইভাবে প্রশস্তপাদাচার্য বলেছেন নিজের অপ্রাপ্ত পদার্থের বা অপরের অপ্রাপ্ত পদার্থের যে প্রার্থনা তাই ইচ্ছা ।[২৯] এই ইচ্ছা আত্মা ও মনের সংযোগে সুখকে অপেক্ষা করে ও স্মৃতিকে অপেক্ষা করে উৎপন্ন হয় । কোন বিষয়ক ইচ্ছা হলে তবেই সেই বিষয়ে প্রযত্ন বা কৃতি হয়ে থাকে । অর্থাৎ জ্ঞান হল ইচ্ছার জনক এবং ইচ্ছা হল প্রযত্নের জনক । কোন বিষয়ে প্রযত্ন হলে যদি সেই বিষয়টি জ্ঞাতার কাছে অভীষ্ট হয় তাহলে তা প্রাপ্ত হলে কিংবা বিষয়টি যদি অনভীষ্ট হয় তাহলে তা ত্যাজ্য হলে তখন তার ত্যাগের মাধ্যমেই সুখ উৎপন্ন হয় । প্রশস্তপাদাচার্যের মতে, ব্যক্তির অভিপ্রেত বিষয়ের সঙ্গে যখন ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ হয় তখন ধর্ম, শরীরের সুস্থতা প্রভৃতিকে অপেক্ষা করে, আত্মা ও মনের সংযোগ থেকে সুখের সংবেদন, অনুরাগ, চক্ষু প্রভৃতির বিমলতা, মুখের প্রসন্নতা প্রভৃতির জনক যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাই সুখ ।[৩০] এই সুখ যেমন অতীতের কোন অভিলষিত বিষয়ের স্মৃতি থেকে উৎপন্ন হয় তেমনি ভবিষ্যৎ বিষয়ের সঙ্কল্প থেকেও উৎপন্ন হয় । অন্যদিকে যে পদার্থের প্রতিকূলরূপে জ্ঞান হয় সেই পদার্থ হল দুঃখ স্বরূপ । প্রশস্তপাদাচার্যের মতে, অনভিলষিত পদার্থের সান্নিধ্য হলে অনিষ্টের উপলব্ধি, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ এবং অধর্ম, শরীরের অবস্থানাদি সহ আত্মা ও মনের সংযোগ থেকে অসহিষ্ণুতা, দুঃখের অনুভব, দৈন্যের জনক যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাই দুঃখ ।[৩১] দুঃখও অতীতের স্মৃতি এবং ভবিষ্যৎ বিষয়ের সঙ্কল্প থেকে উৎপন্ন হয় । অর্থাৎ সুখ কিংবা দুঃখের উৎপত্তির প্রতি কারণ হল জ্ঞান । অতীতের কোন বিষয়ে দুঃখ উৎপন্ন হলে সেই দুঃখ মনে পড়লে বা সেই অতীত দুঃখ স্মরণকে সহকারী কারণ করে আত্মমনঃ-সংযোগ থেকে দ্বেষ উৎপন্ন হয় । সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোন বিষয়ে বুদ্ধি

বা জ্ঞান হলে তবেই সেই বিষয়ে ইচ্ছা উৎপন্ন হতে পারে এবং কোন বিষয়ক ইচ্ছা হলে তবেই সেই বিষয়ে প্রযত্ন বা কৃতি হয়ে থাকে । কোন বিষয়ে প্রযত্ন জন্য ব্যক্তি সেই বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্ত হলে যদি সেই বিষয়টি সেই প্রযত্ন কর্তার অভিলষিত হয় তবে অভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তি সুখের জনক হয় কিংবা অনভিলষিত হলে তা দুঃখের জন্ম দেয় । আবার সেই দুঃখজনক বস্তুর পুনঃদর্শন হলে অতীতের দুঃখসাধনতার স্মরণ জন্য সেই বিষয়ে দ্বেষ হয়ে থাকে । সেই দ্বিষ্ট বস্তুর পরিহারের জন্য সুখ উৎপন্ন হয় । কাজেই আত্মার অন্যান্য বিশেষ গুণ থাকলেও সবকটি গুণ জ্ঞান নির্ভর ।

বৌদ্ধ দর্শনে কিন্তু এই সুখ-দুঃখ প্রভৃতি জ্ঞান স্বরূপ বলে স্বীকার করা হয়েছে । ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে যেমন জ্ঞান উৎপন্ন হয় তেমনি সুখ-দুঃখও উৎপন্ন হয় । তাঁদের মতে, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন প্রভৃতির কারণ অভিন্ন এবং এই সুখ-দুঃখাদির কারণই বিজ্ঞানের কারণ । কার্য ভিন্ন হলেও কারণ অভিন্ন হওয়ায় সুখ-দুঃখাদিকে তাঁরা বিজ্ঞান বা জ্ঞানের অবান্তর ভেদ বলেন । কিন্তু ন্যায় মতে সুখ-দুঃখ জ্ঞান নয়, জ্ঞান জন্য । জ্ঞান পূর্বে থাকলে তবেই সুখ-দুঃখের উৎপত্তি হয় । এমনকি ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ স্থলে সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হলেও সেই সুখ-দুঃখ উৎপত্তির পূর্বে থাকে জ্ঞান । পূর্বে জ্ঞান না থাকলে কোন ভাবেই সুখ-দুঃখের উৎপত্তি সম্ভব নয় । তবে সুখ-দুঃখাদির অনুভূতি হল জ্ঞান স্বরূপ । ঘট-পটাদি সবিষয়ক জ্ঞানের বিষয় যেমন ঘট, পট প্রভৃতি হয়ে থাকে তেমনি সুখ-দুঃখাদিকে বিষয় করেও অনুভব হয়ে থাকে । ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান প্রভৃতি সবিষয়ক অর্থাৎ এদের বিষয় থাকে । কিন্তু সুখ-দুঃখাদি হল মনোগ্রাহ্য বিষয়, সুখ-দুঃখাদির কোন বিষয় থাকে না । সুখ-দুঃখাদির বিষয় না থাকায় অর্থাৎ সবিষয়ক না হওয়ায়, ঐ সমস্ত ঘট-পটাদি জ্ঞান থেকে সুখ-দুঃখ ভিন্ন ।[৩২] একইভাবে সুখ-দুঃখাদি মনোগ্রাহ্য হওয়ায় সুখ-দুঃখ কেবলমাত্র বিষয় । পূর্বপক্ষীগণ এরূপ আপত্তি

করতে পারেন যে, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি আন্তরগুণগুলি স্বপ্রকাশ অর্থাৎ গ্রাহ্য এবং গ্রাহক উভয় স্বরূপ । কাজেই গ্রাহ্য ও গ্রাহক স্বরূপ হওয়ায় সুখ-দুঃখ জ্ঞান স্বরূপ । কিন্তু ন্যায় মতে এরূপ সুখ-দুঃখাদিকে স্বপ্রকাশও বলা যায় না । সুখ-দুঃখাদিকে স্বপ্রকাশ বলা হলে সুখ-দুঃখাদি থাকলেই সুখ-দুঃখাদির অনুভব থাকবে বলতে হবে । সেক্ষেত্রে সুখ-দুঃখের অনুভব উৎপত্তি ও অনুৎপত্তির মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্য থাকবে না । ফলে সকল সময়েই জীবেরই সুখী বা দুঃখী হওয়ার আপত্তি উঠবে । কিন্তু সকল সময়ে জীবের সুখ-দুঃখ থাকে না । সেক্ষেত্রে এরূপ স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত যে, সুখ-দুঃখাদি উৎপন্ন হলে তবে তাকে বিষয় করে সুখ-দুঃখের অনুভূতি হয়ে থাকে । ফলে সুখ-দুঃখাদিকে আর স্বপ্রকাশ বলা সম্ভব না হওয়ায় সেই স্বপ্রকাশত্বকে হেতু করে সুখ-দুঃখাদি জ্ঞান স্বরূপ এরূপ বলাও যুক্তিযুক্ত নয় । তবে নৈয়ায়িক মতে, এই সুখাদির অনুভূতি জ্ঞান পদবাচ্য ।

সুখ-দুঃখাদির কারণ ও জ্ঞানের কারণ অভিন্ন হওয়ায় সুখ-দুঃখাদি জ্ঞানস্বরূপ বৌদ্ধদের এরূপ যুক্তিও যথাযথ নয় । কেননা একথা সত্য যে, জ্ঞানের সমবায়ী কারণ আত্মা, সুখ-দুঃখাদিরও সমবায়ী কারণ আত্মা এবং জ্ঞানের অসমবায়ী কারণ আত্মমনঃসংযোগরূপ , সুখ-দুঃখাদিরও অসমবায়ী কারণ আত্মমনঃসংযোগ । এইরূপ কারণগত দিক থেকে জ্ঞানের সঙ্গে সুঃখ-দুঃখাদির অভিন্নতা আছে । কিন্তু ন্যায় মতে, সমবায়ী কারণ ও অসমবায়ী কারণ অভিন্ন হলেও সুখ-দুঃখকে জ্ঞানস্বরূপ বলা যাবে না। কেননা কোন কার্যের পশ্চাতে কেবল সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণই থাকে না নিমিত্ত কারণও থাকে । নিমিত্ত কারণের ভেদ হলেও কার্যের ভেদ হয়ে থাকে ।[৩৩] এই সুখ-দুঃখের নিমিত্তকারণ হল ধর্ম ও অধর্মরূপ অদৃষ্ট । ন্যায় মতে, শুভাশুভ কর্মের ফল ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ভোগ নাও করতে পারে এমনকি কোন কোন কর্মের ফল সেই জন্মেই

ভোগ নাও করতে পারে । আবার কর্মবাদের নিয়ম অনুযায়ী কোন ব্যক্তির দ্বারা কৃত কর্মের ফল অন্য ব্যক্তিও ভোগ করতে পারবে না । ফলে সেই ব্যক্তির দ্বারা কৃত কর্মের ফল কালান্তরে ভোগের যে সম্ভাবনা নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন তার কারণরূপে ধর্ম ও অধর্ম স্বরূপ অদৃষ্টকে মধ্যবর্তী ব্যাপাররূপে স্বীকার করেন । ন্যায় মতে, কোন পদার্থ কোন কার্যের অব্যবহিত পূর্বক্ষণে থাকলে তবেই তাকে সেই কার্যের কারণ বলা যায় । যাগাদি কর্মের ফলে যে স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন হয় তা যাগাদি কর্মের বহু পরে উৎপন্ন হয়। স্বর্গাদি ফললাভ বহুপরভাবী হওয়ায় কার্য-কারণের নিয়ম অনুযায়ী যাগাদিকে সেই স্বর্গাদি ফলের জনক বলা যায় না । অথচ যাগাদি কর্মই যে সেই স্বর্গাদি ফলের জনক তা শাস্ত্রসম্মত । কাজেই তা অস্বীকার করা যায় না । এই কারণে নৈয়ায়িকগণ যাগাদি কর্ম ও স্বর্গাদি ফলের মধ্যে কার্যকারণভাব ব্যাখ্যা করার জন্য মধ্যবর্তী ব্যাপাররূপে ধর্ম ও অধর্মরূপ অদৃষ্ট নামক একটি গুণকে স্বীকার করেন । তাঁদের মতে, কোন শুভ কর্মের ফল ধর্মরূপে ও অশুভ কর্মের ফল অধর্মরূপে ব্যক্তির আত্মায় থেকে যায় । সেই ধর্মই পরবর্তীকালে সুখের জনক হয় এবং অধর্ম দুঃখের জনক হয় । এইরূপে ধর্ম ও অধর্মরূপ অদৃষ্টের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কার্য-কারণভাব স্বীকার করা হয়েছে ।[৩৪] একথা সত্য যে জন্য মাত্রের প্রতি অন্যতম কারণ হল অদৃষ্ট । কিন্তু প্রত্যেক কার্যেরই অন্য বিশেষ কারণ থাকে যে কারণের দ্বারা কার্যটি বিশেষিত হয়। সেই সমস্ত বিশেষ কারণগুলির সঙ্গে অদৃষ্টের যোগ্যতাস্বরূপ সম্বন্ধ থাকে । সুখের যে হেতু সেই হেতুর কারকগুলির সঙ্গে বা বিশেষ বিশেষ কারণগুলির সঙ্গেও ধর্মাধর্মের এরূপ সম্বন্ধ জন্য সুখ-দুঃখের সঙ্গে অন্যান্য কার্যের এমনকি জ্ঞানেরও ভেদ থাকে । ধর্মত্বরূপে ধর্ম সুখত্বাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সুখ মাত্রের কারণ এবং অধর্মত্বরূপে অধর্মরূপ দুঃখত্বাবচ্ছিন্নের অর্থাৎ দুঃখমাত্রের কারণ হলেও জ্ঞানের প্রতি কারণ হয় না । কাজেই জ্ঞান ও সুখ-

দুঃখের কারণ অভিন্ন এই আপত্তি যেমন যথাযথ হয় না তেমনি সেই কারণগত অভিন্নতার দ্বারা সুখ-দুঃখকে জ্ঞানস্বরূপ বলাও যুক্তিযুক্ত হয় না ।

আত্মায় উৎপন্ন এই জ্ঞান, ন্যায় মতে, চৈতন্যের সঙ্গে অভিন্ন । যা থাকলে কোন আশ্রয়কে চেতন বলা হয় এবং না থাকলে অচেতন বা জড় বলা হয় তাই জ্ঞান । জ্ঞান যাতে জন্মায় তাই চেতন পদার্থ । দেহাদি ভিন্ন এই চেতন পদার্থ, ন্যায় মতে, এক । তাই তাঁদের মতে, সে চেতনাবিশিষ্ট, সে জানে, সে দর্শন করে, সে উপলব্ধি করে প্রভৃতি একই অর্থকে বুঝিয়ে থাকে । চৈতন্য বিষয়ের প্রকাশক, বিষয়কে প্রদর্শন করে। চৈতন্য হল কোন কিছুর অস্তিত্বের প্রমাণ । চৈতন্যের ব্যবহার ব্যতীত কোন কিছু অস্তিত্বশীল তা বলা সম্ভব নয় । ধরা যাক্ আমি বললাম ‘ক’ অস্তিত্বশীল । কেউ যদি আমার এরূপ বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি চায় তখন আমি বলতে পারি আমি তা ‘প্রত্যক্ষ করছি’, ‘অনুমান করছি’ ইত্যাদি ইত্যাদি । কিন্তু এদের প্রত্যেকেই আমার চেতনায় প্রথমে উপস্থাপিত হতে হবে । কোন বিষয়ই আমি বলতে পারব না যদি না তা আমার চৈতন্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয় । তাদের সম্পর্কে চেতন না হলে কোনও বিষয়ের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা যাবে না, তার অস্তিত্বের দাবী করাও যাবে না ।[৩৫] একজন বস্তুবাদীর কাছে জগৎ অবশ্যই সৎ । কিন্তু তার অস্তিত্ব তার স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন না হলে তা সৎ রূপে প্রতিষ্ঠা করা যায় না । বস্তুবাদী হিসাবে জ্ঞান নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করলেও তার অস্তিত্ব যদি প্রতিষ্ঠা করতে হয় অথবা বস্তুর স্বরূপ নিরূপণ করতে হয় চৈতন্য নিরপেক্ষভাবে তা করা যাবে না । চৈতন্য স্বীকার না করলে পরিণামে জগতান্ধত্ব প্রসঙ্গ হবে । এই অর্থে জ্ঞান চৈতন্য স্বরূপ । আবার যদি জ্ঞান বা চৈতন্য অতিরিক্ত বস্তু না থাকে তবে বস্তু ও বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করার অবকাশ নেই। তাই জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন এটি হল বস্তুবাদের মূল স্বীকৃত সত্য । কিন্তু সাংখ্য দর্শনে

সেকথা স্বীকার করা হয় না । সাংখ্য দর্শনে চৈতন্যকে আত্মার ধর্মরূপে স্বীকার করা হয় না । তাঁদের মতে চৈতন্য, বুদ্ধি, উপলব্ধি ও জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ । সাংখ্য মতে, বুদ্ধি বা অন্তঃকরণের পরিণাম হল জ্ঞান । সাংখ্য দর্শনে স্বীকৃত মূল যে অচেতন প্রকৃতি তার প্রথম পরিণাম হল মহৎ বা বুদ্ধি । এই বুদ্ধির অপর নাম হল অন্তঃকরণ । যেহেতু অচেতন প্রকৃতির পরিণাম তাই বুদ্ধি তাঁদের মতে, জড় পদার্থ । বুদ্ধি বা অন্তঃকরণে যে জ্ঞান জন্মায় তাকে তাঁরা বলেছেন, সেই বুদ্ধিরই পরিণাম বিশেষ । সেই কারণে জ্ঞানকে বলা হয় বুদ্ধির ধর্ম, তা আত্মার ধর্ম নয় । পুরুষ বা আত্মা হল চৈতন্য স্বরূপ । চৈতন্যস্বরূপ হওয়ায় পুরুষ বা আত্মা চেতন । এই আত্মার কোন পরিণাম না থাকায় আত্মা তাঁদের মতে, অপরিণামী, অকর্তা, নিত্য ও চৈতন্যস্বরূপ । বুদ্ধি বা অন্তঃকরণে আত্মা প্রতিবিম্বিত হলে সেই বুদ্ধিতে স্থিত যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের সঙ্গে আত্মার এক অবাস্তব সম্বন্ধ হয়, তাই সাংখ্য মতে, উপলব্ধি । কিন্তু ন্যায় মতে, চৈতন্য, জ্ঞান, বোধ, উপলব্ধি প্রভৃতি ভিন্ন পদার্থ নয় । তাঁদের মতে, যাতে জ্ঞান জন্মায় তা চেতন পদার্থ । আর দেহাদি ভিন্ন এই চেতন পদার্থ এক । পূর্বেই বলা হয়েছে কোন বিষয়ে জ্ঞান হলে তবেই সেই জ্ঞান জন্য সেই বিষয়ে ব্যক্তির ইচ্ছা হয় এবং ইচ্ছা জন্য প্রযত্ন বা কৃতি হয়ে থাকে । সেই প্রযত্ন জন্য প্রবৃত্ত ব্যক্তির যদি সেই বিষয়ে পূর্বে দুঃখ উৎপন্ন হয় তাহলে সেই দুঃখজনক বস্তুর পুনরায় দর্শন হলে অতীতের দুঃখের স্মরণ বশতঃ সেই বিষয়ে দ্বেষ উৎপন্ন হয়ে থাকে । অর্থাৎ ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন প্রভৃতি হল জ্ঞান নির্ভর । কোন বিষয়ে জ্ঞান না হলে ব্যক্তির ইচ্ছা, প্রযত্ন ও দ্বেষ হতে পারে না । আবার এক ব্যক্তির জ্ঞান হলে তার দ্বারা অন্য ব্যক্তির ইছা, প্রযত্ন ও দ্বেষ জন্মায় না । কাজেই জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি এক আত্মার সঙ্গেই সম্বন্ধ । যদিও বোদ্ধা পুরুষ, উপলব্ধা পুরুষ, দ্রষ্টা পুরুষ প্রভৃতিরূপে ব্যবহার স্থলে ভিন্ন ভিন্ন কর্তার বোধ হতে

পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে চৈতন্য, বোধ, উপলব্ধি প্রভৃতি শব্দগুলি ভিন্ন হলেও তাদের অর্থগত ভেদ নেই । তাই সেক্ষেত্রে ন্যায় মতকে সমর্থন করেই বলতে হয় ঐ পদগুলি অভিন্নার্থক । তবে আত্মা চেতন হলেও সাংখ্য মত মেনে অন্তঃকরণকে চেতন বলে স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করেছেন নৈয়ায়িকগণ । তাঁদের মতে, একই শরীরে দুটি চেতন পদার্থ স্বীকার করলে উভয়ের কর্তৃত্ব নির্বাধ হতে পারে না ।[৩৬] যেহেতু 'আমি বোদ্ধা', 'আমি উপলব্ধি করছি' প্রভৃতি রূপে আত্মাতেই উপলব্ধি প্রভৃতির কর্তৃত্ব অনুভব সিদ্ধ সেহেতু চেতন পদার্থরূপে আত্মাকেই স্বীকার করতে হয় । তাঁদের মতে, আত্মায় জ্ঞানশক্তি থাকার জন্যই তা চৈতন্য ও চিতিশক্তি নামে কথিত হয় । তবে এই চৈতন্য আত্মার সঙ্গে অভিন্ন নয় । পূর্বেই বলা হয়েছে এই চৈতন্য আত্মাতে উৎপন্ন আগন্তুক বিশেষ গুণ । আর সেই চৈতন্যের আশ্রয়ই হল চেতন । সুতরাং সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনে 'জ্ঞান', 'বুদ্ধি' ও 'উপলব্ধি' শব্দগুলি বিশেষ বিশেষ অর্থের বাহক হলেও ন্যায় দর্শনে কিন্তু জ্ঞান, বুদ্ধি, উপলব্ধি, প্রত্যয়, প্রতীতি, ধী, সংবৃত্তি, প্রকাশ প্রভৃতি সমানার্থক।

জীবাত্মার ক্ষেত্রে গুণ স্বরূপ চৈতন্য বা জ্ঞান আগন্তুক ও অব্যাপ্যবৃত্তি ধর্ম । ন্যায় অধিবিদ্যায় জ্ঞান বা বুদ্ধির আধার বা আশ্রয়রূপে সিদ্ধ আত্মা নিত্য ও বিভু পদার্থ । বিভু আত্মায় তখনই জ্ঞানোৎপত্তির অবকাশ থাকে যদি তা শরীরের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় । কেননা শরীরাশ্রিত মন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ও তদবচ্ছিন্ন আত্মাতেই কেবল জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে । নিত্য ও বিভু আত্মা সর্বত্র থাকলেও ইন্দ্রিয়-সংযোগাদি বিশেষ বিশেষ কারণাভাবে তাতে সর্বক্ষণ জ্ঞান থাকে না । একইভাবে শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মায় জ্ঞান থাকলেও আত্মার সর্বত্র জ্ঞান থাকে না । যে আত্মায় জ্ঞান থাকে সেই আত্মাতে জ্ঞানের অভাবও থাকে । আত্মা বিভু হওয়ায় বা সর্বমূর্তসংযোগিত্ব ধর্ম আত্মাতে থাকায় মানব

দেহাবচ্ছেদে যেমন আত্মা থাকে তেমনি ঘট-পটাবচ্ছেদেও আত্মা থাকে । কিন্তু শরীরাবচ্ছিন্ন আত্মা জ্ঞানের জনক হলেও ঘট-পটাবচ্ছিন্ন আত্মায় জ্ঞান উৎপন্ন হয় না । জ্ঞানোৎপত্তির অন্যতম কারণ মন, ইন্দ্রিয়াদির অভাবে ঘট-পটাবচ্ছিন্ন আত্মায় জ্ঞান উৎপন্নই হতে পারে না । পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ন্যায় মতে, জ্ঞান নিত্য ও অনিত্য ভেদে দ্বিবিধ । পরমাত্মা ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য ও সর্ব বিষয়ক এক জ্ঞান । জীবাত্মাশ্রিত জ্ঞান কিন্তু অনিত্য । 'আমি সুখী', 'আমি দুঃখী' প্রভৃতিরূপে আত্মায় যে সুখ দুঃখের অনুভব হয় তার সমবায়ী কারণরূপে আত্মা অনুমিত হয়ে থাকে এবং সেই সমবায়িকারণের অবচ্ছেদক ধর্মরূপে আত্মত্বজাতি সিদ্ধ হয় । এই আত্মত্ব জাতির দ্বারা যেমন জীবাত্মা সিদ্ধ হয় তেমনি পরমাত্মাও সিদ্ধ হয়ে থাকে । যদিও বিশেষ গুণ সমূহের মধ্যে কোনটি বা কোন কোনটি ঈশ্বরে স্বীকৃত তা নিয়ে মত পার্থক্য আছে । কিন্তু ন্যায় মতে, পরমাত্মা ঈশ্বরের ক্ষেত্রে সুখ-দুঃখ প্রভৃতি উৎপন্ন না হলেও এগুলির কারণতাবচ্ছেদক আত্মত্বজাতি থাকায় ঈশ্বর এগুলির স্বরূপযোগ্য কারণরূপে স্বীকৃত । যাতে কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম থাকে তাকেই বলা হয় স্বরূপযোগ্য কারণ । ঈশ্বরে সুখ-দুঃখাদির কারণতাবচ্ছেক ধর্ম আত্মত্ব থাকায় ঈশ্বর স্বরূপযোগ্য কারণ । কিন্তু ঈশ্বরকে স্বরূপগত কারণরূপে স্বীকার করলেও সুখ-দুঃখাদি কার্য তাতে উৎপন্ন হয় না । কেননা স্বরূপযোগ্য কারণ থাকলেই কার্য উৎপন্ন হয় না । স্বরূপযোগ্য কারণের সঙ্গে সমস্ত সহকারী কারণের সমবধান হলে তবেই কার্য উৎপন্ন হয় এটিই নিয়ম । ঈশ্বরের ক্ষেত্রে সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হওয়ার স্বরূপযোগ্য কারণ থাকলেও অদৃষ্ট, শরীর প্রভৃতি সহকারী কারণের অভাব থাকায় সুখ-দুঃখ প্রভৃতি উৎপন্ন হতে পারে না । যদি বলা হয় সুখ-দুঃখাদি উৎপন্ন না হওয়ায় সমবায়ী কারণতাবচ্ছেকরূপে ঈশ্বরে আত্মত্বজাতি সিদ্ধ হতে পারে না তাহলে সেই আপত্তিও যুক্তিযুক্ত হয় না । মুক্তাবলীতে বিশ্বনাথ দেখিয়েছেন

ঈশ্বর অতিরিক্ত কোন দশম দ্রব্য নয় । তাই জ্ঞানবত্ত্বরূপ উপাধির দ্বারা নিত্য জ্ঞানের আধাররূপে ঈশ্বরকে সিদ্ধ করা যায় ।[৩৭] তবে জীবাত্মার ক্ষেত্রে এই জ্ঞান যেমন অনিত্য হয় তেমনি অব্যাপ্যবৃত্তিও হয় ।

ন্যায় মতে আত্মায় এই জ্ঞান, শরীর সম্বন্ধ ছাড়া যেমন উৎপন্ন হয় না, তেমনি উৎপন্ন হয়েও সাধারণতঃ দ্বিক্ষণের অধিক স্থায়ী হয় না অথবা তা তৃতীয়ক্ষণবিনাশী হয়। তাঁদের মতে আত্মার প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষ গুণ মাত্রই স্বোত্তরবৃত্তি যোগ্য-বিশেষগুণ নাশ্য ।[৩৮] সুখ-দুঃখাদির ন্যায় জ্ঞানও আত্মার অন্যতম একটি বিশেষ গুণ হওয়ায় কোন জ্ঞান উৎপত্তির পর তার উত্তরবর্তী জ্ঞানের দ্বারাই তা বিনষ্ট হয় ।[৩৯] এই জ্ঞান বা বুদ্ধি যে নিত্য হতে পারে না তা আমাদের অভিজ্ঞতাতেই দৃষ্ট হয় । বুদ্ধি যে অনিত্য তা প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের আত্মাতেই উপলব্ধি করতে পারে ।[৪০] 'আমি বুঝেছিলাম,' 'আমি বুঝব' প্রভৃতি রূপে জ্ঞানের ধ্বংস ও প্রাগভাব এরূপ ব্যবহারের দ্বারা সমর্তিত হয় । তবে কোন একটি অভিন্ন বিষয়ে প্রতিক্ষণে একই আকার উৎপন্ন হয় এরূপ স্বীকৃত হলেও সেই জ্ঞানধারার অন্তর্গত প্রতিটি জ্ঞান কিন্তু ভিন্ন । কাজেই ধারাবাহিক জ্ঞান প্রভৃতি স্থলে, যেখানে একই বিষয়ে একটিই জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলে বোধ হয়, সেখানেও আসলে একই বিষয়ে একাধিক জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং একাধিক জ্ঞানের মধ্যে উত্তরকালে উৎপন্ন জ্ঞান পূর্ব জ্ঞানের বিনাশকরূপে বিরোধী ।[৪১] দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞান যেমন প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানের বিরোধী হয় তেমনি আবার তৃতীয়ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞান দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানের বিনাশক হয় । সুতরাং ন্যায় মতে বুদ্ধি বা জ্ঞান অনিত্য । কিন্তু অনিত্য হলেও বুদ্ধি কি শব্দের মতো উৎপন্নাবর্গিণী অর্থাৎ তৃতীয়ক্ষণবিনাশিনী অথবা কুম্ভের মতো কালান্তস্থায়িনী– এরূপ সংশয়ের অবকাশ থেকেই যায় ।

ন্যায় মতে জ্ঞান শব্দ ও সুখাদির ন্যায় উৎপন্নাবর্গিণী অর্থাৎ তৃতীয় ক্ষণ বিনাশী । বুদ্ধি যে কালান্তরস্থায়ী হতে পারে না তার সমর্থনে তাঁরা বলেন কোন একটি বাণ নিক্ষেপ করলে বাণটি কোন স্থানে পতিত না হওয়া পর্যন্ত বাণের মধ্যে যে ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ হয় তাকে একটি মাত্র ক্রিয়া বলা যায় না । ঐ ক্রিয়া স্থান ভেদে নতুন নতুন স্থানের সঙ্গে নতুন নতুন সংযোগের জন্ম দেয় । ফলে সেই বিবিধ সংযোগ অভিন্ন ক্রিয়া নয় ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াই, যাকে ক্রিয়াসন্তান বলা হয় । এই ক্রিয়া সন্তানের মধ্যে কোন ক্রিয়াই অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না এবং একটি ক্রিয়ার বিনাশ হলেই অপর একটি ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় । একইভাবে ভিন্ন ভিন্ন ও অস্থায়ী ক্রিয়াসন্তানের যে প্রত্যক্ষবুদ্ধি আমাদের জন্মায় সেই বুদ্ধিও ভিন্ন ভিন্ন ও অস্থায়ী হয় । কেননা জন্যবুদ্ধি মাত্রই প্রত্যর্থনিয়ত । অর্থাৎ যে পদার্থটি বুদ্ধির নিয়ত বিষয় হয়, সেই পদার্থটি থেকে ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ সেই বুদ্ধির বিষয় হতে পারে না । কাজেই এক্ষেত্রে স্বীকার করতে হবে যে, বাণ নিক্ষেপের ফলে যে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াসন্তানের জন্ম হয় এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সন্তান বিষয়ে যে প্রত্যক্ষবুদ্ধি জন্মায় সেই প্রত্যক্ষবুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া বিষয়েই হয়, প্রত্যর্থনিয়তত্ববশতঃ একটি অভিন্ন বুদ্ধি হতে পারে না । ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া বিষয়ে উৎপন্ন প্রত্যক্ষবুদ্ধিও তেমনি ভিন্ন ভিন্নই হয় । ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া বিষয়ক ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যক্ষের সমষ্টিকেই বলা হয় বুদ্ধিসন্তান । যে বুদ্ধিসন্তানের অন্তর্গত প্রত্যেকটি বুদ্ধিই কর্মের ন্যায় অস্থায়ী, কালান্তস্থায়িনী বা বহুক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না । কেবল অস্থায়ী পদার্থ বিষয়ক বুদ্ধির ক্ষেত্রেই নয়, স্থায়ী পদার্থ বিষয়ে প্রত্যক্ষ বুদ্ধির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । তীরের মত অস্থায়ী পদার্থ বিষয়ে প্রত্যক্ষবুদ্ধি অস্থায়ী হলেও ঘট-পটাদি কিয়ৎকাল স্থায়ী পদার্থ বিষয়ে প্রত্যক্ষবুদ্ধি কিছুকাল স্থায়ী হবে– এরূপ আপত্তি যথার্থ নয় । কেননা কোন স্থায়ী প্রত্যক্ষ বিষয়ে প্রত্যক্ষবুদ্ধিকে যদি স্থায়ী বলা হয় এবং একই

নিয়মে বহুক্ষণস্থায়ী পদার্থের প্রত্যক্ষকে বহুক্ষণস্থায়ী বলা হয় সেক্ষেত্রে সেই বহুক্ষণস্থায়ী পদার্থটির স্থিতিকাল পর্যন্ত প্রত্যক্ষের স্থায়িত্ব স্বীকার করতে হবে । ফলে পদার্থটি সেখান থেকে ব্যবহিত হলেও বা পদার্থটিকে আবৃত করলেও প্রত্যক্ষ বিনষ্ট হয় না বলতে হবে । কিন্তু কোন পদার্থ ব্যবহিত হওয়ার পরেও বা পদার্থটিকে আবৃত করার পরেও 'আমি প্রত্যক্ষ করছি'– এরূপ অনুভব কোন ব্যক্তিরই হয় না । কাজেই স্থায়ী পদার্থের বিষয়ে প্রত্যক্ষ স্থায়ী একটি অভিন্ন প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় – একথা বলা যায় না । অস্থায়ী কি স্থায়ী যে কোন পদার্থের ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ স্থলে ধারাবাহিক নানা প্রত্যক্ষই স্বীকার করতে হয় । কিন্তু স্থায়ী পদার্থের প্রত্যক্ষ স্থলে প্রত্যক্ষের ক্ষণিকত্ব কেন স্বীকার করা হবে তার উত্তরে তাৎপর্যটীকাকার বলেছেন– পূর্বে ক্ষণকালস্থায়ী পদার্থ বিষয়ে যে ক্ষণিকত্ব বুদ্ধি অনুমানে করা হয়েছে তার দ্বারাই স্থায়ী পদার্থবিষয়ক বুদ্ধিরও ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হবে ।[৪২] অর্থাৎ স্থায়ী পদার্থ বিষয়ক প্রত্যক্ষবুদ্ধি যে স্থায়ী হয় না তা অনুমানের দ্বারাই প্রমাণিত হয় । এখন স্থায়ী পদার্থ বিষয়ে বুদ্ধির স্থায়িত্ব স্বীকার করলে সেই বুদ্ধি কোন্ কারণের দ্বারা কোন্ সময়ে বিনষ্ট হয় এবং সেই বুদ্ধি কতকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয় তা নিয়তরূপে নির্ধারণ করা যায় না । অর্থাৎ সেই বুদ্ধির বিনাশের কোন নিয়ত কারণ বলা যায় না । তদপেক্ষা যদি দ্বিতীয়ক্ষণ উৎপন্ন প্রত্যক্ষযোগ্য গুণবিশেষকে সেই বুদ্ধির বিনাশের প্রতি কারণ বলা হয় তাহলে সেই বুদ্ধির বিনাশের নিয়ত কারণ পাওয়া যায় । কাজেই অপেক্ষাবুদ্ধি ভিন্ন যেকোন জন্য বুদ্ধি শব্দাদির ন্যায় পরক্ষণে উৎপন্ন আত্মার প্রত্যক্ষযোগ্য গুণ বিশেষ পূর্বক্ষণে উৎপন্ন বুদ্ধির নাশক হয় । ফলে সেই বুদ্ধি কালান্তস্থায়ীও হয় না, উৎপন্নাবর্গিণী বা তৃতীয়ক্ষণ বিনাশী হয় ।

ন্যায় মতে একই বিষয়ে একই ক্ষণে কেবল একটি বিষয়ের জ্ঞানই উৎপন্ন হয়- এরূপ স্বীকৃত হওয়ায় এবং আত্মার প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষ গুণ জ্ঞানকে স্বোত্তরবৃত্তি জ্ঞানের

দ্বারা বিনষ্ট হয় একথা স্বীকার করায় আত্মার জ্ঞানাদি বিশেষ গুণ তৃতীয় ক্ষণ বিনাশী ইহা প্রমাণিত হয় । কেননা একটি জ্ঞান উৎপত্তির পরবর্তীক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হলে ও সেই জ্ঞান কালান্তরস্থায়ী হতে না পারলে সেই উৎপন্ন জ্ঞান নিত্য হতে পারে না । ধরা যাক্ প্রথম ক্ষণে কোন জ্ঞান উৎপন্ন হল । সেই ক্ষণে আর কোন জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না । কারণ যুগপৎ জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নয় । ধরা যাক্ দ্বিতীয় ক্ষণে অপর একটি জ্ঞান উৎপন্ন হল । এই ক্ষণে প্রথম ক্ষণোৎপন্ন জ্ঞান বর্তমান । এই দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞান তার পরক্ষণে বা তৃতীয় ক্ষণে প্রথম জ্ঞানের বিনাশ ঘটায়। ফলে প্রথম ক্ষণোৎপন্ন জ্ঞানকে তৃতীয় ক্ষণ বিনাশী বলে স্বীকার করতে হয় । একইভাবে দ্বিতীয় ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞান আবার তৃতীয়ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়। তাই ন্যায় মতে, অপেক্ষা বুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞান প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন হয়ে পরবর্তী ক্ষণে স্থিত হয় এবং দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয় । অর্থাৎ জ্ঞান তৃতীয়ক্ষণবিনাশী হয় । জ্ঞানাদি আত্মার বিশেষ গুণ গুলি তৃতীয় ক্ষণে বিনষ্ট না হলে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়াদি ক্ষণে একই জ্ঞানের উপস্থিতি স্বীকার করতে হবে । অর্থাৎ জ্ঞান তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট না হয়ে অধিক কালস্থায়ী হবে । ফলে বুদ্ধি বা জ্ঞান অধিক কালস্থায়ী পদার্থ হলে যে কাল পর্যন্ত বুদ্ধি থাকে সেই কাল পর্যন্ত বুদ্ধির বিষয় পদার্থ প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের বিষয়রূপেই থাকে বলতে হবে । কিন্তু সেকথা স্বীকার করলে সেই বিষয়ে আর স্মৃতি হতে পারে না । কেননা প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিনষ্ট হলে তবেই সেই বিষয়ে স্মৃতি হতে পারে । প্রত্যক্ষ জ্ঞান ক্ষণে কোন ব্যক্তির সেই বিষয়ে স্মৃতি হয় না ।[৪৩] কাজেই জ্ঞান স্মৃতিকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয় না । স্মৃতির পূর্বে স্মৃতির জনক জ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং সেই জ্ঞান জন্য সংস্কার স্মৃতিকাল পর্যন্ত স্থায়ী হয় । সেই জ্ঞান নিত্য হলে ন্যায় মতে, সেই জ্ঞান জন্য সংস্কার জন্মাতে পারবে না, তেমনি সংস্কারের অভাবে তজ্জন্য

স্মৃতিও সম্ভব হবে না ।[৪৪] কিন্তু স্মরণ যে আমাদের হয় সেই বিষয়ে অনুভবই প্রমাণ । কাজেই স্মৃতি প্রভৃতির ব্যাখ্যার জন্য মানতেই হয় যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে বিনষ্ট হয় ।

কোন জ্ঞান প্রকাশক বাক্যের উল্লেখ করে নৈয়ায়িক সম্মত জ্ঞানের বিভিন্ন উপকরণগুলির উপস্থাপনার কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি । ধরা যাক্ আমার জ্ঞান হচ্ছে 'আমি ঘটকে জানি'– এইরূপে । এক্ষেত্রে 'আমি' শব্দ দিয়ে যাকে বোঝাই তা হল পূর্বাপর কালস্থায়ী নিত্য আত্মা একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি । ঘট হল জ্ঞানের বিষয় । ন্যায় মতে, আমি ঘটকে জানি বলার অর্থ হল আমার ঘট বিষয়ক জ্ঞান আছে । অনেক সময় আবার আমরা এরূপ বাক্যও ব্যবহার করি যে, 'আমি চোখ দিয়ে ঘটকে দেখছি' । কার দ্বারা বা কিসের সাহায্যে ঘটকে জানছি এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে । চক্ষুরিন্দ্রিয় হচ্ছে এই জ্ঞানের জনক বা প্রমাণ । সুতরাং দেখা যাচ্ছে জ্ঞানের বিষয় বা প্রমেয় 'ঘট', প্রমাণ 'চক্ষু', প্রমাতা হল 'আমি' । যদিও জ্ঞানের সাহায্যেই এগুলিকে ব্যাখ্যা করা হয়, যেমন– জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞানের করণ, জ্ঞানের কর্তা প্রভৃতিরূপেই যথাক্রমে প্রমেয়, প্রমাণ ও প্রমাতাকে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে তাসত্ত্বেও এগুলি পরস্পর ভিন্ন । বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ প্রভৃতি দর্শনে প্রমেয়, প্রমাণ, প্রমাতা প্রভৃতির ভেদ অস্বীকৃত হয়েছে এবং সব কিছুর মূলে বিজ্ঞানকে স্বীকার করে ভাববাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন । কিন্তু জ্ঞান অতিরিক্ত জ্ঞানের বিষয়, করণ প্রভৃতিকে স্বীকার করে নৈয়ায়িকগণ বস্তুবাদকেই সমর্থন করেছেন । যেমন আমরা 'আমি এই ঘরে স্থিত ঘটকে জানি' এরূপ বাক্য প্রয়োগ করি তেমনি 'অন্যত্র স্থিত পটকে জানি না'– এইরূপ বাক্যও প্রয়োগ করি । এর দ্বারাই বোঝা যায় যে, আমি ঘটকে জানলেও পটকে জানি না, কিন্তু পট আছে । অর্থাৎ পটের অজ্ঞাত সত্তা আছে । সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায় পটের জ্ঞানাতিরিক্ত সত্তা যেমন আছে তেমনি যে বস্তুকে আমি জানি এবং যে বস্তুকে আমি

জানি না তাদের মধ্যেও পার্থক্য আছে । কিন্তু উৎপন্ন জ্ঞানকে সবিষয়করূপে স্বীকার করায় স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রশ্ন ওঠে বিষয়ের সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধটি কিরূপ ?

ন্যায় মতে, জ্ঞান ও বিষয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়েছে । এই জ্ঞান ও বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধকে বিষয়-বিষয়ীভাব সম্বন্ধ বা নিরূপ্য-নিরূপকভাব সম্বন্ধও বলা হয়ে থাকে । এই বিষয়-বিষয়ীভাবরূপ সম্বন্ধের সম্বন্ধী হল জ্ঞান ও বিষয় । বিষয় বিষয়ী জ্ঞানে থাকে বিষয়িতা সম্বন্ধে এবং জ্ঞান বিষয়ে থাকে বিষয়তা সম্বন্ধে । যেমন ঘটজ্ঞান স্থলে ঘট হল বিষয় এবং জ্ঞান বিষয়ী । তাই ঘটে জ্ঞান থাকে বিষয়তা সম্বন্ধে এবং জ্ঞানে ঘট থাকে বিষয়িতা সম্বন্ধে । প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক জ্ঞান সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক জ্ঞান ভেদে দ্বিবিধ । সবিকল্পক জ্ঞান স্থলে জ্ঞানের বিষয় হয় তিনটি– বিশেষ্য, প্রকার ও সংসর্গ । পূর্বোক্ত ঘট জ্ঞান স্থলে ঘট বিশেষ্য, ঘটত্ব প্রকার ও সমবায় সংসর্গ বিষয় হয়েছে । জ্ঞানের উক্ত বিষয় তিনটিতেই থাকে বিষয়তা । বিশেষ্যে থাকে বিশেষ্যতা নামক বিষয়তা, প্রকারে থাকে প্রকারতা নামক বিষয়তা এবং সংসর্গে থাকে সংসর্গতা নামক বিষয়তা । একইভাবে জ্ঞানে থাকে বিষয়িতা । জ্ঞানগত সেই বিষয়িতাও তিনটি– বিশেষ্যের জ্ঞানে থাকে বিশেষ্যতা নামক বিষয়িতা, প্রকারের জ্ঞানে থাকে প্রকারতা নামক বিষয়িতা এবং সংসর্গের জ্ঞানে থাকে সংসর্গতা নামক বিষয়িতা । একইভাবে জ্ঞান বিষয় জ্ঞানের নিরূপক হওয়ায় জ্ঞানের সাথে বিষয়ের নিরূপ্য-নিরূপকভাব থাকে ।

ন্যায় মতে আত্মার আগন্তুক গুণ, জ্ঞান বা বুদ্ধি হল নিরবয়ব এবং নিরাকার । বস্তুতঃ সাবয়ব পদার্থ বলতে আকার বিশিষ্ট পদার্থকে বোঝায় । গুণাদি পদার্থ নিরবয়ব ও নিরাকার । গুণ স্বরূপ জ্ঞানও সেই অর্থে নিরবয়ব ও নিরাকার । সাকার ও সাবয়ব

পদার্থেরই পরিণাম হয়ে থাকে । জ্ঞান নিরাকার ও নিরবয়ব হওয়ায় একই সঙ্গে জ্ঞান অপরিণামী । যে অর্থে অবয়বের সংযোজন ও বিয়োজনে মৃত্তিকা থেকে ঘটের পরিণাম হয়ে থাকে, সেই অর্থে নিরবয়ব জ্ঞানের কোনোরূপ পরিণাম বা পরিবর্তন ঘটে না । জ্ঞানকে নিরবয়ব, নিরাকার, অপরিণামীরূপে স্বীকার করার মাধ্যমে ন্যায়দর্শন সম্মত জ্ঞান যে, সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শন সম্মত জ্ঞানের প্রকৃতি থেকে পৃথক্ তাও স্বীকৃত হয়ে যায় । কেননা, সাংখ্য মতে প্রকৃতির পরিণাম হল বুদ্ধি এবং সেই বুদ্ধিরই পরিণাম বিশেষ হল জ্ঞান । অন্যদিকে বেদান্ত দর্শন এবং যোগাচার ও সৌত্রান্তিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় মতে জ্ঞান সাকার । যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ জ্ঞানের আকার অতিরিক্ত কোন বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না । জ্ঞান অতিরিক্ত বাহ্য বস্তু স্বীকার না করায় তাঁদের মতে, জ্ঞানের আকার জ্ঞানের নিজস্ব । অর্থাৎ তাঁদের মতে, জ্ঞান সাকার । জ্ঞানে যে আকার প্রতিভাত হয় তা প্রকৃতই জ্ঞানে বর্তমান, অন্য কিছুতে নয় । অর্থাৎ জ্ঞানে যে আকার তা বাহ্য বস্তুর আকার জন্য জ্ঞানের আকার নয় । জ্ঞান অতিরিক্ত কোন কিছুর অস্তিত্ব না থাকায় জ্ঞান থাকার অর্থই হল জ্ঞান প্রকাশিত হওয়া । অর্থাৎ জ্ঞান থাকা ও তার প্রকাশ হওয়া অভিন্ন । তাঁদের মতে, জ্ঞান নিজে নিজেই প্রকাশিত হয়, পরবর্তীকালে উৎপন্ন কোন জ্ঞানের দ্বারা নয় । অর্থাৎ জ্ঞান তাঁদের মতে, স্বপ্রকাশ। যে ক্ষণে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই ক্ষণেই জ্ঞানের জ্ঞানও হয় । সুতরাং জ্ঞানের সাকারত্ব ও স্বপ্রকাশত্ব ভাববাদের পূর্বস্বীকৃতি । অন্যদিকে সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় মতেও জ্ঞান সাকার । তবে জ্ঞানকে সাকার বলে স্বীকার করলেও সৌত্রান্তিক মতে, বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়নি । তাঁরা ক্ষণিকত্ববাদ স্বীকার করেন । ক্ষণিকত্ববাদ অনুসারে সব কিছুই ক্ষণিক হওয়ায় বস্তু উৎপন্ন হয়েই পরক্ষণে বিনষ্ট হয় । ফলে যখন বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান হয় সেই ক্ষণে অর্থ বা বিষয় বিনষ্ট হয়ে যায় । তাই সেই ক্ষণিক বস্তু

জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না । কিন্তু বস্তু বিনষ্ট হলেও তার আকার জ্ঞানে অর্পণ করে বস্তুটি বিনষ্ট হয় । তাকেই বলা হয় বিষয়স্বারূপ্য বা অর্থস্বারূপ্য । যেহেতু তাঁরা ধর্ম ও ধর্মীর মধ্যে ভেদ স্বীকার করেন না । তাই তাঁদের মতে, অর্থস্বারূপ্য ও অর্থস্বারূপ্যযুক্ত জ্ঞান অভিন্ন । এই অর্থস্বারূপ্যই তাঁদের মতে প্রমাণ, যা অর্থপ্রতীতি উৎপন্ন করে এবং এর দ্বারা বাহ্যার্থ অনুমিত হয় । কিন্তু ন্যায় মতে, জ্ঞান নিরাকার । পূর্বেই উল্লেখ করা হয়ে তাঁদের মতে, জ্ঞানের নিজস্ব কোন আকার নেই । তার আকার বাহ্যবস্তুরই আকার। অর্থাৎ জ্ঞানে যে আকার প্রতিভাত হয় তা বাহ্য বস্তুরই আকার । আবার কোন জ্ঞান সেই জ্ঞান ভিন্ন বস্তুর প্রকাশক হওয়ায় জ্ঞান নিজের প্রকাশক হতে পারে না । সেই কারণেই জ্ঞান স্বপ্রকাশ নয় । তা অন্য জ্ঞানের ওপর নির্ভর করে প্রকাশিত হয় । সুতরাং বস্তুবাদের পূর্বস্বীকৃতি হল জ্ঞান নিরাকার এবং জ্ঞান পরতঃপ্রকাশ । তবে জ্ঞান নিরাকার হলেও যখনই আমরা কোন প্রকাশযোগ্য জ্ঞানকে বাক্যের আকারে উপস্থাপন করি তখন নিয়তই কোন না কোন আকারে প্রকাশ করি । যেমন ‘এটি ঘট’– এরূপ বাক্যাকারে প্রকাশিত জ্ঞানে ‘এটি’- এই শব্দ দ্বারা সম্মুখবর্তী বস্তুকে জ্ঞানের বিশেষ্যরূপে উপস্থাপনা করা হয় এবং ‘ঘটত্ব’ জ্ঞানটির প্রকারাংশে ভাসমান হয় । সুতরাং জ্ঞানে নির্দিষ্ট আকার না থাকলেও ভাষায় জ্ঞানকে প্রকাশিত করতে গেলে বিশেষ্য, প্রকার ইত্যাদির উপস্থাপনা করতে হয় । এই সমস্ত ক্ষেত্রে জ্ঞানে আকারের যে কল্পনা তা জ্ঞানে অনুভূয়মান ‘তত্তদর্থাকারতা’, তত্তদর্থবিষয়তা’ ছাড়া কিছু নয় । বস্তুতঃ জ্ঞানের যে আকার আপাতদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় তা জ্ঞানের নিজস্ব আকার নয় । তা বিষয়েরই আকার, যে বিষয় সেই জ্ঞান থাকে ভিন্ন । সেই জ্ঞান, তাঁদের মতে, স্বপ্রকাশ নয় । জ্ঞান, তাঁদের মতে, প্রকাশের জন্য জ্ঞানান্তরের উপর নির্ভরশীল । সুতরাং নৈয়ায়িক মতে, জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রকাশ ভিন্ন ।

ন্যায় দর্শনে আলোচিত এই 'জ্ঞান' শব্দটিকে অনেক ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে । সেখানে জ্ঞান বলতে যেমন অনুভবকে বোঝানো হয়েছে, তেমনি স্মৃতিকেও জ্ঞানরূপে গণ্য করা হয়েছে । তাই জ্ঞান তাঁদের মতে, অনুভব ও স্মৃতি ভেদে দ্বিবিধ । শুধু তাই নয় প্রমাত্মক প্রত্যক্ষাদি অনুভবের পাশাপাশি ভ্রমাদি অপ্রমাকেও সেখানে জ্ঞান বলে স্বীকার করা হয়েছে । পাশ্চাত্ত্য দর্শনে জ্ঞানের অন্যতম আবশ্যিক শর্তরূপে সত্যতা স্বীকৃত হলেও প্রাচ্যের অধিকাংশ দর্শনেই তা অস্বীকৃত হয়েছে । মীমাংসক গুরু প্রভাকর প্রমুখ জ্ঞান মাত্রের সত্যতা স্বীকার করলেও নৈয়ায়িকগণ তা অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, অনুভব যথার্থ বা প্রমা হতে পারে অযথার্থ বা অপ্রমাও হতে পারে আবার প্রমা ও অপ্রমা বহির্ভূতও হতে পারে, যেমন – নব্য ন্যায় মতে, নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ । তবে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকে প্রমা ও অপ্রমার বহির্ভূত বলা যায় কিনা সেই বিষয়ে বিরুদ্ধ মতও আছে । আসলে যাঁরা নির্বিকল্পক জ্ঞানকে প্রমা ও অপ্রমা বর্হিভূত বলেন তাঁদের মতে, জ্ঞানের সত্যতা কিংবা মিথ্যাত্বের প্রশ্ন ওঠে বিশিষ্ট জ্ঞানের ক্ষেত্রে । বিশিষ্ট জ্ঞান স্থলে বিশেষ্য, প্রকার ও বিশেষ্য প্রকারের সম্বন্ধ গৃহীত হয় । অবিশিষ্ট জ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্যতা কিংবা মিথ্যাত্বের প্রশ্ন ওঠে না । কেননা জ্ঞান প্রকারাংশেই ভ্রান্ত হয়ে থাকে ধর্মী অংশে নয় । ধর্মী অংশে জ্ঞান সর্বদাই অভ্রান্ত ।[৪৫] যেমন– রজ্জুকে প্রত্যক্ষ করে 'অয়ং সর্প' এরূপ ভ্রম হলে সম্মুখস্থ যে রজ্জুর 'অয়ং' রূপে জ্ঞান হয় সেটিই উক্ত ভ্রম স্থলে বিশেষ্য বা ধর্মী । এই ধর্মী অংশে কোন ভ্রম হয় না । ভ্রম হয় 'সর্পত্ব' রূপ প্রকারাংশে । অর্থাৎ জ্ঞানের বিশেষ্যরূপে ভাসমান হয়েছে যা তা প্রকৃতপক্ষে প্রকারাংশে ভাসমান ধর্মবিশিষ্ট নয় । সমস্ত জ্ঞানের ধর্মী অংশে যে ভ্রম সম্ভব নয় তা তাৎপর্যটীকাকার থেকে বার্ত্তিককার সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন । সেই কারণে নিষ্প্রকারক জ্ঞানের সত্যতা কিংবা মিথ্যাত্ব নির্ণয়ের প্রশ্ন ওঠে না ।[৪৬]

যদিও এই তৃতীয় পক্ষে অর্থাৎ অবিশিষ্ট জ্ঞানের বা সংশয়াত্মক জ্ঞানের সত্যতা ও মিথ্যাত্ব প্রশ্নে প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িকগণের মধ্যে মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায় তাসত্ত্বেও বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমা ও ভ্রমাদি অপ্রমা উভয়ই যে জ্ঞান পদবাচ্য সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই । তাই প্রত্যক্ষাদি যথার্থ জ্ঞান যেমন সেখানে স্বীকৃত হয়েছে তেমনি অযথার্থ ভ্রমাদিকেও জ্ঞান বলে স্বীকার করা হয়েছে ।

হান, উপাদান, উপেক্ষাও ন্যায় মতে, বুদ্ধি । তাঁদের মতে, বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণ একইভাবে সেই ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষজন্য যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ, তা হান, উপাদান, উপেক্ষা বুদ্ধির হেতু । এই অর্থে জ্ঞানরূপ প্রমাণের যে ফল হান, উপাদান ও উপেক্ষা সেগুলিও বুদ্ধি পদ বাচ্য ।[৪৭] উক্ত ত্রিবিধ বুদ্ধির মধ্যে যার দ্বারা হেয়ত্ববোধ করে কোন কিছু ত্যাগ করা হয় সেরূপ বুদ্ধি বা জ্ঞানই হল হানবুদ্ধি । যে বুদ্ধির দ্বারা উপাদেয়ত্ব অর্থাৎ গ্রাহ্যত্বের বোধ করে কোন কিছু গ্রহণ করা হয় তাকে বলা হয় উপাদানবুদ্ধি । অন্যদিকে যে বুদ্ধির দ্বারা উপেক্ষত্বের বোধ করে কোন কিছু উপেক্ষা করা হয় তাই হল উপেক্ষাবুদ্ধি । কোন পদার্থ বিষয়ে জ্ঞান হওয়ার পর জ্ঞাতার সেই বিষয় সম্বন্ধে হেয়ত্ব অথবা গ্রাহ্যত্ব অথবা উপেক্ষণীয়ত্বের জ্ঞান হয় । হেয় রূপে জ্ঞান হলে, সেই পদার্থটিকে অপকারী বলে বুঝলে, জ্ঞাতা সেই পদার্থটিকে ত্যাগ করে, উপাদেয় বা গ্রাহ্য রূপে বোধ হলে অর্থাৎ পদার্থটিকে উপাদেয় বলে বোধ হলে সেই পদার্থকে সে গ্রহণ করে এবং উপেক্ষণীয় বুদ্ধি হলে অর্থাৎ পদার্থটিকে যখন জ্ঞাতা গ্রহণীয় বা ত্যাজ্য কোন রূপেই বোঝে না তখন সেই পদার্থ তার কাছে উপেক্ষণীয় । এইরূপে যেকোন পদার্থের গ্রহণ, ত্যাগ অথবা উপেক্ষা করতে হলে তার পূর্বে সেই বিষয়ে গ্রাহ্যত্ব, ত্যাজ্যত্ব অথবা উপেক্ষত্বের বোধ বা জ্ঞান অবশ্যই স্বীকার্য ।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে বস্তুর জ্ঞান হওয়ার পর সেই বিষয়ে হানাদি ব্যবহার প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য কিন্তু তার পূর্বে গ্রাহ্যত্বাদি বোধ উৎপন্ন হয় কীরূপে ? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন অনুমানে প্রমাণের দ্বারাই গ্রাহ্যত্বাদি বোধ আমাদের হয়ে থাকে । যেমন– পূর্বে কোন বিষয় গ্রহণ করে উপকার পাওয়ার পর সেরূপ বস্তু মাত্রই গ্রাহ্য– এরূপ ব্যাপ্তিনিশ্চয়জন্য সংস্কারবশতঃ ব্যাপ্তি স্মরণ হলে বস্তুটি তজ্জাতীয় অর্থাৎ গ্রাহ্যত্ব ব্যাপ্য তাদৃশ ধর্ম বিশিষ্ট– এরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় । এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানই ঐ পদার্থটির গ্রাহ্যত্বের অনুমাপক লিঙ্গপরামর্শ নামক অনুমানে প্রমাণ । তাদৃশ ধর্মবত্ত্ব হল উক্ত অনুমানের লিঙ্গ এবং এই পদার্থটি তজ্জাতীয়– এরূপ যে পরামর্শ জ্ঞান হয় সেটিই হল উপাদানবুদ্ধি । একইভাবে কোন পদার্থকে পূর্বে পরিত্যক্ত রূপে জ্ঞান হওয়ার বা পদার্থটি গ্রহণীয় নয় এইরূপে জ্ঞান হওয়ার পরে একইরকম পদার্থ দর্শন করলে ব্যাপ্তিস্মরণ, পরামর্শ প্রভৃতির দ্বারা পদার্থটি তজ্জাতীয়– এরূপ যে পরামর্শ জ্ঞান হয় তাই উক্ত স্থলে হানবুদ্ধি । একইভাবে হেয়ত্ব ও গ্রাহ্যত্বের ন্যায় উপেক্ষত্বও ব্যাপ্তি ও পরামর্শজন্য অনুমানে লব্ধ । ন্যায় মতে, এই হান, উপাদান ও উপেক্ষাবুদ্ধি হল প্রমিতি। কেননা হানাদি বুদ্ধি প্রমাণের ফল । ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে, ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হানাদিবুদ্ধিরূপ ফলের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ । তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও একইভাবে বলেছেন প্রত্যক্ষরূপ জ্ঞান তৃতীয়ক্ষণ বিনাশী হওয়ায় হানাদি বুদ্ধির অব্যবহিত পূর্বে জ্ঞান থাকে না । তবে জ্ঞান হানাদির অব্যবহিত পূর্বে না থাকলেও পরম্পরায় ইন্দ্রিয় ও সন্নিকর্ষ হানাদিবুদ্ধির কারণ হওয়ায় হানাদিবুদ্ধিকে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান বলা হয় ।[৪৮] তবে যাই হোক্ ন্যায় মতে, এই হানাদিও কিন্তু বুদ্ধি । সুতরাং ন্যায়দর্শনে ‘জ্ঞান’ শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক ।

তথ্যসূত্র

১. প্রাশ্চাত্যের কান্ট, আলেকজান্ডার প্রমুখ জ্ঞানকে ক্রিয়া বলে স্বীকার করেন । 'ক্রিটিক অফ পিয়োর রিজন' গ্রন্থে কান্ট স্পষ্টই দেখিয়েছেন জ্ঞান সাংশ্লেষণিক ক্রিয়া অতিরিক্ত কিছু নয় ('Knowledge happens as an effect of it under some suitable conditions.'- Kant : *Critique of Pure Reason*, 1958, p.16.)। আলেকজান্ডার তাঁর 'স্পেস টাইম এবং ডেইটি' গ্রন্থে দেখিয়েছেন জ্ঞান একধরণের মানসিক ক্রিয়া (Gupta, Kalyan Chandra : *Studies in Philosophy*, 1965, p.16.)

২. 'জ্ঞানজন্যা জ্ঞাততা প্রত্যক্ষা, তথা চ জ্ঞানমনুমীয়া'– ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ, পঞ্চানন, ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী,২০০৩, পৃ. ৪৩৬.

৩. ঝা, গঙ্গানাথ, *দি প্রভাকর স্কুল অফ পূর্ব মীমাংসা*, ১৯১১, পৃ. ২৬.

৪. প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে আরেকটি মতবাদও প্রচলিত আছে । যেখানে বলা হয় জ্ঞান সম্বন্ধ স্বরূপ । জ্ঞানকে সম্বন্ধরূপে ব্যাখ্যা করেন মূলতঃ পাশ্চাত্ত্যের কোহেন ও নাজেল নামক দুই দার্শনিক । এই সম্বন্ধবাদীদের মতে, জ্ঞান জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে একধরণের সম্বন্ধ । জ্ঞানোৎপত্তি স্থলে জ্ঞাতা যেরূপে কোন এক জ্ঞেয় বস্তুকে নির্দেশ করে তেমনি জ্ঞেয় বস্তুও জ্ঞাতাকে অপেক্ষা করে । তাই জ্ঞান হল এই দুয়ের মধ্যেকার সম্বন্ধ । তবে এই সম্বন্ধ গুণ হতে পারে না । কেননা সম্বন্ধ সম্বন্ধীগুলিকে নির্দেশ করলেও গুণের ন্যায় বিশেষিত করে না । গুণ যেরূপে গুণীকে বিশেষিত করে থাকে সম্বন্ধ সেরূপ কোন সম্বন্ধীকেই বিশেষিত করে না । এই সম্বন্ধ কোন গুণী বা দ্রব্যও হতে পারে না । কেননা দ্রব্যের ন্যায় সম্বন্ধ গুণের কিংবা ক্রিয়ার

দ্বারা বিশিষ্ট নয় । সম্বন্ধের যেমন কোন গুণ বা ক্রিয়া থাকে না তেমনি সম্বন্ধ অন্য কোন সম্বন্ধের সম্বন্ধীও হতে পারে না । অথচ গুণাধিকরণত্ব, ক্রিয়াধিকরণত্ব কিংবা সমবায়ীকারণত্ব বা সম্বন্ধীরূপেই দ্রব্যের পরিচয় । সম্বন্ধকে ক্রিয়াও বলা যায় না । সুতরাং উক্ত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যবর্তী সম্বন্ধ স্বরূপ জ্ঞানকে গুণ, গুণী কিংবা ক্রিয়ারূপে স্বীকার করা যায় না ।

৫. ধর্মোত্তর, *ন্যায়বিন্দুটীকা,* ২০০৭, পৃ.২.

৬. 'জ্ঞানস্য সবিষয়কত্বাৎ'– বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদঃ,* ১৩৭৪, পৃ. ২২৮.

৭. ঐ, পৃ. ২৩৬.

৮. গুণত্ববাদী নৈয়ায়িকগণ জ্ঞানকে সম্বন্ধ বলতে পারেন না । কেননা জ্ঞানকে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যস্থ সম্বন্ধরূপে ব্যাখ্যা করলে প্রশ্ন হবে এটি স্বীকৃত কোন্ সম্বন্ধের অন্তর্গত – সংযোগ, সমবায়, নাকি স্বরূপ । প্রথমতঃ জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয় উভয়ই যদি দ্রব্য হয় তবে উক্ত সম্বন্ধ সংযোগ হওয়াই স্বাভাবিক । যেহেতু অবয়ব-অবয়বী ভিন্ন দ্বিবিধ দ্রব্যের মধ্যস্থ সম্বন্ধ সংযোগই হয়ে থাকে । কিন্তু প্রশ্ন হল জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয় উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ সংযোগ কীরূপে হতে পারে ? উভয়ের মধ্যে সংযোগ সম্বন্ধ তখনই সম্ভব হতে পারে যখন জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাতার সঙ্গে এসে সম্বন্ধিত হবে অথবা জ্ঞাতা বিষয় দেশে গমণ করে বিষয়ের সঙ্গে সম্বদ্ধ হবে । কিন্তু জ্ঞানোৎপত্তি স্থলে এই দ্বিবিধ বিকল্পের কোনটিই সম্ভব নয় । বাহ্য প্রত্যক্ষস্থলে আত্মা বাহ্য বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি সম্বন্ধ হতে পারে না । আত্মা মনের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়, মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এবং সেই ইন্দ্রিয় বিষয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় । দেহ তথা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে কোন বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধই পরোক্ষভাবে আত্মার সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধের জনক হলেও বাহ্য বিষয় যেমন

জ্ঞাতা বা আত্মার সঙ্গে সরাসরি সম্বন্ধিত হতে পারে না, তেমনি দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাও দেহ পরিত্যাগ পূর্বক বিষয় সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারে না । কেননা ইন্দ্রিয় সংযুক্ত মনের দ্বারা কেবল দেহাবচ্ছিন্ন আত্মাতেই জ্ঞান উৎপন্ন হয়, দেহ অনবচ্ছিন্ন বা দেহশূণ্য আত্মাতে নয়('মনসঃ খলু ভোঃ সেন্দ্রিয়স্য শরীরে বৃত্তিলাভো নান্যত্র শরীরাৎ,.............'– বাৎস্যায়ন, *ন্যায়সূত্র-ভাষ্য,* ১৯৮২, পৃ. ৩৩৫) । দ্বিতীয়তঃ অযুতসিদ্ধ পদার্থ না হওয়ায় জ্ঞাতা ও বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ যে সমবায় হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য । কেননা সমবায় সম্বন্ধ হল অযুতসিদ্ধ পদার্থের মধ্যে সম্বন্ধ । অযুতসিদ্ধ পদার্থ বলতে – 'যয়োর্দ্বয়োর্মধ্যে একম্ অবিনশ্যদ্ অপরাশ্রিতম্ এব অবতিষ্ঠতে, তৌ অযুতসিদ্ধৌ' । অর্থাৎ যে দুটি পদার্থের মধ্যে কোন একটি নিজের বিনাশের অসন্নিধানকালে অপরটির আশ্রিত হয়েই থাকে, সেই পদার্থদ্বয়কে অযুতসিদ্ধ পদার্থ বলা হয় । যেমন – গুণ কিংবা কর্ম দ্রব্যে, জাতি ব্যক্তিতে, বিশেষ নিত্যদ্রব্যে, অবয়বী অবয়বে বিনাশের অসন্নিধান কাল পর্যন্ত আশ্রিত হয়েই থাকে । কাজেই দ্রব্য-গুণ, দ্রব্য-কর্ম, ব্যক্তি-জাতি, নিত্যদ্রব্য-বিশেষ ও অবয়ব-অবয়বী অযুতসিদ্ধ পদার্থ । কিন্তু জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাতাতে কিংবা জ্ঞাতা বিষয়ে বিনাশের অসন্নিধান কাল পর্যন্ত আশ্রিত না থাকায় কিংবা উভয়ের মধ্যে আধার-আধেয়ভাব না থাকায় উভয়ের মধ্যস্থ সম্বন্ধ সমবায় হতে পারে না । উভয়ের মধ্যস্থ সম্বন্ধকে যদি স্বরূপ বা তাদাত্ম্য বলা হয় তাহলে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়কে অভিন্ন বলতে হয়, যা তাঁদের অভিপ্রেত নয় । কেননা জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয় তাদাত্ম্য তথা অভিন্ন হলে জ্ঞাতার বিষয় জ্ঞানের নিমিত্ত জ্ঞানোৎপত্তির কোন প্রয়োজনই থাকত না । কেবল জ্ঞানই একমাত্র মাধ্যম যার দ্বারা জ্ঞাতার কোন বিষয় সম্পর্কে উপলব্ধি হয়ে থাকে । কিন্তু জ্ঞাতা ও বিষয় অভিন্ন হলে বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাতার উপলব্ধি সর্বদাই থাকত । ফলত সকলের সর্ব বিষয়ে জ্ঞান পূর্ব থেকে থাকলে সকলের

সর্বজ্ঞত্বের আপত্তি হত । কিন্তু তা হয় না । আমাদের সর্বত্র সকল বিষয়ে জ্ঞান থাকে না । ফলে জ্ঞানকে সম্বন্ধরূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় ।

৯. 'তস্মান্ন ক্রিয়াত্মকং জ্ঞানম্'– জয়ন্ত ভট্ট, *ন্যায়মঞ্জরী*, ১৯৭১, পৃ. ১৯.

১০. কেশব মিশ্র, *তর্কভাষা*- দ্বিতীয়খণ্ড, ২০০৯ পৃ. ২.

১১. ঐ, পৃ. ৩.

১২. বাৎস্যায়ন, *ন্যায়সূত্র-ভাষ্য*, ১৯৩৬-৪৪, পৃ. ৮৭৫.

১৩. 'নেন্দ্রিয়াণামর্থানাং বা গুণো জ্ঞানং, তেষাং বিনাশেঽপি জ্ঞানস্য ভাবাৎ'- ঐ, পৃ. ৮৫০.

১৪. '.........ন তস্য গুণো জ্ঞানং'- ঐ, পৃ. ৮৫১.

১৫. 'স্বতন্ত্র, অর্থাৎ যে অন্যকারকের দ্বারা পরিচালিত নহে'- ভট্টাচার্য, শ্রীমোহন ও দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতীয় দর্শন কোষ- প্রথমখণ্ড*, ১৯৭৮, পৃ. ৫৫.

১৬. মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, *আমি ও আমার মন*, ২০১৬, পৃ. ২১-২২.

১৭. 'মনসোঽণুত্বাৎ প্রত্যক্ষে চ মহত্ত্বস্য হেতুত্বান্মনসি জ্ঞানসুখাদিসত্ত্বে তৎপ্রত্যক্ষানুপপত্তিরিত্যর্থঃ'– বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদ মুক্তাবলী*, কারিকা– ৪৯.

১৮. 'পারতন্ত্র্যাৎ, - পরতন্ত্রাণি ভূতেন্দ্রিয়মনাংসি ধারণ-প্রেরণ-ব্যূহনক্রিয়াসু প্রযত্নবশাৎ, প্রবর্ত্তন্তে, চৈতন্যে পুনঃ স্বতন্ত্রাণি স্যুরিতি' ।- বাৎস্যায়ন, *ন্যায়সূত্র-ভাষ্য*, ১৯৩৬-৪৪, পৃ. ৮৭৩.

১৯. বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদ*, কারিকা– ৪৮.

২০. 'অনন্তসংস্কার কল্পতে গৌরবাৎ' - বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদ মুক্তাবলী,* কারিকা- ৪৮.

২১. 'নানা শরীরেষু নানাজ্ঞাতারো বুদ্ধ্যাদিগুণব্যবস্থানাৎ.........'– বাৎস্যায়ন, *ন্যায়সূত্র-ভাষ্য,* ১৯৩৬-৪৪, পৃ. ৮৭১.

২২. 'ন সর্ব্বেষ্বিত্যনিয়মোপপত্তিঃ'- ঐ, পৃ. ৮৭০.

২৩. 'অকৃতাভ্যাগমাচ্চ......'- ঐ, পৃ. ৮৭৪.

২৪. '....অচৈতন্যে তু তৎসাধনস্য স্বকৃতকর্ম্মফলোপভোগঃ পুরুষস্যেত্যুপপদ্যতে ইতি' ।- ঐ।

২৫. 'ভূতেন্দ্রিয়মনসাং প্রতিষেধে দ্রব্যান্তরং ন প্রসজ্যতে, শিষ্যতে চাত্মা, তস্য গুণো জ্ঞানমিতি জ্ঞায়তে'।- ঐ, পৃ. ৮৭৫.

২৬. 'ইচ্ছাদয়ো গুণাঃ গুণাশ্চ দ্রব্যসংস্থানাঃ ......'- বাৎস্যায়ন, *ন্যায়সূত্র-ভাষ্য,* ১৯৮১, পৃ. ১৭১.

২৭. 'বুদ্ধিসুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাস্ত্বন্তঃকরণগ্রাহ্যাঃ'– প্রশস্তপাদাচার্য, *প্রশস্তপাদভাষ্য-*দ্বিতীয়ভাগ, ২০০০, পৃ. ১৬৭.

২৮. 'যজ্জাতীয়স্যার্থস্য সন্নিকর্ষাৎ সুখমাত্মোপলব্ধবান্, তজ্জাতীয়মেবার্থং পশ্যন্নুপাদাতুমিচ্ছতি'– বাৎস্যায়ন, *ন্যায়সূত্র-ভাষ্য,* ১৯৩৬-৪৪, পৃ. ১৮৫.

২৯. 'স্বার্থং পরার্থং বা অপ্রাপ্তপ্রার্থনেচ্ছা'– প্রশস্তপাদাচার্য, *প্রশস্তপাদভাষ্য,* ২০০০, পৃ. ৪৩১.

৩০. 'সুখাদ্যভিপ্রেতবিষয়সান্নিধ্যে ....'- ঐ।

৩১. ‘বিষাদ্যনভিপ্রেতবিষয়সান্নিধ্যে.........’- ঐ।

৩২. ‘ন তু বিষয়গ্রহণস্বভাবং সুখং দুঃখঞ্চানুভূয়তে’– জয়ন্তভট্ট, *ন্যায়মঞ্জরী*, ২০০৬, পৃ. ৩৭০.

৩৩. ‘নিমিত্তকারণান্যত্বমপি কার্যস্য ভেদকম্’- ঐ, পৃ. ৩৭৩.

৩৪. ‘ধর্মত্বন সুখত্বেন কার্যকারণভাব ইত্যর্থঃ...........অধর্মত্বন দুঃখত্বেন কার্যকারণভাব ইত্যর্থঃ’– বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদঃ*, ১৩৭৪, পৃ. ৫৪৭-৫৪৮.

৩৫. মহান্তি, জে. এন. , *রিজন অ্যান্ড ট্রাডিশন ইন ইন্ডিয়ান থট – অ্যান এসে অন দি নেচার অফ ইন্ডিয়ান ফিলোজফিকাল থিঙ্কিং*, ১৯৯২, পৃ. ৫১.

৩৬. ‘,,,,,,,তত্রোভয়োশ্চেতনত্বা-দন্যতরলোপ ইতি’– বাৎস্যায়ন, *ন্যায়সূত্র-ভাষ্য*, ১৯৩৬-৪৪, পৃ. ৮১৩.

৩৭. ‘ন চ দশমদ্রব্যত্বাপত্তিঃ, জ্ঞানবত্ত্বেন বিভজনাদিত্যাহুঃ’– বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদ মুক্তাবলী*, কারিকা- ৪৭.

৩৮. ‘যোগ্যবিভুবিশেষগুণানাং স্বোত্তরবৃত্তি-যোগ্য-বিশেষগুণ-নাশ্যত্বাত্......’– বিশ্বনাথ, *ভাষা-পরিচ্ছেদঃ*, ১৩৭৪, পৃ. ৫০১.

৩৯. *ন্যায়সূত্র* – ৩.২.২৪.

৪০. ‘অনিত্যা বুদ্ধিরিতি সর্ব্বশরীরিণাং প্রত্যাত্মবেদনীয়মতেৎ’– বাৎস্যায়ন, *ন্যায়সূত্র-ভাষ্য*, ১৯৩৬-৪৪, পৃ. ৮৫৬.

৪১. ‘গৃহ্যতে চ বুদ্ধিসন্তানস্তত্র বুদ্ধের্বুদ্ধ্যন্তরং বিরোধী গুণ ইত্যনুমীয়তে, ...’- ঐ।

৪২. 'তথাহি ক্ষণবিধ্বংসিবস্তুবিষয়বুদ্ধিক্ষণিকত্ব-সমর্থনেনৈব স্থায়িবস্তুবিষয়বুদ্ধিক্ষণিকত্ব-সমর্থনমপি সূচিতং'– বাচস্পতি মিশ্র, *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকাঃ*, ১৯৩৬-৪৪, পৃ. ৮৮৩.

৪৩. 'বুদ্ধ্যবস্থানাৎ প্রত্যক্ষত্বে স্মৃত্যভাবঃ'- বাৎস্যায়ন, *ন্যায়সূত্র-ভাষ্য*, ১৯৮১, পৃ. ২৯৮.

৪৪. '......দৃষ্টা হি বুদ্ধিবিষয়ে স্মৃতিঃ, সা চ বুদ্ধ্যাবনিত্যায়াং কারণাভাবান্ন স্যাদিতি'– বাৎস্যায়ন, *ন্যায়সূত্র-ভাষ্য*, ১৯৩৬-৪৪, পৃ. ৮৮২.

৪৫. 'সর্বং জ্ঞানং ধর্মিণি অভ্রান্তং প্রকারে তু বিপর্যয়ঃ'- বাগ্‌চী, যোগেন্দ্রনাথ এবং শ্রীতাংশুশেখর বাগ্‌চী, *প্রাচীন্যায় ও মীমাংসাসম্মত প্রামাণ্যবাদ*, ১৯৭৪, পৃ, ৪০.

৪৬. তর্কতীর্থ, অমরেন্দ্রমোহন এবং ন্যায়তর্কতীর্থ, তারানাথ, *ন্যায়দর্শনম্*, ১৯৩৬-৪৪, পৃ. ১২৯.

৪৭. 'যদা জ্ঞানং তদা হানোপাদোনোপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ ফলং'– বাৎস্যায়ন, *ন্যায়সূত্র-ভাষ্য*, ১৯৩৬-৪৪, পৃ. ৮৭.

৪৮. '.......ইন্দ্রিয়াদীনাং তদা হানোপাদানোপেক্ষাবুদ্ধয়ঃ ফলম্'– বাচস্পতি মিশ্র, *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকাঃ*, ১৯৩৬-৪৪, পৃ.৮৭.

জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ে মতভেদ

বস্তু ব্যবহার বস্তুর জ্ঞান পূর্বক । কোন বস্তুর জ্ঞান হলে তবেই সেই বস্তুর ব্যবহার সম্ভব হয় । এক্ষেত্রে ‘ব্যবহার’ বলতে কেউ কেউ শব্দ ব্যবহারকে বুঝে থাকেন। যেহেতু কোন বস্তুর জ্ঞান হলে তাকে শব্দের মাধ্যমে উপস্থাপনা করা যায় । সচেতন জীব সেই জ্ঞানকে মাধ্যম করেই কোন্ বস্তু তার পক্ষে হিতকর বা কোন্ বস্তু তার পক্ষে অনিষ্টকর - তা বুঝতে সক্ষম হয় । কেবল তাই নয়, বস্তু হিতকর, না অনিষ্টকর তা বোধের অনন্তর, ব্যক্তি সেই বিষয়ক হানাদি ব্যবহারকেও সম্ভব করে সেই জ্ঞানকেই মাধ্যম করে । অর্থাৎ কিনা, জ্ঞান ছাড়া বস্তুর স্বরূপ বা অস্তিত্বের উপলব্ধি, উপাদেয় বা হেয় হিসাবে তার নির্ণয়, তদনুযায়ী সেই বস্তু লাভ বা ত্যাগের ঈপ্সা বা জিহাসা এবং তজ্জন্য প্রবৃত্তি কোনটাই সম্ভব হয় না । তাই জ্ঞানকে বলা হয় সর্বব্যবহারহেতু । যেমন ধরা যাক্ ঘট বিষয়ক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হল । অতঃপর ‘অয়ং ঘটঃ’ এই আকারের শব্দ ব্যবহার সম্ভব হয় । এইরূপ প্রত্যক্ষ হলে সেই জ্ঞান জন্য ‘অয়ং ঘটঃ’ বা ‘এটি ঘট’ এরূপ শব্দ প্রয়োগ যেমন সম্ভব হয় তেমনি ঘটের আনয়ন রূপ গ্রহণ কিংবা বর্জন রূপ হান এবং ঘটের দ্বারা জল আনয়ন রূপ কার্য সবই সম্ভব হয় । তাই শব্দপ্রয়োগ, হান ও উপাদান এবং অর্থক্রিয়া অর্থাৎ কার্য প্রভৃতি হল ‘ব্যবহার’ শব্দের বাচ্য ।

সকল ব্যবহারের হেতু স্বরূপ জ্ঞানের স্বভাব হল বিষয়কে প্রকাশ করা । এখানে বিষয় বলতে জগতের যাবতীয় পদার্থই বোধ্য, তা যেমন পৃথিব্যাদি ভূত দ্রব্য হতে পারে তেমনি তাদের রূপরসাদি গুণও হতে পারে । তবে একমাত্র জ্ঞানই সেই সব জাগতিক

পদার্থের প্রকাশক হতে পারে । এখন প্রশ্ন হল জ্ঞান ঘটাদি বিষয়কে যেমন প্রকাশ করে থাকে তেমনি জ্ঞানরূপ আন্তর বিষয়েরও কী প্রকাশক হয়ে থাকে ?

'প্রকাশ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল জ্ঞান । কাজেই জ্ঞানের প্রকাশ বলতে বোঝায় জ্ঞানের জ্ঞান । ঘট-পটাদি বিষয় প্রকাশের জন্য যেমন বিষয় জ্ঞান প্রয়োজন একইভাবে বিষয়রূপে জ্ঞানের প্রকাশের জন্য প্রয়োজন জ্ঞানের জ্ঞান । নির্দিষ্ট কারণ সামগ্রীর দ্বারা কোনও বিষয়ে জ্ঞানোৎপত্তির পর সেই জ্ঞানের দ্বারাই ঐ নির্দিষ্ট বিষয়টি জ্ঞাতার কাছে প্রকাশিত হয় । কিন্তু প্রশ্ন হল এক ব্যক্তি 'x' কে জানে । কিন্তু 'x'- কে জানার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে 'x' কে জানেন এই জ্ঞানও কী তাঁর হয় ? কাজেই মূল প্রশ্নটি হল যে জ্ঞানের দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ হয় সেই বিষয় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানটিও প্রকাশিত হয় কিনা ? অর্থাৎ জ্ঞাতা বিষয়কে জানার সঙ্গে সঙ্গে 'ঐ বিষয়ক জ্ঞান তার আছে' – সেটি জানে কিনা ?

জ্ঞান উৎপন্ন হলেই তা কোন বিষয়কে অবলম্বন করেই উৎপন্ন হয় তা পূর্বেই বলা হয়েছে । কিন্তু বিষয় প্রকাশের সঙ্গে জ্ঞান নিজেকেও প্রকাশ করে কিনা– সেই বিষয়ে ভারতীয় দর্শনে মূলতঃ দুটি পক্ষ পাওয়া যায়– একটি স্বপ্রকাশবাদ ও অন্যটি পরপ্রকাশবাদ । যাঁরা বলেন বিষয় প্রকাশ কালে জ্ঞান নিজেরও প্রকাশ করে থাকে অথবা জ্ঞান উৎপন্ন হলেই জ্ঞাতা তাকে সঙ্গে সঙ্গেই জানেন, প্রকাশ বিষয়ক তাঁদের মত স্বপ্রকাশবাদ নামে খ্যাত । অন্য আরেক মতে, জ্ঞান বিষয়ের প্রকাশ করলেও সেই জ্ঞান বিষয় প্রকাশকালে নিজের প্রকাশ করতে পারে না । বিষয় প্রকাশক জ্ঞান অতিরিক্ত জ্ঞানান্তরের দ্বারা সেই জ্ঞান প্রকাশিত হয় । প্রকাশ বিষয়ক এই মত পরপ্রকাশবাদ নামে খ্যাত ।[১] স্বপ্রকাশবাদ ও পরপ্রকাশবাদ হিসাবে ভারতীয় দর্শন

সম্প্রদায়গুলিকে দ্বিবিধ বিভাজন করা হলে স্বপ্রকাশবাদের সমর্থক রূপে বৌদ্ধ, বেদান্ত, প্রাভাকর মীমাংসক প্রমুখ সম্প্রদায়ের মত অন্তর্ভুক্ত করা যায় । অন্যদিকে পরতঃপ্রকাশবাদের সমর্থক হিসাবে ন্যায়-বৈশেষিক, ভাট্ট মীমাংসক ও মিশ্র সম্প্রদায়ের মত উল্লেখ করা যায় ।[২]

জ্ঞানের প্রকাশ সংক্রান্ত স্বপ্রকাশবাদের সমর্থক সম্প্রদায়, তাঁদের অভিমত যেমন পরতঃপ্রকাশবাদের সমর্থক সম্প্রদায়ের মত অপেক্ষা ভিন্ন তেমনি স্বপ্রকাশবাদ কিংবা পরতঃপ্রকাশবাদের সমর্থক সম্প্রদায়গুলি নামতঃ স্বপ্রকাশবাদী কিংবা পরতঃপ্রকাশবাদী হলেও তাঁদের নিজস্ব অভিমত গুলির মধ্যেও বহুলাংশে পার্থক্য বর্তমান । স্বপ্রকাশবাদীগণ স্বপ্রকাশকে যেমন অভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেননি একইভাবে পরতঃপ্রকাশবাদীগণও পরতঃপ্রকাশের সম্পর্কে কোন একটি নির্দিষ্ট মত দেননি । এইভাবে দেখা যায় জ্ঞানের প্রকাশ বিষয়ক আলোচনায় মিল অপেক্ষা দার্শনিকদের মধ্যে অমিলই বেশি । এখন স্বপ্রকাশবাদের সমর্থক ও পরতঃপ্রকাশবাদের সমর্থক বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতগুলি আলোচনা করা যাক্ ।

স্বপ্রকাশবাদী বৌদ্ধ সম্মত স্বসংবেদন–

‘স্বসংবেদন’ শব্দটির অর্থ নিয়ে বৌদ্ধ দর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মত পার্থক্য আছে । এই বিষয়ে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় সম্মত স্বসংবেদনের অর্থ খণ্ডনও করেছেন । আবার মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত চিন্তাবিদেরা স্বসংবেদনতত্ত্ব খণ্ডনও করেছেন । মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জুনের মতে প্রদীপ বা অগ্নির উপমা দিয়ে প্রমাণের স্বপ্রকাশত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় । তাঁর মতে, স্বপ্রকাশবাদীদের মত মেনে প্রদীপ বা অগ্নি স্বপ্রকাশ একথা বলা যায় না । যেহেতু প্রদীপ নিজেকে কখনো

প্রকাশ করতে পারে না । কেননা প্রকাশ হল অন্ধকারকে বিনাশ । কোন বস্তু তখনই প্রকাশিত হয় যখন বস্তুটির আবরক যে অন্ধকার সেই অন্ধকার বিনষ্ট হয় । কিন্তু যেখানে প্রদীপ বা অগ্নি থাকে সেখানে অন্ধকার থাকে না । ফলে অন্ধকারের বিনাশ করে প্রদীপের নিজেকে প্রকাশ করাও সম্ভব হয় না । কাজেই প্রদীপ নিজেকে প্রকাশ করে একথা যুক্তিসম্মত নয় ।[৩] এর উত্তরে পূর্বপক্ষীগণ বলতে পারেন যে, উৎপদ্যমান অগ্নি অর্থাৎ যে অগ্নি উৎপন্ন হচ্ছে সেই অগ্নি উৎপত্তিক্ষণে অন্ধকারের সঙ্গে সহাবস্থান করে । ফলে সেই অগ্নি অন্ধকারের বিনাশ করতে পারে । কিন্তু নাগার্জুনের মতে, সেই যুক্তিও সঠিক নয় । কেননা যে অগ্নি অন্ধকারের সঙ্গে সহাবস্থান করে সেই অগ্নি কীভাবে অন্ধকারের বিনাশ করে তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় ।[৪] পূর্বপক্ষীগণ আরও বলতে পারেন যে, অগ্নি অন্ধকারের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না হয়েই অন্ধকারের বিনাশ করতে পারে । নাগার্জুনের মতে, পূর্বপক্ষীদের এই যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয় । কেননা যদি সম্বন্ধ ছাড়াই অগ্নি অন্ধকারের বিনাশ করতে পারে তাহলে এক ঘরে স্থিত অগ্নির দ্বারাই অন্য ঘরের অন্ধকার বিনষ্ট হত । কিন্তু বাস্তবে অগ্নি যে ঘরে থাকে সেই ঘরের অন্ধকারকেই দূর করতে পারে । কাজেই সম্বন্ধ ছাড়াই অগ্নি অন্ধকারের বিনাশ করতে পারে একথা যুক্তিযুক্ত নয় । সুতরাং অগ্নির স্বপ্রকাশত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় এবং অগ্নির উপমা দিয়ে প্রমাণের স্বপ্রকাশত্ব প্রতিষ্ঠাও যুক্তিসম্মত নয় । শুধু তাই নয় নাগার্জুনের মতে, অগ্নির উপমা ছাড়াও প্রমাণের স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ নয় । কেননা তাঁর মতে, প্রমাণ যদি স্বপ্রকাশ হয় তাহলে প্রমাণ প্রমেয় নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধ একথা স্বীকার করতে হয় । যেহেতু যা স্বপ্রকাশ তা সিদ্ধির জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল হতে পারে না । কাজেই প্রমেয়ের উপর নির্ভর করে প্রমাণ সিদ্ধ হয় একথা বলা হলে আর প্রমাণকে স্বপ্রকাশ বলা যায় না । প্রমাণ প্রমেয় নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধ হয় একথাও বলা যায় না । যেহেতু

সেক্ষেত্রে প্রমাণগুলি কার বা কোন বিষয়ের প্রমাণ তা বলা যায় না । প্রমাণ প্রমেয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রমাণ হয়ে থাকে । সুতরাং প্রমাণ প্রমেয় নির্ভর হওয়ায়, নাগার্জুনের মতে, তা স্বপ্রকাশ হতে পারে না ।[৫] তবে সাধারণভাবে যাঁরা স্বসংবেদন স্বীকার করেন সেই সব বৌদ্ধ দর্শনে বিজ্ঞান নিজ সম্পর্কে চেতন এই বিষয়টি 'স্বসংবেদন' শব্দের অর্থ।

বৌদ্ধ প্রমাণতত্ত্বে জ্ঞান সম্পর্কিত সুসম্বদ্ধ আলোচনা লক্ষ্য করা যায় মূলতঃ আচার্য দিঙ্নাগ ও ধর্মকীর্তির রচনায় । স্বসংবেদনের অর্থ বিষয়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে মত পার্থক্যের মধ্যে প্রবেশ না করে আমি মূলতঃ দিঙ্নাগ ও ধর্মকীর্তির স্বসংবেদনের পক্ষে প্রদত্ত যুক্তিগুলির আলোচনা করব । দিঙ্নাগ ও ধর্মকীর্তি উভয়েই মূলতঃ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সমর্থক ও জ্ঞান সাকারবাদের পৃষ্ঠপোষক । তাঁরা মনে করেন জ্ঞানের নিজস্ব আকার থাকে । একইভাবে সৌত্রান্তিক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও জ্ঞানের সাকারবাদকেই সমর্থন করেন । বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করলেও জ্ঞানকে তাঁরাও সাকার বলেই স্বীকার করেন । সাকার জ্ঞান তাঁদের মতে স্বসংবেদ্য । যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদী এবং সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় উভয়ের মতেই জ্ঞান তার প্রকাশের নিমিত্ত জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা করে না, স্বতঃই প্রকাশিত হয়ে থাকে । কিন্তু জ্ঞানের প্রকাশ স্বতঃই হয়- এ বিষয়ে উভয়ে সহমত হলেও জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে কিংবা জ্ঞান সংক্রান্ত অন্যান্য আলোচনায় তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন । যেমন সৌত্রান্তিকদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁরা বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং বাহ্য বস্তুকে অনুমানগম্য বলে স্বীকার করেন । কিন্তু বিজ্ঞানবাদীরা বিজ্ঞান অতিরিক্ত কোন কিছুর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না ।[৬] পূর্বে জ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সৌত্রান্তিকগণ ক্ষণিকত্ববাদে বিশ্বাসী । ফলে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করলেও উৎপত্তির পরবর্তীক্ষণেই বস্তু বিনষ্ট

হওয়ায় ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ জন্য প্রত্যক্ষ উৎপত্তিক্ষণে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না । বাহ্যবস্তু জ্ঞানের বিষয় হলে জ্ঞানের উৎপত্তিক্ষণে তা উপস্থিত থাকত। তাই তাঁদের মতে উক্ত ক্ষণিক বাহ্যবস্তু জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না । বাহ্যবস্তু ক্ষণিক হলেও কিংবা জ্ঞান ও বিষয় ভিন্ন কালীন হলেও বিষয়টি স্বজন্য জ্ঞানে তার আকার অর্পণ করতে সক্ষম । জ্ঞানের এই যে বিষয়াকার প্রাপ্তি তাকেই তাঁরা বলেছেন অর্থসারূপ্য । অর্থসারূপ্য বলতে, তাঁরা বোঝেন, যে অর্থ থেকে জ্ঞান উৎপন্ন হবে জ্ঞান সেই অর্থের সদৃশ হবে । তাঁদের মতে, জ্ঞান কখনই অর্থ প্রকাশ কালে বিশুদ্ধ বা নিরাকার হতে পারে না । জ্ঞান যদি নিরাকার থাকত তাহলে নীলাদি ক্ষণিক বস্তুর প্রকাশ সম্ভব হত না । কাজেই একথা স্বীকার করে নিতে হয় যে জ্ঞানে বস্তুর সাদৃশ্য আছে বা জ্ঞান আকারবিশিষ্ট । তাই তাঁদের মতে জ্ঞান সাকার । যেহেতু তাঁরা ধর্ম-ধর্মীর ভেদ স্বীকার করেন না তাই তাঁদের মতে, অর্থসারূপ্য বা অর্থসাদৃশ্য জ্ঞানের থেকে অতিরিক্ত নয় ।[৭] এই বিষয়সারূপ্য বা অর্থসারূপ্যই, তাঁদের মতে, প্রমাণ, যা অর্থপ্রতীতি উৎপন্ন করে এবং যার দ্বারা বাহ্যার্থ অনুমিত হয় ।[৮] অন্যদিকে যে জ্ঞানে অর্থপ্রতীতি ঘটে সেই জ্ঞানই হল প্রমাণের ফল । কোনও জ্ঞান যখন কোনও অর্থের সারূপ্য লাভ করে তখন জ্ঞান ঐ বস্তুর জ্ঞান রূপে সিদ্ধ হয় । সুতরাং সৌত্রান্তিক মতে, অর্থসারূপ্য হল প্রমাণ, অর্থপ্রতীতি বা অর্থসংবিদ্ হল ফল এবং বাহ্যার্থ হল প্রমেয় । প্রমাণের ফল যে অর্থসংবিদ্ তা অভ্রান্ত ও কল্পনাপোঢ় হওয়ায় তা প্রত্যক্ষাত্মক । এই প্রত্যক্ষাত্মক অর্থসংবিদ্ই তাঁদের মতে, স্বসংবেদন । তবে তাঁরা কিন্তু প্রমাণ ও প্রমাণের ফল অর্থাৎ গ্রাহক ও গ্রাহ্যের মধ্যে কোন কার্য-কারণভাব বা কর্তৃ-কর্মভাব স্বীকার করেন না । তাঁদের মতে, প্রমাণ ও তার ফলে মধ্যে আছে ব্যবস্থাপ্য-ব্যবস্থাপকভাব । প্রমান হল ব্যবস্থাপক এবং তার ফল হল ব্যবস্থাপ্য । যখন নীলসারূপ্যাদি জ্ঞান উৎপন্ন হয় তার

পরে নিশ্চয় জ্ঞান বা বিকল্প জ্ঞান উৎপন্ন হয় । এই বিকল্প জ্ঞান ব্যবস্থাপন করে বা জানিয়ে দেয় যে, এক একটি জ্ঞানের একেকটি আকার আছে, যেমন নীল জ্ঞান নীলসদৃশ হওয়ায় এটি নীল জ্ঞান এটি পীত জ্ঞান নয় । অর্থাৎ অর্থসারূপ্যের দ্বারা এরূপ অর্থের ব্যবস্থাপন সম্ভব হয় । যেহেতু নীলাদি সংবেদনকে ব্যবস্থাপিত করে নীলাদি সংবেদন সেহেতু নীলাদি সংবেদন হল ব্যবস্থাপ্য । কাজেই একই জ্ঞান ব্যবস্থাপ্য ও ব্যবস্থাপক হওয়ায় একই জ্ঞান প্রমাণ ও প্রমাণের ফল হতে পারে । জ্ঞান নিজেই নিজের ব্যবস্থাপক হওয়ায় বা নিজেই নিজের প্রকাশক হওয়ায় তাঁদের মতে, জ্ঞান স্বসংবেদন ।

বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীরাও সাকারবাদী । কিন্তু সাকারবাদী হয়েও বিজ্ঞানবাদীদের ব্যাখ্যা সৌত্রান্তিক দের মত অপেক্ষা ভিন্ন প্রকৃতির । বিজ্ঞানবাদীদের বস্তু প্রকাশ এবং জ্ঞানের প্রকাশ বিষয়ক আলোচনার পূর্বে এ বিষয়ে অবগত হওয়া আবশ্যক যে বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের দুটি মূল ধারা আছে । প্রথমদিকে আচার্য মৈত্রেয়নাথ থেকে আচার্য বসুবন্ধু পর্যন্ত বিজ্ঞানবাদীদের বলা হয় আগমানুযায়ী বিজ্ঞানবাদী । কেননা এদের মূল লক্ষ্যই ছিল আর্যসন্ধিনির্মোচন সূত্রের মূল সিদ্ধান্তগুলি স্বীকার করে বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা স্থাপন করা । দ্বিতীয় ধারার সূত্রপাত ঘটে আচার্য দিঙ্‌নাগের সময় থেকে । ন্যায় বা যুক্তিই ছিল এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক আলোচনার মুখ্য উপজীব্য, যা পরিপূর্ণতা লাভ করে ধর্মকীর্তির রচনায়। বিজ্ঞানবাদীর এই নতুন ধারা পরিচিতি লাভ করে যুক্ত্যনুযায়ী বিজ্ঞানবাদ নামে। বিজ্ঞানবাদের এই শাখা সৌত্রান্তিক সম্প্রদায়ের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল । এই কারণে তাদের সৌত্রান্তিক- যোগাচার বলেও অভিহিত করা হয়ে থাকে । এইরূপ সৌত্রান্তিক- যোগাচার মতাবলম্বী দার্শনিকের মধ্যে অন্যতম হলেন আচার্য ধর্মকীর্তি ।

তিনি সৌত্রান্তিক দের ন্যায় প্রমাণ-প্রমেয় ব্যবস্থা ও সেই প্রসঙ্গে স্বংবেদনের স্বরূপ আলোচনা করেছেন । ধর্মকীর্তির ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে সেই উভয় মতেরই সমাবেশ ঘটেছে ।

বৌদ্ধ দর্শনে জ্ঞানকে বলা হয় সংবাদক, যেহেতু জ্ঞান উপদর্শিত অর্থকে পাইয়ে দেয় । প্রসঙ্গতঃ বলা দরকার বৌদ্ধ দর্শনে স্বীকৃত জ্ঞান মূলতঃ তিন ভূমিকা পালন করে । জ্ঞান যথাক্রমে প্রদর্শক, প্রবর্তক ও প্রাপক । তার মধ্যে যে জ্ঞান বস্তুকে প্রদর্শন করায় অর্থাৎ যার দ্বারা পুরুষ কোন বস্তুকে জানে সেটি হল প্রদর্শক জ্ঞান । প্রদর্শক জ্ঞান কেবলমাত্র অর্থকে প্রদর্শন করায়, অর্থকে পাওয়ায় না । জ্ঞান পুরুষকে দেখিয়ে বাহ্য প্রবৃত্তির কারণ হলে তখন তাকে প্রবর্তক বলা হয় । দ্বিতীয় প্রকার এই জ্ঞান আবার কেবলমাত্র প্রবর্তন করায়, পাওয়ায় না । প্রবর্তিত হওয়ার পর প্রাপ্তির নিমিত্ত জ্ঞানকে বলা হয় প্রাপক । এই তৃতীয় প্রকারের জ্ঞানই হল প্রাপক । কিন্তু বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে, প্রবর্তক জ্ঞান, প্রাপক জ্ঞান এবং প্রবৃত্তিবিষয়প্রদর্শক ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানকে বোঝায় না । তাই তাঁদের দর্শনে একই জ্ঞান যেমন প্রদর্শক হয়, তেমনি সেই জ্ঞানই প্রবর্তক ও প্রাপক হয় । আচার্য ধর্মকীর্তি তাঁর 'ন্যায়বিন্দু' গ্রন্থে প্রত্যক্ষের আলোচনা প্রসঙ্গে সংবাদক জ্ঞান ও প্রত্যক্ষের চতুর্বিধ প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন যার অন্যতম হল স্বসংবেদন । এই স্বসংবেদনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ধর্মকীর্তি বলেছেন– "সর্বচিত্ত-চৈত্তানামাত্মসংবেদনম্" ।[৯] অর্থাৎ সমস্ত চিত্ত ও চৈত্তগুলির আত্মসংবেদন বা স্বসংবেদন হয় । স্বসংবেদন কথার অর্থ নিজের জ্ঞান । জ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে জ্ঞানের দ্বারাই অর্থ বা বিষয়ের প্রকাশ বা গ্রহণ হয়ে থাকে । অর্থগ্রাহক এই জ্ঞানের বৌদ্ধ দর্শনের পারিভাষিক নাম দেওয়া হয়েছে চিত্ত ।[১০] যদিও অর্থের প্রকৃতিগত প্রশ্নে বৌদ্ধ দর্শনে স্বতন্ত্র মত লক্ষ্য করা যায় । 'অর্থ' বলতে, তাঁরা বোঝেন, অর্থের যেকোন রূপ তা যেমন পরমার্থসৎ বস্তুর রূপ হতে পারে তেমনি

কল্পিত বস্তুর রূপও হতে পারে । অন্যদিকে 'চৈত্ত' বলতে সুখ, দুঃখ, মোহ প্রভৃতি জ্ঞানের এক বিশেষ অবস্থা গ্রহণ করাকে বোঝান হয়েছে ।[১১] এই সকল চিত্ত এবং চৈতসিক নিজের প্রকাশের জন্য জ্ঞানান্তরকে অপেক্ষা করে না, স্বয়ং সংবিদিত হয় । এই মতের সমর্থনে ধর্মোত্তর বলেছেন যে, এমন কোন চিত্তাবস্থা নেই যাতে স্বসংবেদন হয় না ।[১২]

স্বসংবেদন বিষয়ে সৌত্রান্তিক ও বিজ্ঞানবাদী উভয়েই সহমত হলেও স্বসংবেদনের প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে তাঁরা ভিন্ন কথা বলেন । বাহ্যানুমেয়বাদী সৌত্রান্তিক সম্প্রদায় বিষয়সারূপ্য বা অর্থসারূপ্যের দ্বারাই জ্ঞানের উৎপত্তি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন। এই বিষয়সারূপ্য বা অর্থসারূপ্যকেই, তাঁরা বলেছেন প্রমাণ । এই প্রমাণ অর্থপ্রতীতি উৎপন্ন করে এবং এই প্রমাণের দ্বারাই বাহ্যার্থ অনুমিত হয়, তাঁরা বলে থাকেন । অর্থসারূপ্য জন্য অর্থপ্রতীতি বা অর্থসংবিদ্‌ই, তাঁদের মতে, স্বসংবেদন । এই স্বসংবেদন স্বীকারের পক্ষে সৌত্রান্তিকগণের মূল যুক্তি হল দুঃখ কষ্টের মতো ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলির ন্যায় ব্যক্তির জ্ঞানও স্বসংবেদ্য । যেমন কোন ব্যক্তির যখন সুখ-দুঃখ প্রভৃতি হয় তখন তার সুখ-দুঃখ হয়েছে কিনা সেই সমস্ত আন্তর বিষয়ের অনুভবের জন্য ব্যক্তির অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা করতে হয় না । সুখ-দুঃখ হলেই সেই সুখ-দুঃখ বিষয়ে জ্ঞান বা অনুভব তার থাকে । আন্তর বিষয়রূপে ব্যক্তির জ্ঞানও ঠিক তেমনি অনুভবের জন্য জ্ঞানান্তরকে অপেক্ষা করে না । কোন বিষয়ে জ্ঞান থাকলে ব্যক্তিটি জানে যে সেই বিষয়ে তার জ্ঞান আছে । অপর ব্যক্তির সুখ-দুঃখ প্রভৃতি আন্তর বিষয় থেকে ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতির এটাই পার্থক্য যে, অপর ব্যক্তির সুখ-দুঃখ প্রভৃতি আন্তর বিষয়ের অনুভূতি অনুমিত হয় কিন্তু ব্যক্তির নিজের আন্তর বিষয়ের অনুভূতি স্বসংবেদ্য । নিজের ব্যক্তিগত অনুভূতিকে স্বসংবেদ্য স্বীকার না করলে নিজস্ব অনুভূতির

সঙ্গে অপর ব্যক্তির আন্তর অনুভূতির মধ্যে কোন পার্থক্য করা সম্ভব হয়ে ওঠে না । এই একই যুক্তিতে তাঁরা বলেন ব্যক্তির নিজস্ব জ্ঞানের মধ্যে যে ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকে তা প্রমাণ করার জন্য জ্ঞানও স্বসংবেদ্য স্বীকার করা আবশ্যক ।[১৩]

সৌত্রান্তিক দের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা বিজ্ঞানবাদীদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় । সৌত্রান্তিকগণ যেরূপ গ্রাহ্যাকারকে প্রমাণ, ফল অর্থসংবিদ্ এবং বাহ্যার্থকে প্রমেয় রূপে স্বীকার করেন, বিজ্ঞানবাদীরা তা করেন না । তাদের মতে, বিশেষত আচার্য দিঙ্নাগের মতে, বাহ্যার্থ কখনই প্রমেয় হতে পারে না । যদি বাহার্থকে প্রমেয়রূপে স্বীকার করা হয় তাহলে অনেকাত্মক দোষ হয় । কেননা একই বস্তু ব্যক্তি ভেদে ইষ্ট ও অনিষ্ট প্রতীতির জনক হয় । যেমন যে প্রোটিন খাবার একজন সাধারণ মানুষের দেহে প্রয়োজন বা ইষ্ট হয় সেই প্রোটিনই একজন হাইপ্রেসার আছে এমন রোগীর পক্ষে অনিষ্টকর হয় । এইরূপে জ্ঞানে প্রতিভাসিত আকারকেই অর্থ বলে স্বীকার করলে একই অর্থ একইসঙ্গে ইষ্টাকার ও অনিষ্টাকার বলতে হবে । ফলতঃ অনেকাত্মক দোষ অনিবার্য হবে ।[১৪] আর যদি বস্তুকে একইসঙ্গে ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়াকাররূপে স্বীকার করা হয় তাহলেও সেই মত গ্রহণ করা যায় না । কেননা আমাদের উভয়াকার প্রতীতি হয় না । উত্তরে পূর্বপক্ষী বলতে পারেন অদৃষ্টবশতঃ অনেকাত্মক বস্তু একাত্মকরূপে প্রতিভাত হয় । কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্যা হল অদৃষ্ট যদি অনেকাত্মক বস্তুকে একাত্মকরূপে প্রতিভাত করে তাহলে অর্থ নিজ স্বরূপের প্রদর্শক হতে পারে না । প্রকৃতপক্ষে অর্থ অনেকাত্মক কিন্তু তার প্রতীতি হচ্ছে একাত্মক । ফলে একথা স্বীকার করে নিতে হয় বস্তু নিজের স্বরূপ প্রদর্শক হওয়ার পরিবর্তে সেটারই প্রদর্শক হবে যা নিজস্বরূপ প্রতিভাসিত করে । অর্থাৎ অনুভবের বাইরে অর্থ স্ব-স্বরূপে ব্যবস্থিত হয় না । কাজেই অর্থসংবিদ্ জ্ঞানের ফল হতে পারে না । তাঁদের মতে, জ্ঞানের দ্বারা বিশেষিত হয়েই

নীলাদির গ্রহণ হয় । এবং নীলাদির গ্রহণ হলে সেই কালে তদ্বিষয়ক চক্ষুর্বিজ্ঞানের গ্রহণ হয় । নীলাদি ও নীলাদির বিজ্ঞান তাদের একটির গ্রহণে অপরটি গৃহীত হয় এবং একটির অগ্রহণে অপরটি অগৃহীত থেকে যায় । এইরূপে নীলাদি ও তদ্ গ্রাহক বিজ্ঞানের মধ্যে এক সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় যা সহোপলম্ভনিয়ম নামে পরিচিত । সহোপলম্ভ নিয়মের ঘটক দ্বিবিধ সম্বন্ধ– তদুৎপত্তি ও তাদাত্ম্য । বিজ্ঞানবাদীদের মতে, নীলাদি রূপ ও তদ্ গ্রাহক চক্ষুর্বিজ্ঞান পরস্পর তাদাত্ম্যসম্বন্ধযুক্ত । কাজেই নীলাদি ও তদ্ গ্রাহক বিজ্ঞান অভিন্নস্বভাব । তাই তাঁদের মতে, অর্থসংবিদ্ জ্ঞানের ফল নয়, স্বসংবিত্তিই জ্ঞানের ফল ।[১৫] তাঁদের মূল বক্তব্যই হল যে, ক্রিয়া ও কারকের মধ্যে কোন ভেদ নেই । যা উৎপন্ন হয় তাই ক্রিয়া ও একইসঙ্গে তাই কারক । তাঁদের মতে, বিজ্ঞানের প্রকাশক কোন পদার্থ নেই । তাই প্রকাশ্য, প্রকাশক ও প্রকাশ ক্রিয়া, তাঁদের দর্শনে, অভিন্ন পদার্থ । বিজ্ঞান ছাড়া বুদ্ধির দ্বারা অনুভাব্য বা বোধ্য কোন পদার্থ না থাকায় বুদ্ধি বা বিজ্ঞানের অপর কোন অনুভব, যার দ্বারা বুদ্ধি প্রকাশিত হতে পারে, সেরূপ কিছুই নেই । তাঁদের দর্শনে তাই গ্রাহ্য ও গ্রাহকের অর্থাৎ প্রকাশ্য ও প্রকাশকের পৃথক্ সত্তা না থাকায় বুদ্ধি স্বয়ং প্রকাশিত হয় ।

আচার্য দিঙ্নাগ তাঁর প্রমাণসমুচ্চয় গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে জ্ঞানে দ্বিবিধ দিকের কথা উল্লেখ করেছেন । এই দুটি দিক হচ্ছে যথাক্রমে অর্থাভাস ও স্বাভাস ।[১৬] পরবর্তী সময়ে অর্থাভাস বলতে অর্থাকারকে বোঝা হত । দিঙ্নাগোত্তর বৌদ্ধ চিন্তাবিদরা 'অর্থাকার' শব্দটি প্রয়োগ করতেন । সেই কারণে এই মতবাদীদের সাকারবাদী বলা হোত । যদি অর্থাকার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্বকীয় বৈশিষ্ট হয় এবং নীল, পীত ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ঘটনার ভেদক বৈশিষ্ট্য হয় তবে বাহ্যবস্তু জ্ঞানের বস্তু সারূপ্যের হেতু এই দাবী আর করা যায় না । তাই প্রাচীন যোগাচার মতে বাহ্যবস্তু অনস্তিত্বশীল ।

কেবলমাত্র জ্ঞানই সৎ । তার পরিবর্তে দিঙ্নাগের সমর্থক বললেন যে তাদের জ্ঞান সম্পর্কীয় মতে বাহ্যবস্তু আবশ্যক নয় । বিজ্ঞানবাদীরূপে দিঙ্নাগ বিজ্ঞানের জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয়রূপে প্রতিভাত হওয়া সমর্থন করেন । জ্ঞানের বিষয় বলতে তিনি জ্ঞানে অর্থাভাসকে বুঝিয়েছেন । তাঁর মতে ইন্দ্রিয় বলতে জড় কোন কিছুকে বোঝায় না । কিন্তু ইন্দ্রিয়কে একধরণের জ্ঞানোৎপাদক শক্তিকে বোঝায় । এই শক্তির দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং যে শক্তির দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ সম্ভব হয় ।[১৭] অর্থাৎ তাঁর মতে, এই শক্তিই বিষয়াভাস বা বিষয় প্রকাশের সঙ্গে স্বাভাস অর্থাৎ স্বসংবেদ্য হয় ।

আচার্য দিঙ্নাগ স্বংবেদনকে মানস প্রত্যক্ষ বলে স্বীকার করেছেন । তাঁর মতে দুই ধরণের মানস প্রত্যক্ষ হতে পারে ।[১৮] একধরণের মানস প্রত্যক্ষ যার দ্বারা অর্থ বা বিষয়ের আকারের জ্ঞান হয় এবং আরেক ধরণের মানস প্রত্যক্ষ যার দ্বারা আন্তর বিষয়ের সুখ, দুঃখ প্রভৃতির জ্ঞান হয় । বিজ্ঞানবাদের সমর্থক হওয়ায় তিনি বিজ্ঞান অতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না । তাই তাঁর মতে ঘট-পটাদি বস্তু থেকে শুরু করে সুখ-দুঃখাদি সবই প্রকৃতিগতভাবে বিজ্ঞানের সঙ্গে অভিন্ন । সুখ-দুঃখাদি থাকলে যেমন ব্যক্তির সেই বিষয়ে জ্ঞানও থাকে একইভাবে বিজ্ঞান তথা মানসিক ঘটনাও থাকলে সেগুলির স্বসংবেদন হয়ে থাকে । কোন ব্যক্তির সুখ কিংবা দুঃখ আছে অথচ তার সেই সুখ, দুঃখের জ্ঞান নেই এটা হয় না । একইভাবে সুখ দুঃখের মত জ্ঞান বা বিজ্ঞানরূপ মানসিক ঘটনা আছে অথচ তার জ্ঞান নেই এরূপ হতে পারে না । কাজেই পরতঃপ্রকাশবাদীদের মত জ্ঞান উৎপন্ন হয়েও অপ্রকাশিত থাকতে পারে এই বক্তব্য সমর্থনযোগ্য নয় । একইসঙ্গে দিঙ্নাগের মতে, স্বসংবেদন মানসিক ঘটনা হওয়ায় এটি একধরণের প্রত্যক্ষ । তাঁর মতে, যা কল্পনারহিত তাই প্রত্যক্ষ ।[১৯] তাঁর মতে যেকোন মানসিক ঘটনাই কল্পনারহিত বা নির্বিকল্পক হওয়ায় প্রকৃতিগত দিক থেকে তা প্রত্যক্ষ।

সেই কারণে যেকোন ধরণের জ্ঞান সেটি প্রত্যক্ষ হোক্, অনুমান হোক্ কিংবা যেকোন ধরণের বৌদ্ধিক যুক্তি হোক্ সেগুলি মানসিক ঘটনা হওয়ায় সেগুলি সবই, তাঁর দর্শনে, মানস প্রত্যক্ষ । স্বসংবেদনও সেরূপ একপ্রকারের মানসিক ঘটনা হওয়ায় এটিও এক ধরণের মানস প্রত্যক্ষ এবং এই প্রত্যক্ষ অভ্রান্ত ও কল্পনা রহিত । এই প্রত্যক্ষকে মানস বলার কারণ হল এই প্রত্যক্ষে বাহ্যেন্দ্রিয় সাক্ষাৎভাবে ভূমিকা গ্রহণ করে না । স্বসংবেদনকে কল্পনা রহিত বলার মাধ্যমে চিন্তা প্রভৃতি মানসিক ঘটনার থেকে স্বসংবেদনরূপ মানসিক ঘটনার যে পার্থক্য আছে তা তিনি নির্দেশ করেছেন । তাঁর মতে, বাহ্য ইন্দ্রিয়গুলি যদি ঢেকে রাখা হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় যদি নাও থাকে তাহলেও আমরা কোন কিছু সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি । কিন্তু এই ধরণের চিন্তা বা মানসিক ঘটনা কল্পনা রহিত হয় না । স্বসংবেদনরূপ মানসিক ঘটনার দ্বারা চিন্তার বিষয়টিকে বা ধারণার বিষয়টিকেই জানা যায়, কিন্তু মানসিক ঘটনাটিকে জানা যায় না । সেটি জানার জন্য অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় । সেই কারণেই চিন্তা প্রভৃতি মানসিক ঘটনা অপেক্ষা স্বসংবেদন ভিন্ন প্রকৃতির । কেননা এই সমস্ত মানসিক ঘটনায় কল্পনার স্থান থাকলেও স্বসংবেদন হল কল্পনারহিত । কল্পনা রহিত হওয়ায় তিনি এই প্রকার জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলেছেন । এখন স্বসংবেদন স্বীকারের পক্ষে তাঁর মূল যুক্তিগুলি লক্ষ্য করা যাক্ ।

দিঙ্‌নাগ জ্ঞানের যে দ্বিবিধ দিকের কথা স্বীকার করেছেন অর্থাভাস ও স্বাভাস, তার দ্বারাই স্বসংবেদনের তত্ত্ব প্রমাণিত হয় । উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে আলোচনা করা যায় । ধরা যাক্ আমার নীলের জ্ঞান আছে । এই জ্ঞানটির দুটি দিক হচ্ছে- একটি নীল অপরটি জ্ঞান । দ্বিতীয়টি প্রথমটির গ্রাহক । যেহেতু এই জ্ঞানে স্বাভাস বলে একটি অংশ থাকে সেহেতু স্বাভাস অংশটিই নীলাদি বিশিষ্ট জ্ঞানের গ্রাহক হতে পারে । কিন্তু যদি জ্ঞানে দুটির পরিবর্তে কেবলমাত্র একটি দিকের কথা স্বীকার করা

হত তাহলে সংবেদন থেকে স্বসংবেদনকে পৃথক করা যেত না । কারণ ধরা যাক্ জ্ঞানের কেবলমাত্র অর্থাভাস অর্থাৎ নীল অংশটি আছে । আবার অন্য সংবেদন অর্থাৎ স্বসংবেদনেরও নীল অংশটি তার বিষয়রূপে আছে তাহলে সংবেদন ও স্বসংবেদনের মধ্যে পার্থক্য কীভাবে করা যাবে ? অন্যদিকে জ্ঞানের যদি স্বাভাস দিকটি আছে বলা হয় সেক্ষেত্রেও সংবেদন ও স্বসংবেদনের মধ্যে পার্থক্য আর থাকবে না । যেহেতু সেক্ষেত্রেও সংবেদনেরও স্বাভাস ধর্ম ও স্বসংবেদনও স্বাভাস ধর্ম থাকায় দুটিই একই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নির্ণীত হবে ।[২০]

দিঙ্‌নাগের দ্বিতীয় যুক্তি অনুসারে জ্ঞানের দ্বিবিধ দিক্ স্বীকার করলে অন্য একটি বিষয়ও ব্যাখ্যা করা সহজ হয় । কখনও কখনও একটি বিষয় প্রকাশিত হয় এমন একটি পূর্ববর্তী জ্ঞানের দ্বারা, যে জ্ঞানটি আবার পরবর্তী অন্য কোন জ্ঞানের বিষয় হয় । কিন্তু তা অসম্ভব । কারণ বস্তু ক্ষণিক হওয়ায় পরবর্তী জ্ঞানের উৎপত্তিক্ষণে তা বিনষ্ট হয় । কাজেই যখন পরবর্তী জ্ঞানটি উৎপন্ন হয় তখন পূর্ববর্তী যে বস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল সেই বস্তুটির অস্তিত্ব আর থাকে না । কিন্তু এর থেকে জ্ঞানের দুই দিক স্বীকার করা অনেক বেশি সুবিধা জনক । সেক্ষেত্রে বলা যায় T- ১ নামক কোন একটি ক্ষণে একটি জ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে C- ১, যা B- ১ বিষয়ের গ্রাহক । T- ২ ক্ষণে, C- ২ নামক অপর একটি জ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে, যা B- ১ এর গ্রাহক নয় বা যার B- ১ বিষয় নয়, তার বিষয় C- ১ । কাজেই দেখা যাচ্ছে সেই C- ২ এর দ্বিবিধ দিক আছে । এই C- ২ সরাসরি B- ১ কে গ্রহণ করতে পারে না । এটি গ্রহণ করে B- ১ বিষয়ক C- ১ কে । কারণ B- ১ ক্ষণিক হওয়ায় তা T- ২ ক্ষণে থাকতে পারে না । এর সাহায্যে প্রচলিত একটি বিশ্বাসের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় । যে ব্যাখ্যা অনুসারে একটি জ্ঞানের দ্বারা গৃহীত বিষয় পরবর্তী জ্ঞানের দ্বারা গৃহীত হতে পারে ।

দিঙ্‌নাগ তৃতীয় যুক্তিতে স্মৃতির উপর নির্ভর করেও স্বসংবেদনের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছেন । তাঁর মতে আমাদের কেবলমাত্র স্মরণ হয় না, পূর্ববর্তী বস্তু বিষয়ক জ্ঞানেরও স্মরণ হয় । উদাহরণের সাহায্যে বলা যেতে পারে – আমাদের যে পূর্বানুভূত ঘটেরই স্মরণ হয় তা নয়, তার জ্ঞানেরও স্মরণ হয় । অর্থাৎ আমাদের ঘট জ্ঞানেরও স্মরণ হয় । কিন্তু পূর্বানুভূত না হলে তার স্মরণ হয় না । সুতরাং জ্ঞানের স্মরণও জ্ঞানের পূর্বানুভবকে অপেক্ষা করে । এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে জ্ঞানের কেবল দ্বিবিধ দিক আছে তা নয়, জ্ঞান স্বপ্রকাশও । আবার জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ স্বীকার করলে এক্ষেত্রে লাঘব পক্ষ স্বীকৃত হয় । কেননা এক্ষেত্রে পরতঃপ্রকাশবাদীদের ন্যায় জ্ঞানের প্রকাশের জন্য জ্ঞান অতিরিক্ত জ্ঞানান্তর স্বীকার করার পরিবর্তে কেবল জ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞানের জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । অর্থাৎ স্বপ্রকাশবাদ স্বীকার করায় জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্ঞানকে পৃথক্‌ভাবে স্বীকার করা হয়নি । ফলতঃ লাঘব পক্ষ স্বীকৃত হয়েছে ।

জ্ঞানের দুটি দিক থাকে - একটি বিষয় প্রকাশের দিক এবং সেই বিষয় বিষয়ক জ্ঞান প্রকাশের দিক একথা যদি স্বীকার করা না হয় তাহলে দিঙ্‌নাগের মতে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে । যদি জ্ঞানকে জানার জন্য অন্য আরেক জ্ঞানের প্রয়োজন হয় বলা হয় তাহলে সেই দ্বিতীয় জ্ঞানটিকেও জানার জন্য অন্য আরেকটি জ্ঞানের প্রয়োজন হবে। এবং এইভাবে জ্ঞানের প্রকাশে অপরাপর জ্ঞান স্বীকার করলে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে । এই ধরণের দোষ দূর করার জন্যই জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলতে হয় ।[২১] জ্ঞানকে স্বসংবেদ্য বলার পক্ষে বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মকীর্তির মূল যুক্তি গুলিও আলোচনা করা আবশ্যক ।

প্রথমতঃ– বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ মতে কোন জ্ঞানই সেই জ্ঞানের থেকে ভিন্ন বিষয়কে গ্রহণ করে না । তাঁদের মতে, কোন জ্ঞানে যদি জ্ঞান ও জ্ঞান গ্রাহ্য বিষয়ের ভেদ সূচিত হয় তবে তা অবশ্যই ভ্রান্ত বা মিথ্যা । যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু ভ্রম । কিন্তু কোন কিছুকে মিথ্যা বলতে গেলে নির্দিষ্ট কোন মানদণ্ড থাকা দরকার যার প্রেক্ষিতে কোন কিছুকে মিথ্যা বলা যায় । তবে সার্বিক ভ্রান্তির স্থলে সেরকম কোন মানদণ্ড পাওয়া সম্ভব নয় । ধরা যাক্ আমাদের চন্দ্রের দ্বিত্ব দর্শন ভ্রম । তার বাস্তব একত্ব ঐ দ্বিত্ব দর্শনকে ভ্রম বলে নির্ণয় করে । তেমনি গ্রাহ্য গ্রাহকের অভিনবত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে গ্রাহ্য গ্রাহকের ভেদ মিথ্যা তা প্রতিষ্ঠা করা যায় না । বস্তুতঃ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা গ্রাহ্য গ্রাহকের ভিন্নতা প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ । তাই ধর্মকীর্তির মতে, গ্রাহ্য বিষয় ও গ্রাহক জ্ঞান অভিন্ন । তাঁর মতে, নীল রঙ এবং নীল রঙের জ্ঞান একইসঙ্গে আবির্ভূত হয় । কাজেই নীল রঙ ও নীল রঙের জ্ঞানকে পৃথক্ করা সম্ভব নয় । কোন যুক্তিতেই এটি প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে নীল রঙ হল বাস্তব এবং নীল রঙ সেই নীল রঙের জ্ঞান থেকে পৃথক্ । আসলে এরূপ সিদ্ধান্তের মূল কারণ হল বিজ্ঞানকেই একমাত্র সৎ বস্তু বলে স্বীকার করা । বিজ্ঞানেরই একমাত্র অস্তিত্ব আছে– এই মত স্বীকার করলে বিজ্ঞান অতিরিক্ত নীলাদি বস্তু কিছুই থাকতে পারে না । এক্ষেত্রে নীল রঙ ও নীল রঙের জ্ঞানের মধ্যে কোন কার্য-কারণভাবও প্রতিষ্ঠা করা যায় না । কাজেই কোন বিষয়ে জ্ঞান হলে সেই বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান হতেও পারে নাও পারে– জ্ঞানের জ্ঞান সংক্রান্ত এরূপ আপতিক সম্ভাবনার কথা তাঁরা স্বীকার করেন না ।

দ্বিতীয়তঃ– ধর্মকীর্তির মতে জ্ঞান, সুখ, ক্রোধ প্রভৃতি জ্ঞান স্বরূপ । জ্ঞানের সাথে তারা উৎপন্ন হয় । সুতরাং তারাও জ্ঞান স্বরূপ । তারাও স্বসংবেদ্য । কারও মাথার যন্ত্রনা হচ্ছে কিন্তু সে বিষয়ে সে সচেতন নয় এরূপ সাধারণতঃ দেখা যায় না ।

তেমনি একজনের জ্ঞান হচ্ছে কিন্তু তার সম্পর্কে সে সচেতন নয় এরূপ হয় না । দৈনন্দিন জীবনে সুখ, দুঃখ প্রভৃতি নানা ধরণের অনুভূতি আমাদের হয়ে থাকে । যদি সুখ, দুঃখ প্রভৃতির অনুভূতি হয় না একথা স্বীকার করা হয় তাহলে সুখ-দুঃখের জ্ঞান আমাদের হয় একথা বলা যাবে না । কেননা কোন অনুভূতি নেই একথার অর্থ হল তার জ্ঞান নেই । সুখ-দুঃখ থাকা মানেই সুখ-দুঃখের জ্ঞান থাকাকে বোঝায় । আচার্য ধর্মকীর্তির যুক্তি অনুসারে, কোন অনুভূতির জ্ঞান দুই ভাবে হতে পারে– সেটির জ্ঞান নিজে নিজেই হতে পারে অথবা অন্য কোন জ্ঞানের দ্বারা সেটির জ্ঞান হতে পারে । প্রথমটি স্বীকার করলে জ্ঞানকে স্বসংবেদন বলতে হয় । আর দ্বিতীয়টি স্বীকার করা যায় না কেননা সেক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত সিদ্ধান্ত নিঃসৃত হয় । যেহেতু দ্বিতীয়টি স্বীকার করলে অর্থাৎ ব্যক্তি নিজস্ব অনুভূতির জন্য অন্য জ্ঞান স্বীকার করলে ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতির সঙ্গে অপর ব্যক্তির অনুভূতির কোন পার্থক্য থাকে না বলতে হয় ।[২২] সেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির অন্যের অনুভূতিকেও নিজের অনুভূতি বলে জ্ঞান হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় । এই যুক্তিতে ধর্মকীর্তি বলেন যে জ্ঞান প্রভৃতি ব্যক্তির ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলি স্বসংবেদ্য ।

তৃতীয়তঃ- জ্ঞান স্বপ্রকাশ না হলে জড়ের সঙ্গে তার তফাৎ থাকে না । জ্ঞান যদি স্বপ্রকাশ না হয় তবে তার প্রকাশকত্ব ধর্মের হানি হয় । কেননা যে নিজেকে প্রকাশ করতে ব্যর্থ সে অপরকে প্রকাশ করবে কীভাবে ? কাজেই জ্ঞান কেবলমাত্র বিষয়ের প্রকাশক এই মত স্বীকার করা যায় না । তাছাড়া যে সমস্ত বস্তু প্রকাশের জন্য অন্য কিছুর ওপরে নির্ভরশীল হয় সেই সমস্ত বস্তু জড় বস্তু থেকে ভিন্ন হতে পারে না । যা চেতন হবে তা হবে স্বপ্রকাশক । সেই কারণে জ্ঞানকে পরতঃপ্রকাশ বললে জড়ের সঙ্গে তার ভেদ থাকে না ।

প্রভাকর মীমাংসক অথবা বৌদ্ধ পক্ষ হয়ে বলা যায় যে, আমরা জ্ঞানের বিষয়ে কথা বলি । জ্ঞান বিষয়ে শব্দ ব্যবহার জ্ঞানের জ্ঞানকে অপেক্ষা করে । কারণ কোন বিষয়ে শব্দ ব্যবহার সেই বিষয়ের জ্ঞানকে অপেক্ষা করে । সুতরাং জ্ঞানের জ্ঞান অবশ্য স্বীকার্য । জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ স্বীকার করলে সেক্ষেত্রে জ্ঞানকে অন্য কিছুর ওপর নিজ প্রকাশার্থে নির্ভরশীল বলে স্বীকার করতে না হওয়ায় লাঘব হয় । অর্থাৎ জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্ঞানকে স্বতন্ত্ররূপে স্বীকার করতে হয় না ।

জৈন সম্মত জ্ঞানের প্রকাশতত্ত্ব–

জ্ঞান ও বিষয়ের অভিন্নতা তথা জ্ঞান মাত্রই সাকার – সাকারবাদী, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের এই মত জৈন দর্শনে স্বীকৃত হয়নি । তাঁদের মতে, বৌদ্ধ ক্ষণিকত্ববাদ স্বীকার করলে জ্ঞানকে সাকার বলে স্বীকার করা যায় না । প্রথমতঃ ক্ষণিকত্ববাদ অনুসারে বস্তু ক্ষণিক হওয়ায়, বস্তু উৎপন্ন হয়ে পরবর্তী ক্ষণে বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায়, সেই ক্ষণিক বস্তুর পক্ষে জ্ঞানে আকার প্রদান করা সম্ভব নয় । অন্যদিকে জ্ঞানও ক্ষণিক হওয়ায় জ্ঞানের পক্ষেও সেই বিষয়ের আকার গ্রহণ করার অবকাশ থাকে না । বিষয়ের আকার গ্রহণের পূর্বেই জ্ঞান বিনষ্ট হয়ে যায় । কিন্তু জ্ঞান বিষয়াকার গ্রহণ না করলে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান ও রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞান স্বতন্ত্র করা যাবে কীরূপে ?- এরূপ প্রশ্নের উত্তরে জৈন দার্শনিকগণ বলেন যে, 'প্রতিকর্মব্যবস্থায়াঃ । প্রতিনিয়তবিষয়ব্যবস্থায়াঃ' ।[২৩] অর্থাৎ সকল জ্ঞানের মধ্যে জ্ঞানগত সাম্য থাকলেও চক্ষুরিন্দ্রিয়জাত জ্ঞান রূপেরই কেবল গ্রাহক হয়, কখনও রসের গ্রাহক হয় না– এরূপ প্রতিকর্মব্যবস্থা উভয় প্রকার প্রত্যক্ষের ভেদের পরিচায়ক । অন্যথায় জ্ঞানের বিষয়াকার গ্রহণ স্বীকার করলে বস্তু দূরে আছে বা কাছে আছে এরূপ যে লোকব্যবহার দৃষ্ট হয়

তার জলাঞ্জলি দিতে হয় ।[২৪] কেননা বৌদ্ধ মতে, জ্ঞান দর্পনের ন্যায় বিষয়াকার গ্রহণ করে । জ্ঞান দর্পনের ন্যায়- বৌদ্ধদের এই মত মানলে দর্পনে দূর, নিকট প্রভৃতির অনুপলব্ধি হওয়ায়, জ্ঞানেও তাদের ব্যবহার অনুপপন্ন থাকবে । ফলতঃ জ্ঞানে দূর, নিকট প্রভৃতির ব্যবহারের উচ্ছেদ হবে । কিন্তু জ্ঞানে এরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয় । কাজেই দর্পনের প্রতিবিম্বের ন্যায় জ্ঞান বিষয়ের সঙ্গে অন্বিত হয়ে অনুভূত হয়– এই মত অস্বীকৃত হয় । শুধু তাই নয় জৈন মতে, জ্ঞানের বিষয়াকার প্রাপ্তি স্বীকার করলে বস্তুর জড়তার গ্রহণও স্বীকার করতে হবে । সারকথা হল অর্থ বা বিষয় থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান যদি বস্তুর আকারকে গ্রহণ করে তবে একইভাবে বস্তুর জড়তাকেও গ্রহণ করুক । যদি সেরূপ হয় তাহলে বিষয়ের ন্যায় জ্ঞানও জড় রূপে প্রতিভাত হবে ।[২৫] কিন্তু জ্ঞান জড় হবে এই মত কোন ভাবেই স্বীকৃত নয় । কেননা জ্ঞানকে জড় বলে স্বীকার করা হলে জ্ঞান যেমন নিজের প্রকাশক হতে পারবে না তেমনি অপর বস্তুর প্রকাশকও হতে পারবে না । কাজেই জ্ঞান বিষয়াকার গ্রহণ করে - সাকারবাদীদের এই মতও যুক্তিসম্মত নয় । জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও জ্ঞানের প্রকাশ বিষয়ে বৌদ্ধ দর্শনের ন্যায় জৈনগণও স্বপ্রকাশ তত্ত্বে বিশ্বাসী । তবে বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়ের ন্যায় জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বললেও জৈন দর্শনে সেই স্বপ্রকাশত্বের স্বরূপ কিংবা তা প্রতিস্থাপনের ধরণের মধ্যে অভিনবত্বই লক্ষণীয় । ন্যায়াবতার গ্রন্থে প্রদত্ত প্রমাণের লক্ষণ সেই দিকেরই ইঙ্গিত করে । প্রমাণের লক্ষণ প্রসঙ্গে সিদ্ধসেন মহামতি ন্যায়াবতার গ্রন্থে বলেছেন – ‘প্রমাণং স্বপরাভাসি জ্ঞানং বাধবিবর্জিতম্’ ।[২৬] অর্থাৎ প্রমাণ হল অবাধিত জ্ঞান যা স্বপ্রকাশক এবং পরপ্রকাশক । জ্ঞান স্বরূপ প্রমাণ যেমন নিজেকে প্রকাশ করে তেমনি বাহ্যার্থকেও প্রকাশ করে । সুতরাং জৈন মতে বস্তুমাত্রই প্রকাশের নিমিত্ত অন্যাধীন নয় । ঘট-পটাদি বস্তু প্রকাশের

জন্য জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ অন্যাধীন হলেও জ্ঞান কিন্তু প্রকাশের জন্য অন্যকিছু তথা জ্ঞানান্তরের উপর নির্ভরশীল নয় । অর্থাৎ তাঁদের মতে জ্ঞান ভিন্ন বস্তু পরতঃপ্রকাশ । প্রদীপ যেরূপ বস্তুর প্রকাশক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও প্রকাশক হয়, প্রদীপের প্রকাশের জন্য আর প্রদীপান্তরের প্রয়োজন হয় না ঠিক তেমনি জ্ঞানের ক্ষেত্রেও ঘট-পটাদি বস্তু জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হলেও সেই জ্ঞান প্রকাশের জন্য জ্ঞানান্তরের প্রয়োজন হয় না। কেননা জ্ঞান নিজে অনুপলব্ধ থাকলে তা কোন বিষয়েরই প্রকাশ করতে পারে না । তাই জ্ঞান, তাঁদের মতে, স্বরূপতঃই স্বপ্রকাশ । কাজেই দেখা যাচ্ছে জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্বের স্বপক্ষে তাঁরা দুটি মূল যুক্তির উপস্থাপন করেন– প্রথম যুক্তিটি হল ‘জ্ঞানং প্রকাশমানমেবার্থপ্রকাশয়তি, প্রকাশকত্বাত্, প্রদীপবত্’ । অর্থাৎ প্রদীপ যেরূপ নিজে প্রকাশিত হয়েই বস্তুর প্রকাশক হয়, জ্ঞানও ঠিক তেমনি নিজে প্রকাশমান হয়েই অর্থের প্রকাশক হয় । জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্বের সপক্ষে দ্বিতীয় যুক্তিটি হল – ‘সংবিদ্ স্বপ্রকাশা অর্থপ্রতীতিত্বাত্’ । অর্থাৎ সংবিদ্ বা জ্ঞান স্বপ্রকাশ যেহেতু তা অর্থের প্রকাশক হয় ।[২৭] এরূপ যুক্তির পেছনে জৈনদের মূল উদ্দেশ্য হল এটাই দেখানো যে, যা স্বপ্রকাশ হয় না তা অর্থ বা বস্তুরও প্রকাশক হতে পারে না, যেমন ঘট। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে যেহেতু প্রত্যক্ষ স্থলে ইন্দ্রিয় নিজে অপ্রকাশক হওয়া সত্ত্বেও বা নিজে অপ্রকাশিত থেকেও বস্তুর প্রকাশক হতে পারে, সেহেতু ‘সংবিদ্ স্বপ্রকাশা অর্থপ্রতীতিত্বাত্’ এই অনুমানে ব্যভিচার হয় নাকি ? যেহেতু এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই যেখানে বস্তু নিজে অপ্রকাশিত থেকেও বিষয়ান্তরের প্রকাশক হয় । সেক্ষেত্রে বস্তু যেহেতু বিষয়ান্তরের প্রকাশক হয় সেহেতু বস্তু স্বঃপ্রকাশক হবে– এই নিয়ম ব্যভিচার দোষাক্রান্ত হওয়াই স্বাভাবিক । প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক জৈনগণ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ স্থলে ইন্দ্রিয়কে প্রমাণ বলেন না । তাঁদের মতে, ইন্দ্রিয় কিংবা ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ কোনটিই

স্বয়ং অর্থ প্রকাশ করতে পারে না । ইন্দ্রিয় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও জ্ঞানের অনুপস্থিতিতে বস্তু অপ্রকাশিতই থেকে যায় । ইন্দ্রিয়ের উপস্থিতিতে কোন বিষয়ের জ্ঞানই সেই বিষয়ের প্রকাশক হতে পারে । তাই জ্ঞানই বিষয়ের প্রকাশক হয় । সেই কারণে জৈন দর্শনে জ্ঞানই প্রমাণ, ইন্দ্রিয় নয় । ইন্দ্রিয় প্রমাণ না হওয়ায় ইন্দ্রিয় বস্তুর প্রকাশক-একথাও অযৌক্তিক । আর ইন্দ্রিয় বস্তুর প্রকাশক না হওয়ায় ইন্দ্রিয় নিজে অপ্রকাশিত থেকে বিষয়ের প্রকাশক হয় এই ব্যতিক্রম দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্যভিচার দোষের আপত্তিও নিরস্ত হয় । কাজেই জৈন মতে, জ্ঞান নিজে অপ্রকাশিত থেকে বিষয়ের প্রকাশক হয় এই মত খণ্ডিত হয় এবং জ্ঞানই বস্তুর প্রকাশক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও প্রকাশক হয় ।

সাংখ্য ও যোগ সম্মত প্রতিসংবেদন বা পৌরুষেয়বোধ–

দ্বৈতবাদী দর্শন সম্প্রদায়রূপে খ্যাত সাংখ্য ও যোগ দর্শনে মূল দুই তত্ত্ব হল প্রকৃতি ও পুরুষ । অচেতন প্রকৃতি ও চেতন পুরুষের সান্নিধ্যের পরিণাম হল এই বৈচিত্র্যময় জগৎ । প্রকৃতি অচেতন হলেও প্রসবধর্মী । সত্ত্ব, রজঃ ও তমের সাম্যাবস্থারূপ এই প্রকৃতি নির্গুণ ও অপরিণামী । কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রসবধর্মী, অব্যক্তা ও মূলা প্রকৃতির সেই সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হয় । ফলস্বরূপ জগতের বিরূপ পরিণাম শুরু হয় এবং তারই ফল স্বরূপ এই জগৎ । সূক্ষ্ম প্রকৃতি থেকে ক্রমশঃ স্থূল পরিণামরূপ সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির প্রথম পরিণাম হল মহৎ বা বুদ্ধি । ন্যায় দর্শনে বুদ্ধি ও জ্ঞানকে অভিন্নার্থক বলে স্বীকার করা হলেও সাংখ্য-যোগ দর্শনে স্বীকৃত এই বুদ্ধি কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে অভিন্ন নয় । সাংখ্য ও যোগ মতে এই বুদ্ধি হল প্রকৃতির পরিণাম এবং জ্ঞান হল সেই বুদ্ধিরই পরিণাম বিশেষ । সেই কারণে

অন্যান্য দর্শনে জ্ঞানকে আত্মার ধর্ম বলা হলেও সাংখ্য-যোগ দর্শনে জ্ঞান বুদ্ধির ধর্ম বলে স্বীকৃত ।

বুদ্ধি, অহংকার, মন এই তিনটি একত্রে, সাংখ্য দর্শনে, অন্তঃকরণ বলে স্বীকৃত হয়েছে। বিষয়ের সঙ্গে অন্তঃকরণের সংস্পর্শের ফলে তার যে পরিণাম বা বৃত্তি তাই সাংখ্য মতে জ্ঞান । তাঁদের মতে, ঘট-পটাদি বাহ্যপদার্থ কিংবা সুখ-দুঃখাদি আন্তর পদার্থ যখন চিত্তের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় তখন সেই সম্বন্ধের ফলে চিত্তের যে পরিণাম বা চিত্তবৃত্তি তাই জ্ঞান । চিত্ত হল অন্তঃকরণ আর 'বৃত্তি' শব্দের অর্থ সন্নিকর্ষ । ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থ বা বিষয়ের সন্নিকর্ষের ফলে অন্তঃকরণের যে বিষয়াকার জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই অধ্যবসায় । এই অধ্যবসায় হল বুদ্ধির অসাধারণ ব্যাপার বা বৃত্তি ।[২৮] অন্যদিকে পুরুষ হল জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানের আশ্রয় বা জ্ঞানবান্ নয় । জ্ঞান যেহেতু পুরুষ সম্বন্ধ হয়েই জ্ঞাত হয় সেহেতু জ্ঞান পুরুষের নিকট কখনই অপ্রকাশিত থাকে না । আর যেহেতু জ্ঞান পুরুষের নিকট অপ্রকাশিত থাকে না সেহেতু জ্ঞান প্রকাশের জন্য জ্ঞানের জ্ঞান বা জ্ঞানান্তরের অপেক্ষা থাকে না । একইভাবে যোগ দর্শনেও বলা হয়েছে 'সদা জ্ঞাতাশ্চিত্তবৃত্তয়স্তত্প্রভোঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বাত্' ।[২৯] অর্থাৎ সকল চিত্তবৃত্তি পুরুষের কাছে সদা বেদ্য বা প্রকাশিত । চিত্ত পরিণামী হওয়ায় তা বস্তু সংস্পর্শে এসে তদাকারে আকারিত হলে চিত্তের নিকট বস্তু জ্ঞাত হয়, অন্যথায় বস্তু অজ্ঞাতই থাকে । চিত্তে ঘটাকার বৃত্তি উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও 'আমি ঘটকে জানি না' – এরূপ কখনও হতে পারে না । যখন বুদ্ধিতে প্রতিফলিত পুরুষপ্রতিবিম্ব বুদ্ধিকে চেতনের ন্যায় করে তোলে এবং বুদ্ধি ঘটাদি বিষয়াকারে পরিণত হয়, তখন বুদ্ধিকৃত বিষয়জ্ঞানরূপ যে বুদ্ধিবৃত্তি তা পুরুষের 'ঘটমহং জানামি' বা 'ঘটজ্ঞানবান্হম্' এইরূপেই অভিমান হয়ে থাকে । একেই যোগদর্শনে পুরুষের 'প্রতিসংবেদন' বা 'চিত্তজ্ঞাতৃত্ব' বলা হয়েছে ।

প্রভাকর মীমাংসক সম্মত ত্রিপুটীসম্বিৎ-

স্বপ্রকাশত্ববাদী প্রভাকরের মতে, জ্ঞান প্রদীপবৎ, আত্মসম্বেদ্য । প্রদীপ যেরূপ বিষয় প্রকাশক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজ প্রকাশক হয়ে থাকে, নিজ প্রকাশের নিমিত্ত প্রদীপান্তরের প্রয়োজন হয় না ; জ্ঞানও ঠিক তেমনি বিষয়রূপে ঘট, পটাদি প্রকাশের পাশাপাশি স্বপ্রকাশক হয়ে থাকে । জ্ঞান প্রকাশের নিমিত্ত জ্ঞানান্তর স্বীকারের কোনো আবশ্যকতা থাকে না । তাসত্ত্বেও অতিরিক্ত জ্ঞানান্তর স্বীকার করলে গৌরব দোষের আপত্তি হয় । প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান, প্রভাকর মতে, কখনো অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকেই না। জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে অথচ জ্ঞান অপ্রকাশিত অবস্থায় রয়েছে এমন অবস্থা কল্পনাই করা যায় না । তবে প্রভাকর মীমাংসক আত্মা স্বীকার করেন । তাঁর মতে, জ্ঞান হল আত্মাতে বিষয়ের প্রকাশ । কাজেই ব্যক্তি জানে যে সে জানে অর্থাৎ বিষয়রূপে জ্ঞানের প্রকাশের ক্ষেত্রে বা ব্যক্তির জ্ঞানের জ্ঞান বলতে যা বোঝায় তা হল জ্ঞানের নিজেকে আত্মার কাছে প্রকাশ করা । আত্মা, তাঁদের মতে, জ্ঞান উৎপত্তির প্রতি অন্যতম একটি আবশ্যিক শর্ত । কেননা আত্মাকে ছাড়া কোন বিষয়ের জ্ঞান হতে পারে না ।[৩০]

জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার বা জ্ঞান প্রকাশে জ্ঞানান্তর অস্বীকৃতির পেছনে প্রভাকরের মূল যুক্তি হল– যা সকল বস্তুকে প্রকাশিত করতে পারে বা করে থাকে সে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না– এইরূপ বলা যুক্তিসম্মত নয় । অর্থাৎ যা অন্যের প্রকাশক তা নিজের প্রকাশে জন্য অপরের উপর নির্ভর করতে পারে না । শালিকনাথ প্রমুখ ব্যাখ্যাকারগণ দেখান যে, প্রভাকর মতে জ্ঞানোৎপত্তি কালে জ্ঞান বিষয়রূপে জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়– এই তিনেরই প্রকাশক হয়ে থাকে । তাঁর মতে, ঘটের সঙ্গে চক্ষু সন্নিকৃষ্ট হওয়ার পর যে জ্ঞান আমাদের হয় তার আকারটি হল ‘ঘটম্ অহং জানামি’ ।

এই জ্ঞানে জ্ঞানের আশ্রয় জ্ঞাতা কর্তারূপে, জ্ঞানের বিষয় ঘটাদি কর্মরূপে এবং নিজে জ্ঞানরূপে অনুভূত হয় ।[৩১] জ্ঞান একই সঙ্গে এই তিনটি বিষয়ের প্রকাশক- এই মত স্বীকার করায় গুরু প্রভাকরের মতকে 'ত্রিপুটীপ্রত্যক্ষবাদ' বা 'ত্রিপুটীসম্বিৎ' বলা হয়ে থাকে । প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক শালিকনাথ জ্ঞান ও সম্বিৎ– এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেছেন । তাঁর মতে, সম্বিৎ হল স্বপ্রকাশ কিন্তু জ্ঞান অনুমেয়। অর্থাৎ তাঁর ব্যাখ্যা অনুসারে প্রত্যেক জ্ঞানীয় অবস্থার অপরোক্ষ প্রকাশ হল সম্বিৎ এবং অন্যদিকে জ্ঞান হল পরোক্ষ প্রকাশ, অনুমানগম্য । একই অভিমত লক্ষ্য করা করা যায় শবরভাষ্যের বৃহতী টীকায় ।[৩২] সেখানেও দেখানো হয়েছে যে, প্রভাকর মতে, সম্বিৎ বলতে বোঝায় প্রকাশকে বা কেবলমাত্র প্রকাশকে । অন্যদিকে 'জ্ঞান' শব্দটি অন্যান্য দর্শনের যেরূপ স্বীকার করা হয় যে, জ্ঞানের কোন না কোন বিষয় থাকবে, জ্ঞান বিষয়ের আকারে আকারিত হবে এবং জ্ঞান পরবর্তী কালে প্রমেয় বা জ্ঞানের বিষয় হতে পারে ইত্যাদি, প্রাভাকর দর্শনেও জ্ঞান সেইরূপে স্বীকৃত হয়েছে ।[৩৩] এক্ষেত্রে পূর্বপক্ষী বৌদ্ধগণ আপত্তি করতে পারেন কোন জ্ঞানের প্রকাশ স্থলে তিনটি বিষয় থাকে- গ্রাহ্য তথা জ্ঞানের বিষয়, গ্রাহক তথা প্রকাশক জ্ঞান এবং একইসঙ্গে সংবেদন তথা প্রকাশ । কাজেই এটা হতেই পারে না যে, সম্বিৎ এবং জ্ঞানের বিষয় একই আকারে প্রকাশিত হবে । আকারটি হয় বিষয়গত হবে অথবা হবে জ্ঞানগত । যদি এই আকাটি বিষয়গত অথবা জ্ঞানগত হয় তাহলে আমাদের একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সম্বিৎ নিরাকার এবং ফলত অপ্রত্যক্ষযোগ্য । এর উত্তরে প্রভাকর বলেন যে, কোন একটি নির্দিষ্ট আকারের অভাবেও, সম্বিৎ এবং জ্ঞানের প্রকাশ সম্ভব হতে পারে । যেহেতু সম্বিৎ হল জ্ঞানীয় অবস্থার প্রকাশ । একই সঙ্গে জ্ঞানকেও স্বীকার করতে হয় যা সেই প্রকাশকে সম্ভব করে । তাঁর মতে এই সম্বিৎ আকারবিহীন, অবিষয়ক এবং

স্বপ্রকাশ । এটি স্বপ্রকাশ যেহেতু সম্বিৎ কখনই সংবেদ্য বা জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না।[৩৪] একইসঙ্গে তাই সম্বিৎ-এর কোন আকারেরও প্রয়োজন হয় না । প্রভাকর মতে জ্ঞান অসংবেদ্য কিন্তু প্রমেয় । তবে অসংবেদ্য বললেও জ্ঞানকে তিনি অজ্ঞাত বলেন না। জ্ঞান সাক্ষাৎ বা অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না এই অর্থে জ্ঞান অসংবেদ্য হলেও, যেহেতু জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞানের বা অনুমানের বিষয় হতে পারে সেহেতু জ্ঞান প্রভাকর মতে প্রমেয় । সাধারণ মানুষ কার্য-কারণের দ্বারা জ্ঞান ও তার ফলকে চিন্তা করতে পছন্দ করেন । প্রভাকরও সম্বিৎ-এর কারণরূপে জ্ঞানকে স্বীকার করেছেন । তাঁর মতে, জ্ঞান হল তাই যা সম্বিৎ-এর সৃষ্টি করে । এই সম্বিৎ তাই জ্ঞানের ফল । জ্ঞানকে অনুমেয় বলে স্বীকার করলেও কুমারিল ভট্টের সঙ্গে তিনি সহমত নন । ভাট্ট মতে জ্ঞান বিষয়ে জ্ঞাততা বা প্রাকট্য নামক ফল উৎপন্ন করে এবং সেই জ্ঞাততার দ্বারাই জ্ঞান অনুমিত হয় । কিন্তু প্রাভাকর সম্প্রদায় এরূপ কোন জ্ঞাততারূপ ফল স্বীকার করেন না । ফলে জ্ঞাততা লিঙ্গক অনুমিতিও স্বীকার করেন না ।

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে সম্বিৎ যেহেতু প্রকাশের নিমিত্ত ‘স্ব’ অতিরিক্ত সম্বিৎ নিরপেক্ষ সেই কারণে গুরু প্রভাকরের ‘ত্রিপুটীসম্বিৎ’ স্বঃপ্রকাশবাদেরই নামান্তর তা সহজেই অনুধাবন করা যায় । তবে উল্লেখ্য ‘স্বপ্রকাশবাদ’ শব্দ মধ্যস্থ ‘স্ব’ শব্দ আলোচ্য স্থলে কেবল ‘নিজ’ অর্থে প্রযুক্ত হয়নি, পারিভাষিক অর্থেই প্রযুক্ত হয়েছে । ‘স্ব’ শব্দের ‘স্ব-সামগ্রী-বিরহ-প্রযোজ্যঃ’- রূপ অর্থই অভিপ্রেত ।[৩৫] অর্থাৎ সম্বিৎ ছাড়া অন্যান্য কারণের বিরহ বা অভাব সত্ত্বেও সম্বিদের প্রকাশে ব্যাঘাত বা বিলম্ব ঘটে না । কাজেই সম্বিৎ-ই সম্বিদের প্রকাশক এই বিষয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না ।

প্রভাকরের মতে, জ্ঞান যখন বিষয়কে প্রকাশ করে সেই ক্ষণেই সম্বিৎ নিজেকেও প্রকাশ করে । জ্ঞানজন্য বস্তু প্রকাশের সময়কালে সম্বিৎ আত্মসম্বেদন বা স্বসংবেদনের জনক হওয়ায় সম্বিৎ স্বপ্রকাশ । তিনি লোকব্যবহার উল্লেখের দ্বারা বিষয়টিকে বোধগম্য করেছেন । দৈনন্দিন জীবনে কোন বিষয়ের জ্ঞান হলে 'আমি বিষয়টিকে জানি'– এইরূপে সাক্ষাৎ অনুভব আমাদের হয়ে থাকে । এই জ্ঞানে 'আমি জানি' এটি নতুন কোন অর্থ সংযোজন করে না । কাজেই 'বিষয়টির জ্ঞান' বলতে যা বোঝায় 'আমি বিষয়টিকে জানি' এরূপ শব্দ ব্যবহারও সেই অভিন্ন অর্থকে বোঝায় । শালিকনাথ তাঁর 'প্রকরণপঞ্চিকা'– গ্রন্থে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে সাক্ষাৎ প্রতীতিরূপে উল্লেখের মাধ্যমে বলেছেন যে, এইরূপ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের বিষয় হল মেয়, মাতৃ এবং প্রমা ।[৩৬] এরূপে বিষয় প্রকাশ কালেই সম্বিৎ-এর প্রকাশ স্বীকৃত হওয়ায়, সম্বিৎ-এর প্রকাশ বিষয়ক গুরু প্রভাকরের মত স্বপ্রকাশবাদ নামে পরিচিত ।

অদ্বৈত বেদান্ত মতে স্বপ্রকাশতত্ত্ব–

'বেদান্ত' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল বেদের অন্তভাগ । বেদের অন্তভাগ উপনিষদ্ নামেই খ্যাত । সেই কারণে বেদান্ত বলতে মুখ্যতঃ উপনিষদ্‌কেই বুঝতে হয় । তাই সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেছেন 'বেদান্ত নামো উপনিষৎ প্রমাণম্.........' ।[৩৭] বেদান্ত দর্শন হিসাবে যদি অদ্বৈত বেদান্তের কথা বলা হয় তাহলে অন্যান্য দর্শন থেকে এমনকি বেদান্তের অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে অদ্বৈত বেদান্তের মূল পার্থক্যের জায়গাটি সর্বাগ্রে অনুধাবন করা আবশ্যক । অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায় যেখানে জগৎ ও জীব রূপ অন্ততঃ দ্বিবিধ সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী অদ্বৈত বেদান্তে সেখানে জীব ও ব্রহ্মের অভেদকেই প্রাধান্য দিয়ে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম' অর্থাৎ একমাত্র সত্তা রূপে কেবল ব্রহ্মই স্বীকৃত

হয়েছে । ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিক সৎ বস্তু হওয়ায় অদ্বৈত বেদান্তে পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জগতের ন্যায় জ্ঞানেরও সেই ব্রহ্মভিন্ন অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয়েছে । পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে ।

অদ্বৈত মতে তথা শঙ্করাচার্যের দর্শনে জ্ঞান বলতে মুখ্যার্থে চৈতন্যকেই বোঝায় তবে গৌণার্থে 'জ্ঞান' শব্দ বৃত্ত্যাত্মক জ্ঞানকেও বুঝিয়ে থাকে । অর্থাৎ শঙ্করাচার্যের দর্শনে জ্ঞানকে দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করা হয়ে থাকে– একটি পারমার্থিক দৃষ্টি ও অন্যটি ব্যাবহারিক দৃষ্টি । পারমার্থিক দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্মই জ্ঞান । যেমন তৈত্তিরীয় উপনিষদে ব্রহ্মের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে– 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ।[৩৮] অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপতঃ সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত । তৈত্তিরীয় শ্রুতির ভাষ্যে শঙ্করাচার্য বলেছেন জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম জ্ঞানক্রিয়ার কর্তা হতে পারে না । কেননা জ্ঞান যদি ক্রিয়া হয় তাহলে তা পরিবর্তন সাপেক্ষ হবে এবং তা পরিবর্তন সাপেক্ষ বা পরিণামী হলে তাকে সত্য ও অনন্ত বলা যাবে না । এই জ্ঞান কর্তা বা জ্ঞাতা হতে পারে না আবার জ্ঞানকে জ্ঞেয়ও বলা যায় না । কেননা জ্ঞান বা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম অখণ্ড, নিরবয়ব । তবে জ্ঞান স্বরূপ হলেও ব্রহ্ম নিরবয়ব হওয়ায় ব্রহ্ম যেমন জ্ঞাতা হতে পারে না তেমনি জ্ঞেয়ও হতে পারে না । অদ্বৈত বেদান্তে জ্ঞানের মধ্যে আবার বিষয়-বিষয়ীভাবও স্বীকার করা হয় না ।[৩৯] কেননা, ব্রহ্ম বা আত্মার মতই জ্ঞানও এক, অদ্বিতীয় ও অখণ্ড ।

জ্ঞান আত্মার গুণ অর্থাৎ জ্ঞান গুণ পদার্থ এবং এই গুণস্বরূপ জ্ঞান আত্মায় উৎপন্ন হয়ে আত্মায় আশ্রিত থাকে- এই মতও অদ্বৈত বেদান্তীগণ স্বীকার করেন না । ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে বলা হয়েছে যেমন শশক, কুশ ও পলাশ প্রভৃতি বস্তু পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় একে অপরের অধীন হয় না তেমনি দ্রব্য ও

গুণ অত্যন্ত ভিন্ন হওয়ায় গুণ দ্রব্যের অধীন হওয়া কিছুতেই সঙ্গত হয় না ।[৪০] তাঁর মতে গুণ স্বরূপতঃ দ্রব্যেরই স্বভাব ।[৪১] সুতরাং আত্মদ্রব্যে জ্ঞান নামক গুণ উৎপন্ন হয়ে আশ্রিত থাকে একথা বলা যায় না । অর্থাৎ জ্ঞান জ্ঞানস্বরূপ আত্মার গুণ হতে পারে না।

মীমাংসকগণ জ্ঞানকে মানসিক ক্রিয়া বলে থাকেন । শঙ্করাচার্যের মতে, জ্ঞানকে মানসিক ক্রিয়াও বলা যায় না । তাঁর মতে জ্ঞানকে অন্যান্য ক্রিয়ার মত মনের ক্রিয়া বললে বস্তু স্বরূপের যথার্থ জ্ঞান লাভ হবে না । বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধেই সংশয় থেকে যায়। তাঁর মতে, জ্ঞান মানসী ক্রিয়া বা মনের ক্রিয়া বিশেষ হলেও অন্যান্য বিধেয় ক্রিয়ার ন্যায় নয় । কেননা বিধেয় ক্রিয়া মাত্রই মানুষের বিধির দ্বারা নির্দেশিত হয়ে মানুষের চিত্তের ব্যাপারের অধীন হয় । যেকোন বিধেয় ক্রিয়াই মানুষের প্রযত্নসাধ্য অর্থাৎ মানুষের প্রচেষ্টার দ্বারা লব্ধ, যেমন- ধ্যান । 'ধ্যান' শব্দের অর্থ চিন্তা । তাই এই ধ্যান এক প্রকারের মানস বা মনের ব্যাপার তথা মানসী ক্রিয়া, যা মানুষের প্রযত্নসাধ্য বিধেয় ক্রিয়া । ফলে তা মানুষের প্রচেষ্টার অধীন । তাই মানুষ ধ্যান করতে পারে, না করতে পারে অথবা অন্য প্রকারে করতে পারে ।[৪২] কিন্তু জ্ঞান ধ্যানাদি ক্রিয়ার মতো নয় । কাজেই জ্ঞান ক্রিয়া বিশেষ হলেও অন্যান্য বিধেয় বা বিধির অধীন ক্রিয়া নয় । জ্ঞান হল প্রমাণ থেকে উৎপন্ন বা প্রমাণনিষ্পাদ্য ।[৪৩] এই প্রমাণ আবার বস্তুর স্বরূপ অবলম্বন করে উৎপন্ন হয় । অন্য মূল সামগ্রী উপস্থিত হলে জ্ঞান উৎপন্ন হবেই । কাজেই জ্ঞান ইচ্ছানুসারে করা, না করা বা অন্যথা করা যায় না । সেই জন্য জ্ঞান হল বস্তুর অধীন, পুরুষের অধীন নয় । অর্থাৎ মীমাংসক মত মেনে জ্ঞানকে বিশেষ প্রকারের মানসী ক্রিয়া বলা হলেও তা কেবল মানুষের প্রযত্নসাধ্য নয়, তা প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ থেকে উৎপন্ন ।[৪৪] আর প্রমাণ বস্তুর স্বরূপ যে প্রকারের হয় বস্তুকে সেই প্রকারেই গ্রহণ করে থাকে । এই কারণে জ্ঞান কেবলমাত্র বস্তু যে প্রকার

সেই প্রকারই হয় । সুতরাং জ্ঞান যেহেতু মানুষের প্রযত্নের অধীন নয় জ্ঞান প্রমাণের দ্বারা বস্তুস্বরূপের অধীন এবং প্রমাণ বস্তু যেরূপ তাকে সেইরূপেই গ্রহণ করে সেহেতু জ্ঞান বলতে শঙ্করাচার্য যথার্থ জ্ঞানকেই বুঝিয়েছেন ।

শংকরের মতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে জ্ঞান হল বিশুদ্ধ চৈতন্য বা বিশুদ্ধ জ্ঞান । বিশুদ্ধ চৈতন্য হিসাবে জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করায় জ্ঞানকে গুণ বা ক্রিয়া বলা যায় না । কারণ গুণ বা ক্রিয়ার অস্তিত্ব সিদ্ধির জন্য তাদেরই জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ্য হতে হয় । ব্রহ্মাভিন্ন হওয়ায় আত্মাও চৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ ।[৪৫] অদ্বৈত বেদান্তে চৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকেই আত্মার সঙ্গে অভিন্ন বলা হয়েছে এবং ব্রহ্মের ন্যায় আত্মাও তাই বিশুদ্ধ চৈতন্যপদবাচ্য । তাঁদের মতে, উপাধির দ্বারা পরব্রহ্মই জীবরূপে অবস্থান করে। ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হওয়ায় জীবের যেমন উৎপত্তি হয় না তেমনি সেই জীবকে অনিত্য বলা যায় না । জীবকে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ বলা হয়েছে । ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মাভিন্ন আত্মার ন্যায় জ্ঞানকে নিত্য, অবিনাশী, নির্বিশেষ, অপরিণামী, অসীম, বিভু, স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃপ্রমাণ ও স্বপ্রকাশ বলা হয়েছে এই দর্শনে । একইসঙ্গে এই ব্রহ্মকে সৎস্বরূপ, চিৎ বা জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়েছে । এই চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম বা জ্ঞান অদ্বৈত মতে, স্বপ্রকাশ । এই স্বপ্রকাশের লক্ষণ প্রসঙ্গে চিৎসুখাচার্য তাঁর ‘তত্ত্বপ্রদীপিকা’ গ্রন্থে বলেছেন– যা অবেদ্য হয়ে অপরোক্ষ ব্যবহারযোগ্য তাই স্বপ্রকাশ ।[৪৬] একইভাবে মধুসূদন সরস্বতী তাঁর ‘অদ্বৈতসিদ্ধি’ গ্রন্থে বলেছেন– ‘অবেদ্যত্বে সত্যপরোক্ষ ব্যবহারবিষয়তাযোগ্যত্বং স্বপ্রকাশত্বম্’ অর্থাৎ যা অবেদ্য বা যা জ্ঞানের বিষয় হয় না অথচ যার অপরোক্ষ ব্যবহার বিষয়ের যোগ্যতা আছে সেই অপরোক্ষবিষয়তাযোগ্যত্বই স্বপ্রকাশ ।[৪৭] ‘অপরোক্ষানুভূতি’ গ্রন্থে আচার্য শঙ্কর বলেছেন- জগতের বিভিন্ন পদার্থের যে প্রকাশ ঘটে তা আত্মার প্রকাশ । তবে তা অগ্নি প্রভৃতির দীপ্তির ন্যায় নয় । যেহেতু

অগ্নি প্রভৃতির অভাব থেকে রাত্রিতে অন্ধকার হয়ে যায় । কিন্তু জ্ঞান সেরূপ নয় । তাঁর মতে জগতের সকল জড়বস্তু হল তামসধর্মী । কাজেই বস্তুগুলি তাদের প্রকাশের জন্য অন্যাধীন । আত্মার আলোকেই তাদের প্রকাশ ঘটে । তবে এই আত্মারূপ আলোক অগ্নি প্রভৃতির ন্যায় নয় । অগ্নি প্রভৃতি দীপ্যমান হলেও জগতের অন্যান্য বস্তুর ন্যায় জড় । তাদের প্রকাশ ঘটে আত্মার আলোকে । অগ্নি থেকে শুরু করে জগতের সকল জড়ই স্বপ্রকাশ আত্মার অধীন ।[৪৮] জ্ঞান স্বরূপ আত্মাই স্বয়ংজ্যোতি । শঙ্কাচার্যের দর্শনে পারমার্থিক দৃষ্টিতে যে, স্বপ্রকাশ, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন ও আত্মাস্বরূপ জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে তা মুখ্যার্থে ।

জ্ঞান চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় নিজে অপ্রকাশিত থেকে ঘট-পটাদি বিষয়ের জ্ঞাপক হয়- পরতঃপ্রকাশবাদীদের উক্ত যুক্তি অদ্বৈতবেদান্তীগণ স্বীকার করেন না । তাঁদের মতে, 'জ্ঞাপক' শব্দের অর্থ হল জ্ঞানের জনক । জ্ঞান বিষয় ও আত্মাকে জ্ঞাপন করে– একথা বলার অর্থ হল বিষয় ও আত্মার সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মায় । এই জ্ঞানকে যদি পরপ্রকাশ বা জড় বলা হয় তাহলে সেই জ্ঞান জ্ঞানান্তরের দ্বারা প্রকাশিত হয়ে বিষয় ও আত্মার প্রকাশ ঘটাবে বলতে হবে । সেই জ্ঞানান্তরটিও একই যুক্তিতে জড় ও পরপ্রকাশ হওয়ায় জ্ঞানান্তরকে অপেক্ষা করবে । এই ক্রমে অনবস্থা দোষ দেখা যাবে । এই অনবস্থা দোষ দূর করতে হলে কোন না কোন জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলে স্বীকার করতে হবে । তাছাড়া বিষয় ও আত্মার প্রকাশরূপ যে ফল তা স্বপ্রকাশ স্বীকার না করলে জড় বলে স্বীকার করলে বিষয়, আত্মা ও বিষয় প্রকাশ এই তিনটিকেই অপ্রকাশ স্বভাব জড় পদার্থ বলতে হবে । সেক্ষেত্রে কে কাকে প্রকাশ করবে ?– তার কোন সদুত্তর পাওয়া যাবে না । যার পরিণামে জগদান্ধ্যত্ব প্রসঙ্গ হবে অর্থাৎ সমস্ত বিষয়ই

অপ্রকাশিত থাকবে । এই সমস্ত কারণে অদ্বৈতবেদন্তীগণ জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলে স্বীকার করে থাকেন ।

গৌণ অর্থে অর্থাৎ ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে জ্ঞান বলতে শঙ্করাচার্য বুঝেছেন বৃত্তি জ্ঞানকে । বৃত্তি হল অন্তঃকরণের পরিণামবিশেষ[৪৯] এই বৃত্তিজ্ঞান আবার অন্তঃকরণবৃত্তি ও অবিদ্যাবৃত্তিভেদে দুই প্রকার । তাঁর মতে, শুদ্ধচৈতন্য স্বরূপ আত্মা অর্থাৎ পারমার্থিক দৃষ্টি সম্মত জ্ঞানই অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ উপাধির দ্বারা অধ্যাসবশতঃ সম্বন্ধযুক্ত হয়ে বৃত্তিজ্ঞানে রূপান্তরিত হয় । আসলে অন্তঃকরণ সত্ত্বপ্রধান ও স্বচ্ছ । এই অন্তঃকরণ ধর্ম ও অধর্ম অদৃষ্টের দ্বারা প্রেরিত হয়ে এবং চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কে মাধ্যম করে নির্গত হয়ে বিষয়দেশে গমন করে বিষয়ের আকারে পরিণত হয় । জলের যেরূপ কোন নির্দিষ্ট আকার না থাকায় জলাশয় স্থিত জল ছিদ্রপথে নির্গত হয়ে পাত্রের আকার অনুসারে আকারিত হয়, ঠিক তেমনি অন্তঃকরণের নিজের কোন আকার না থাকলেও ইন্দ্রিয় পথে নির্গত হয়ে বিষয় দেশে গমন করে এবং বিষয়ের আকার গ্রহণ করে । বিষয়ের আকাররূপে অন্তঃকরণের এই পরিণামই অন্তঃকরণবৃত্তি । আর ইন্দ্রিয়কে মাধ্যম করে বিষয়ের প্রকাশরূপ অন্তঃকরণের এই বৃত্তিই ব্যাবহারিক দৃষ্টিসম্মত জ্ঞান । এই অন্তঃকরণবৃত্তি প্রমাণজন্য । অন্তঃকরণবৃত্তির ক্ষেত্রে অন্তঃকরণ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়পথে নির্গত হয়ে বিষয়দেশে গমন করে বিষয়াকার প্রাপ্ত হয় এবং বিষয় চৈতন্যের আবরণকে বা অজ্ঞানকে নাশ করে বিষয়চৈতন্য ও প্রমাতৃচৈতন্যের মধ্যে অভেদ সম্পাদন করে বিষয়কে প্রকাশ করে । এইরূপে যেহেতু এই বৃত্তি অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাপক হয় সেহেতু এই জ্ঞানকে বলা হয় প্রমা । এই জ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী ও অজ্ঞানের নাশক ।

অন্তঃকরণবৃত্তি প্রমাণজন্য হলেও অদ্বৈত বেদান্ত মতে, অবিদ্যাবৃত্তি হল দোষজন্য । অবিদ্যার বিষয়াকার পরিণাম হল অবিদ্যাবৃত্তি । অর্থাৎ অবিদ্যা বা অবিদ্যাবস্থ যে অন্তঃকরণ তার বিষয়াকার পরিণাম হল অবিদ্যাবৃত্তি । অবিদ্যাবৃত্তি স্থলে বিষয়ের অজ্ঞাত সত্তা থাকে না । তাই এই অবিদ্যাবৃত্তি অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞাপক হয় না । সেই কারণে অবিদ্যাবৃত্তি অপ্রমাপদবাচ্য । যদিও এর ব্যতিক্রম আছে । 'অহং সুখী' 'অহং দুঃখী' প্রভৃতি জ্ঞান অবিদ্যাবৃত্তি জন্য হলেও এই সব জ্ঞানকে যথার্থ বলা হয়ে থাকে । কেননা ব্যবহারকালে এই সব জ্ঞানের বাধ হয় না । তবে 'রজ্জুতে সর্প ভ্রম' বা 'শুক্তিতে রজত ভ্রম' প্রভৃতি জ্ঞানকে অযথার্থ বা অপ্রমা বলা হয় যেহেতু এই সব জ্ঞানের ব্যবহারকালে বাধ হয় । তবে বৃত্তির স্বরূপ যাই হোক্ বৃত্তি স্বয়ং জড় বলে তা স্বয়ংপ্রকাশ স্বভাব নয় । এই বৃত্তিজ্ঞান সাক্ষিবেদ্য, তা উৎপন্ন হয়েই সাক্ষীর নিকট প্রকাশিত হয় । যদিও এই বিষয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যাও লক্ষ্য করা যায় । তবে সাক্ষী বলতে, তাঁরা, বিষয়ের ভাসক নির্লিপ্ত চৈতন্যকে বোঝান । তাঁদের মতে, সাক্ষিচৈতন্য ঘটাদি বাহ্য বস্তুকে প্রকাশ করতে বিষয়াকার অন্তঃকরণবৃত্তিকে এবং প্রাতিভাসিক পদার্থকে প্রকাশ করতে অবিদ্যাবৃত্তির উপর নির্ভর করে । কিন্তু পদার্থের প্রকাশ অন্যের অধীন বা প্রকাশের নিমিত্ত জ্ঞানাধীন হলেও মুখ্য জ্ঞান স্বপ্রকাশ । বেদান্ত মতে কেবল সাক্ষীই বৃত্তিজ্ঞানের গ্রাহক । এই সাক্ষী সর্বদা অনাবৃত ও প্রকাশমান বা স্বপ্রকাশ ।

ভাট্ট সম্প্রদায় স্বীকৃত জ্ঞাততা লিঙ্গক অনুমিতির স্বরূপ–

ভাট্ট মতে, জ্ঞান প্রকৃতিগত দিক থেকে একধরণের ক্রিয়া বা কর্ম । তাঁর মতে, ক্রিয়া স্বরূপ জ্ঞান স্বপ্রকাশ হতে পারে না । জ্ঞানোৎপত্তির পর, জ্ঞানের দ্বারা বিষয় প্রকাশিত হয়, কিন্তু জ্ঞান নিজে প্রকাশিত হতে পারে না । বিষয় প্রকাশ ক্ষণে জ্ঞান

নিজের প্রকাশক হতে পারে না যেহেতু ইন্দ্রিয়াদি কারণ সহযোগে উৎপন্ন জ্ঞান কেবল বিষয় প্রকাশেই সক্ষম হয় । জ্ঞানোৎপত্তির পরেও, জ্ঞান নিজের প্রকাশক হতে পারে না । আবার ভাট্ট মীমাংসক প্রভাকরের ন্যায় জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলেন না । তাঁর মতে, জ্ঞান স্বপ্রকাশ নয়, পরপ্রকাশ । জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমানের দ্বারা জ্ঞান প্রকাশ্য । জ্ঞান স্বপ্রকাশ নয়, জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতিগম্য– এই মতের পেছনে তাঁর মূল যুক্তি হল- ধাতুর অর্থ মাত্রই ক্রিয়া । একই যুক্তিতে জ্ঞা- ধাতুর অর্থ যে জ্ঞান সেটিও একটি ক্রিয়া। একইসঙ্গে ক্রিয়া মাত্রই প্রত্যক্ষাতীত বা অতীন্দ্রিয় হওয়ায় জ্ঞান ক্রিয়াও অতীন্দ্রিয় । তাই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, ক্রিয়া হওয়ায় প্রত্যক্ষ গোচর হতে পারে না, অনুমিত হয় । সুচরিত মিশ্রের মতে, আত্মাশ্রিত ক্রিয়া না হলে তার বিষয়প্রাপ্তি সম্ভব না ।[৫০] জ্ঞানে যেহেতু বিষয়প্রাপ্তিকর্মতা সম্ভব সেহেতু জ্ঞান ক্রিয়া । আর ক্রিয়া প্রত্যক্ষাতীত হওয়ায় জ্ঞান ক্রিয়ারও প্রত্যক্ষ সম্ভব নয় । তবে জ্ঞান স্বপ্রকাশও নয় । জ্ঞানকে যাঁরা স্বপ্রকাশ বলেন তাঁদের বিরুদ্ধে তাই তাঁর যুক্তি হল বিষয় ও জ্ঞান উভয়ের প্রকাশ সমকালীন বা এককালীন হতে পারে না । জ্ঞান হল ক্রিয়া, আত্মা হল কর্তা এবং ঘটাদি বিষয় হল কর্ম । যখন কেউ বলেন যে, ‘সে ভাত রান্না করছে’ সেক্ষেত্রে ভাত হল রান্না করা রূপ ক্রিয়ার বিষয় । রন্ধন কার্য বা পাকজ ক্রিয়ার ফল উৎপন্ন হয় ঐ ভাতরূপ বিষয়ে । একইভাবে যখন কেউ বলেন যে, ‘ঘটকে জানছি’ সেক্ষেত্রে জানা বা জ্ঞানরূপ ক্রিয়াও তেমনি তজ্জন্য অতিশয় জন্মায় ঘটাদি জ্ঞানের বিষয়ে । জ্ঞান জন্য বিষয়গত এই অতিশয়কেই, ভাট্ট মতে, বলা হয় জ্ঞাততা । এই ‘জ্ঞাততা’ প্রাকট্য, দৃষ্টতা, প্রকাশ, ভাসন প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে অভিন্নার্থক । জ্ঞান ক্রিয়া, পাক, গমনাদির ন্যায়, বিষয়গত ফলের দ্বারা অনুমিত হয় । অর্থাৎ জ্ঞান ক্রিয়াও অন্যান্য ক্রিয়ার ন্যায় বিষয়গত ফলের জনক হয় । জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া মাত্রই বিষয়ে জ্ঞাততা বা প্রাকট্য নামক ফলের জন্ম

দেয় । গমনাদি ক্রিয়া অপ্রত্যক্ষযোগ্য হলেও একদেশস্থিত বস্তুর দেশান্তরে সংযোগ প্রত্যক্ষ করে যেমন গমন ক্রিয়ার অনুমান সম্ভব হয়, ঠিক তেমনি অপ্রত্যক্ষযোগ্য জ্ঞানেরও তজ্জন্য ফল তথা জ্ঞাততার দ্বারা অনুমান সম্ভব ।[৫১] তবে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ স্বীকার না করলেও, ভাট্টগণ কিন্তু জ্ঞান জন্য বিষয়গত এই জ্ঞাততার প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন ।[৫২] ঘটের সঙ্গে চক্ষু সন্নিকৃষ্ট হওয়ার পর 'অয়ং ঘটঃ'– রূপ ব্যবসায় জ্ঞান উৎপন্ন হয় । ঐ উৎপন্ন জ্ঞান ঘটে বা স্ব-বিষয়ে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য একটি ধর্ম উৎপন্ন করে সেই ধর্মই হল জ্ঞাততা । তাঁদের মতে জ্ঞান প্রত্যক্ষের অযোগ্য হলেও চক্ষু-সংযুক্ত তাদাত্ম্য সন্নিকর্ষের দ্বারা ঘটাদি বিষয়স্থিত ঐ জ্ঞাততার প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় । এইরূপ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য জ্ঞাততা হেতুক অনুমানের দ্বারাই পূর্বোৎপন্ন জ্ঞানের জ্ঞান বা প্রকাশ সম্ভব হয় । 'অয়ং ঘটঃ' এই আকারের ব্যবসায় জ্ঞানোত্তর ঘটে যে জ্ঞাততা ফল উৎপন্ন হয় সেই জ্ঞাততার দ্বারা জ্ঞান অনুমানের আকারটি হল– 'ইয়ং জ্ঞাততা ঘটত্বপ্রকারক ঘটবিশেষ্যক জ্ঞানজন্যা, ঘটবিশেষ্যক ঘটত্বপ্রকারকজ্ঞাততাত্বাৎ' । এই জ্ঞাততা পক্ষক, ঘটবিশেষ্যক ঘটত্বপ্রকারকজ্ঞাততাত্ব হেতুক ঘটত্বপ্রকারকঘটবিশেষ্যক জ্ঞানজন্যত্ব সাধ্যক অনুমান স্থলে ব্যাপ্তির আকারটি হল, যে জ্ঞাততা যদ্বৃত্তি বা যৎপ্রকারক হয়, সেই জ্ঞাততা তৎপ্রকারক তদ্বিশেষ্যক জ্ঞানজন্য হয় । সুতরাং বিষয় প্রকাশ হয় ব্যবসায়ের দ্বারা কিন্তু সেই ব্যবসায় বা জ্ঞান প্রকাশিত হয় তৎপরবর্তীকালে উৎপন্ন অনুমানের দ্বারা। কাজেই জ্ঞান ও বিষয় উভয়ের প্রকাশ সমকালীন হতে পারে না । তবে তাঁদের মতে, বিষয়গত ধর্ম হলেও এই জ্ঞাততা বিষয়তা থেকে ভিন্ন । অর্থাৎ তাঁদের মতে জ্ঞাততা যেমন জ্ঞানের বিষয়ে উৎপন্ন হয় বা বিষয়গত ধর্ম তেমনি বিষয়তাও বিষয়গত ধর্ম । কিন্তু জ্ঞাততা ও বিষয়তা এক নয় । কেননা তাঁদের মতে, জ্ঞাততা জ্ঞান অনুমানের তথা অনুমানের হেতু রূপে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে কিন্তু বিষয়তা জ্ঞান

অনুমানের হেতু হতে পারে না । অর্থাৎ জ্ঞাততার দ্বারা জ্ঞান অনুমিত হলেও বিষয়তার দ্বারা জ্ঞানের অনুমান তাঁরা স্বীকার করেন না । কাজেই জ্ঞাততা ও বিষয়তা অভিন্ন হতে পারে না ।

ভাত রান্না বা রন্ধন একধরণের ক্রিয়া । ভাত রান্না কিংবা অন্যান্য ক্রিয়া স্থলে রন্ধন প্রভৃতি ক্রিয়ার যে ফল তা আমরা উক্ত রন্ধন ক্রিয়ার যে বিষয় ভাত সেই ভাতের মধ্যে অনুভব করতে পারি । একইভাবে জ্ঞানকে ক্রিয়া বলা হলে সেই জ্ঞানরূপ ক্রিয়া জন্য যে ফল সেই ফলটি সেই জ্ঞানের বিষয়ে অনুভূত হবে । কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞান রূপ বিষয়ে উক্তরূপে জ্ঞান জন্য কোন ফল অনুভব করি না বা আমাদের অনুভব হয় না। শুধু তাই নয় যথার্থ জ্ঞান স্থলে বিষয়টি তৎ সমবেত ধর্মাদি সহ প্রতিভাত হয় । যেমন– 'অয়ং ঘটঃ' এই জ্ঞান স্থলে বিষয় ঘট তৎ সমবেত ধর্ম ঘটত্ব বিশিষ্টরূপে অনুভূত হয় এবং ঘটত্ব বিশিষ্ট ঘটের অনুভব হয় । কিন্তু সেক্ষেত্রে জ্ঞানজন্য কোন নতুন ধর্ম বিষয় ঘটে আবির্ভূত হয় না । এরূপ আপত্তির উত্তরে ভাট্টগণ বলতে পারেন ন্যায়াদি অন্যান্য দর্শনেও দেখা যায় যে, দুই বা ততোধিক বস্তুর সংযোগে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তার ফলে অপেক্ষা বুদ্ধির দ্বারা বস্তুতে দ্বিত্ব, ত্রিত্ব প্রভৃতি ধর্মের উদ্ভব হয় । কাজেই জ্ঞান বস্তুতে ধর্ম উৎপন্ন করতে পারে না– একথা যথাযথ নয় । নৈয়ায়িক মতে, দুটি পটের 'এটি একটি পট', 'এটি একটি পট' – এইরূপে পটের একাধিকবার একটি একটি করে একত্বজ্ঞান বা অপেক্ষাবুদ্ধি জন্মায় । একাধিকবার একত্বজ্ঞানই হল অপেক্ষাবুদ্ধি । সেই অপেক্ষাবুদ্ধি থেকেই পটে দ্বিত্ব সংখ্যা উৎপন্ন হয় । দ্বিত্বাদি যে ফল তা কিন্তু পটাদি বস্তুতে থাকে না তা সত্ত্বেও জ্ঞানে সেই দ্বিত্বাদি ধর্ম ভাসিত হতে পারে। ঠিক একই যুক্তিতে বলা যায় জ্ঞানের পূর্বে জ্ঞাততা বিষয়ে না থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান জন্য বিষয়ে জ্ঞাততা ধর্ম আবির্ভূত হতে পারে । জ্ঞান জন্য বিষয়ে কোন নতুন ধর্ম আবির্ভূত

হতে পারে না– এই যুক্তি তাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না । সুতরাং ভাট্ট মতে, সমস্ত জ্ঞানই বিষয়ে কোনও ধর্ম উৎপন্ন করে, যা জ্ঞাততা বা প্রাকট্য । আর এই জ্ঞততা লিঙ্গক অনুমানের দ্বারাই জ্ঞানের প্রকাশ সম্ভব হয় ।

মীমাংসক মুরারী মিশ্রের মতে জ্ঞানের প্রকাশতত্ত্ব-

মীমাংসক মুরারী মিশ্রের মতে, 'অনুব্যবসায়েন জ্ঞানং গৃহ্যতে' ।[৫৩] তাঁর মতে জ্ঞান যেমন স্বতঃ গৃহীত হতে পারে না, তেমনি জ্ঞাততা লিঙ্গক অনুমিতি গ্রাহ্যও হতে পারে না । মিশ্র মতে, কোন বিষয়ে প্রথমোৎপন্ন জ্ঞান তথা ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান অনুব্যবসায়রূপ মানস প্রত্যক্ষের দ্বারা গৃহীত হয়ে থাকে । এই মানস প্রত্যক্ষের স্বরূপ কীরূপ ? তা ন্যায় সম্মত অনুব্যবসায়ের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গেই পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে । কেননা পরতঃপ্রকাশবাদী মুরারী মিশ্র নৈয়ায়িকদের ন্যায় জ্ঞানের প্রকাশক অনুব্যবসায়রূপ মানস প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন । তবে অনুব্যবসায়কে জ্ঞানের প্রকাশকরূপে স্বীকার করলেও অনুব্যবসায়ের স্বরূপ প্রসঙ্গে মিশ্র মতের সঙ্গে ন্যায় মতের পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায় । সেই পার্থক্যও প্রসঙ্গে ক্রমে যথাস্থানে আলোচিত হবে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপেক্ষিতে একথা স্পষ্ট হয় যে যদিও জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য-যোগ, প্রভাকর মীমাংসক কিংবা অদ্বৈত বেদান্ত প্রমুখ সকল সম্প্রদায়ই স্বপ্রকাশতত্ত্বে বিশ্বাসী তথাপি স্বপ্রকাশত্বের স্বরূপ বিষয়ে কিংবা স্বপ্রকাশতত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় যুক্তি প্রদর্শনে তাঁদের মধ্যে ভিন্নতা বর্তমান । জ্ঞানের প্রকাশতত্ত্ব ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁরা নিজ নিজ অভিনবত্ব প্রদর্শন করেছেন । তাই স্বপ্রকাশতত্ত্বের সমর্থক বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে নানা বিষয়ে মতপার্থক্যও বর্তমান । একই অবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে

পরতঃপ্রকাশবাদের তত্ত্বে । জ্ঞানের পরতঃপ্রকাশবাদী সকলেই উৎপন্ন জ্ঞানের প্রকাশে সেই জ্ঞান ভিন্ন জ্ঞানান্তরকে স্বীকার করলেও সেই প্রকাশক জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ে কোন অভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়নি । একথা সত্য যে জ্ঞানের জ্ঞান স্বরূপতঃ একধরণের জ্ঞান । কাজেই জ্ঞানের স্বরূপ উপেক্ষা করে কোন দর্শনই জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারে না । সেক্ষেত্রে জ্ঞানের জ্ঞান সংক্রান্ত মত জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ক মতের দ্বারা কতটা প্রভাবিত সেই আলোচনার অবকাশ থেকে যায় ।

তথ্যসূত্র

১. প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক আলোচনার সুবিধার্থে জ্ঞানের প্রকাশ বিষয়ক মতবাদগুলিকে দুটি মূল সম্প্রদায়ে ভাগ করা হলেও অধ্যাপক বি.কে. মতিলাল তাঁর *পারসেপশন* গ্রন্থে বিষয়টিকে একটু অন্যভাবে উপস্থাপন করেছেন । তিনি এই জ্ঞানের প্রকাশ বিষয়ক যেসমস্ত মতবাদ আছে সেগুলিকে মূলতঃ তিনটি মূল বিভাগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ১) Reflexively aware of itself- যে মতবাদে বলা হয় ব্যক্তি কোন বস্তু বিষয়ক জ্ঞান হলে বস্তুর জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বস্তু বিষয়ক জ্ঞানটিকেও জেনে থাকে । এই প্রকার প্রকাশতত্ত্বের মধ্যে তিনি স্বপ্রকাশত্ববাদকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, ২) Introspectively aware of one’s immediately preceding awarenss– এক্ষেত্রে তিনি স্বজ্ঞার অর্থকে একটু ভিন্ন অর্থ করে মতবাদটি তুলে ধরেছেন । এই মতবাদ অনুসারে কোন বস্তু বিষয়ক জ্ঞান হওয়ার পর বস্তুটির যেমন জ্ঞান হয় তেমনি সেই জ্ঞানটি আবার অন্তঃপ্রত্যক্ষদ্বারা জ্ঞাত হয় । অর্থাৎ এই মতাবলম্বীরা সেই বস্তু বিষয়ক জ্ঞানটির সাক্ষাৎ উপলব্ধির জন্য সেই বস্তু প্রকাশক জ্ঞান অতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান স্বীকার করেন । এই দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে ন্যায় ও মুরারী মিশ্রের মত উল্লেখযোগ্য । এবং ৩) Reflectively aware that an awareness has arisen in one’s mind provided one needs an inference to be aware of one’s awareness অর্থাৎ এই মতাবলম্বীরাও কোন বস্তু বিষয়ক জ্ঞানের প্রকাশের জন্য সেই বস্তু প্রকাশক জ্ঞানাতিরিক্ত অনুমান স্বীকার করেন, যার দ্বারা সেই বস্তু বিষয়ক জ্ঞানটি প্রকাশিত হয় এবং এই তৃতীয় পক্ষে তিনি ভাট্ট মতকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন । (মতিলাল, বি. কে., *পারসেপশন*, ১৯৮৬, পৃ. ১৪৮) প্রথম পক্ষ জ্ঞানের প্রকাশের জন্য বিষয়

প্রকাশের অতিরিক্ত জ্ঞান স্বীকার না করায় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পক্ষ বিষয় প্রকাশক জ্ঞান অতিরিক্ত জ্ঞানান্তরের দ্বারা জ্ঞানের প্রকাশ স্বীকার করায় পূর্বোক্ত তিনটি মতবাদকে মূল দুই মতবাদে অন্তর্ভুক্ত করা যায় । প্রথমটি স্বপ্রকাশবাদ এবং পরবর্তী দুটি পরতঃপ্রকাশবাদ ।

২. পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানতত্ত্বেও জ্ঞানের জ্ঞান সংক্রান্ত প্রশ্নকে কেন্দ্র করে প্রায় একই ধরণের মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায় । যে বিরোধের সূত্রপাত ঘটে KK-মতবাদের মধ্য দিয়ে । এই মতবাদের সমর্থকরা হলেন – Prichard, Hintika, Malcolm প্রমুখ । এই মতবাদের মূল কথা হল যখন আমরা বলি – আমি p-কে জানি তখন তার থেকেই এটা নিঃসৃত হয় – আমি জানি যে, আমি p-কে জানি । যদি a নামক ব্যক্তি p কে জানে এটির সাংকেতিক রূপ হয় Kap তাহলে এই মতবাদের মূল বক্তব্য হল Kap → KaKap । অর্থাৎ a নামক ব্যক্তি p -কে জানে বলার অর্থই হল a জানে যে, a p-কে জানে । কাজেই দেখা যাচ্ছে KK- মতবাদ ভারতীয় প্রমাণশাস্ত্রে স্বপ্রকাশবাদের সমর্থক। এই KK- মতবাদের অন্যতম দুই সমালোচক হলেন Lemmon এবং Danto । Epistemology, New essaya in the theory of knowledge – নামক গ্রন্থে If I know, do I know that I know শীর্ষক প্রবন্ধে E.J. Lemmon এবং C. Danto তাঁর On knowing that we know – প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, KK-মতবাদ গ্রহণযোগ্য মতবাদ নয় ।

Lemmon –এর মতে, ‘Kap’ বলতে বোঝায় a জ্ঞানবান্ p সম্পর্কে অর্থাৎ Lap এবং একইসঙ্গে a এর পক্ষে p-কে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় অর্থাৎ ~Fap । সমগ্র বক্তব্যটিকে সাংকেতিক আকারে প্রকাশ করলে দাঁড়ায় – (i) Kap ↔ Lap & ~Fap । KK-

মতবাদ মানলে এটা থেকে এটি নিঃসৃত হয় যে, (ii) KaKap ↔ La(Lap & ~Fap) & ~Fa(Lap & ~Fap) অর্থাৎ a জানে যে, a জানে p- কে একথা বলা যায় যদি এবং কেবল যদি a এই বিষয়ে জ্ঞানবান্ হয় যে a জ্ঞানবান্ p সম্পর্কে এবং a- এর পক্ষে p-কে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় ও একই সঙ্গে a এর পক্ষে এটি ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় যে, a জ্ঞানবান্ p সম্পর্কে এবং a এর পক্ষে p- কে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় । সহজ কথায় Lemmon-এর যুক্তি অনুসারে কোন কিছু জানা বলতে বোঝায় সেই সম্পর্কে জ্ঞানবান্ হওয়া ও সেটি সে ভুলতে না পারা । তাই বলা হয়েছে যদি a জানে p-কে বলতে বোঝায় a জানে যে, a জানে p-কে তাহলে a জানে যে, a জানে p- কে এর অর্থ হবে a –এই বিষয়ে জ্ঞানবান্ যে, a জ্ঞানবান্ p সম্পর্কে ও a এর পক্ষে p- কে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় এবং একইসঙ্গে a-এর পক্ষে এটা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় যে, a জ্ঞানবান্ p সম্পর্কে ও a –এর পক্ষে p-কে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় । Lemmon বিষয়টিকে বোঝান এই রূপে যে, (iii) ~Fa(p & q) → ~Fap & ~Faq যার থেকে এটা নিঃসৃত হয় যে, (iv) KaKap → ~FaLap। অর্থাৎ যদি a জানে যে a জানে p-কে তাহলে a–এর পক্ষে এটা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় যে, a জ্ঞানবান্ p সম্পর্কে । Lemmon– এর মতে Lap & ~Fap যৌক্তিক দিক থেকে FaLap-এর সঙ্গে সমার্থক । অর্থাৎ a জ্ঞানবান্ p সম্পর্কে এবং a –এর পক্ষে p– কে ভুলা সম্ভব নয় এটি যৌক্তিকভাবে সঙ্গতিপূর্ণ এই বক্তব্যের সাথে যে, a– এর পক্ষে এটি ভুলা সম্ভব যে, a জ্ঞানবান্ p সম্পর্কে । তিনি একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বোধগম্য করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে, ধরা যাক্ Q– নামক একটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর p । আরও ধরা যাক্ a– নামক ব্যক্তি t সময়ে Q- এর উত্তর দিতে ব্যর্থ হয় । কিন্তু t+1 সময়ে a উপলব্ধি করেন যে, p হল Q- এর সঠিক উত্তর । Lemmon– এর মতে,

t+1 সময়ে a– এর সঠিক উত্তর দিতে পারার ক্ষমতা এটা প্রমাণ করে যে সে t সময়েও p- কে ভুলেনি । কাজেই t সময়ে Lap এবং ~Fap দুইই সত্য । কিন্তু একইসঙ্গে t সময়ে a– এর p-এই সঠিক উত্তর দিতে পারার অক্ষমতা এটা প্রমাণ করে যে, t সময়ে a ভুলে গিয়েছিল যে a জ্ঞানবান্ p সম্পর্কে । সুতরাং Lemmon এর বক্তব্যের তাৎপর্য হল t সময়ে a– এর জ্ঞান আছে p সম্পর্কে, কিন্তু a জানে না যে a-এর জ্ঞান আছে p সম্পর্কে ।

KK- মতবাদের অপর এক সমালোচক হলেন C. Danto । Danto –এর মতে, a তখন বলতে পারে যে, সে p– কে জানে যখন সে p- কে বুঝতে পারে । এখন a বুঝতে পারে p-কে এর সাংকেতিক আকার যদি হয় Uap , তাহলে Danto –এর মূল বক্তব্য হল Kap → Uap, যার থেকে এটা নিঃসৃত হয় যে, KaKap → UaKap । অর্থাৎ যদি a জানে p- কে বলতে বোঝায় a বুঝতে পারে p-কে তার থেকে এটা বলা যায় যে, a তখনই বুঝতে পারে a জানে p- কে যদি a জানে যে a জানে p- কে । কাজেই Danto-এর মতে a তখনই বলতে পারে যে, a জানে যে a জানে p- কে কেবলমাত্র যদি সে জানে যে, ‘জ্ঞান বলতে কি বোঝায়’ এবং ‘যথার্থ জ্ঞান লাভের পদ্ধতিটি কিরূপ’ প্রভৃতি । কিন্তু a– এর p- কে জানার জন্য অর্থাৎ Kap- এর জন্য ঐসব জানার প্রয়োজন হয় না । তাই তাঁর মতে, a যদি p- কে জানে তাহলে a জানে যে a জানে p- কে এই মতবাদ অর্থাৎ KK- মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয় । এই KK- মতবাদ বিরোধী মতবাদ ভারতীয় ঘরানায় পরপ্রকাশবাদের সমানার্থক ।

৩. 'প্রদীপে নান্ধকারোহস্তি যত্র চাসৌ প্রতিষ্ঠিতঃ । কিং প্রকাশয়তি দীপঃ প্রকাশো হি তমোবধঃ' ।।– নাগার্জুন, *মধ্যমকশাস্ত্র উইথ দি কমেন্টারি প্রসন্নপদা বাই চন্দ্রকীর্তি,* ১৯৬০, কারিকা- ৭.৯.

৪. 'কথমুৎপদ্যমানেন প্রদীপেন তমো হতম্ । নোৎপদ্যমানো হি তমঃ প্রদীপঃ প্রাপ্নুতে যদা ।।- নাগার্জুন, *মধ্যমকশাস্ত্র উইথ দি কমেন্টারি প্রসন্নপদা বাই চন্দ্রকীর্তি,* ১৯৬০, কারিকা- ৭.১০.

৫. 'অনপেক্ষ্য হি প্রমেয়ান্ অর্থান্ যদি তে প্রমাণসিদ্ধিঃ । ভবতি ন ভবতি কস্যচিদেবম্ ইমানি প্রমাণানি'।।- নাগার্জুন, *বিগ্রহব্যাবর্তনী,* ২০১০, কারিকা – ৪১.

৬. ভট্ট, গোবরধন. পি., *বেসিক ওয়েজ অফ নোয়িং,* ১৯৬২, পৃ. ২৫.

৭. 'জ্ঞানাদ্ অব্যতিরিক্তং সাদৃশ্যম্'– ধর্মোত্তর, *ন্যায়বিন্দুটীকা,* ২০০৭, পৃ. ১৩১.

৮. 'ভিন্নকালং কথং গ্রাহ্যমিতি চেত্ গ্রাহ্যতাং বিদুঃ । হেতুত্বমেব যুক্তিজ্ঞাঃ জ্ঞানাকারার্পণক্ষমম্'- ধর্মকীর্তি, *প্রমাণবার্ত্তিকম্,* ১৯৯৪, পৃ. ১৪৮.

৯. ধর্মকীর্তি, *ন্যায়বিন্দু,* সূত্র- ১০.

১০. 'চিত্তম্ অর্থমাত্রগ্রাহি'– ধর্মোত্তর, *ন্যায়বিন্দুটীকা,* ২০০৭, পৃ. ৯৩.

১১. 'চৈত্তা বিশেষাবস্থাগ্রাহিণঃ সুখাদয়ঃ'– ঐ।

১২. 'নাস্তি সা কাচিৎ চিত্তাবস্থা যস্যাম্ আত্মনঃ সংবেদনং ন প্রত্যক্ষং স্যাৎ'– ঐ।

১৩. মোরিয়ামা, শিনয়া, *অন সেলফ অ্যাওয়ারনেস ইন দি সৌত্রান্তিক এপিসটিমোলজি,* পৃ. ২৬৬.

১৪. 'ইষ্টানিষ্টত্বেন পুরুষাভ্যামেকস্যার্থস্য গ্রহণাদনৈকাত্মত্বদোষঃ প্রসজ্যতে'।।- ধর্মকীর্তি, *প্রমাণবার্ত্তিকম্ উইথ মনোরথনন্দী কৃত বৃত্তি,* ১৯৬৮, পৃ. ২০২.

১৫. 'স্বসংবিত্তিঃ ফলমিতি......'– দিঙ্নাগ, *প্রমাণসমুচ্চয়,* ১৯৩০, পৃ. ২৬.

১৬. 'দ্ব্যাভাসং হি জ্ঞানং উৎপদ্যতে, স্বাভাসং বিষয়াভাসং চ । তস্যোভয়াভাসস্য যৎ স্বসংবেদনং তৎ ফলম্'– হাটোরি, মাসাকি, *দিঙ্নাগ অন পারশেপশন,* ১৯৬৮, পৃ. ১০১.

১৭. ঐ, পৃ. ১০২.

১৮. দিঙ্নাগ, *প্রমাণসমুচ্চয়,* ১৯৩০, পৃ. ২২.

১৯. 'প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়ম্ নামজাত্যাদ্যসংযুতম্'– ঐ, পৃ. ৮.

২০. হাটোরি, মাসাকি, *দিঙ্নাগ অন পারশেপশন,*পৃ. ২৯-৩০.

২১. ঐ, পৃ. ৩০.

২২. মোরিয়ামা, শিনয়া, *অন সেলফ অ্যাওয়ারনেস ইন দি সৌত্রান্তিক এপিসটিমোলজি,* জুন ২০১০, পৃ. ২৬৪.

২৩. সায়ণ মাধবীয়, *সর্বদর্শনসংগ্রহ* (তৃতীয়খণ্ড), ২০১১, পৃ. ২৮.

২৪. 'বিষয়াকারধারিত্বে চ জ্ঞানস্যার্থে দূরনিকটাদিব্যবহারায় জলাঞ্জলির্বিতীর্যেত'- ঐ, পৃ. ২৭.

২৫. 'যদি জড়তামপি তর্হ্যর্থবৎ তদপি জড়ং স্যাৎ'– ঐ।

২৬. বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র, *ন্যায়াবতারঃ,* ১৯৮১, পৃ. ৩৩.

২৭. হেমচন্দ্র, *প্রমাণমীমাংসা,* ১৯৩৯, পৃ. ৩-৪.

২৮. 'অধ্যাবসায়াশ্চ বুদ্ধিব্যাপারো জ্ঞানম্'- বাচস্পতি মিশ্র, *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী,* ১৯৬৭, পৃ. ৪৩.

২৯. *যোগসূত্রম্-* ৪/১৭.

৩০. 'নর ইজ দি অব্জেক্ট এভার কগনাইজড উইদাউট দি কগনাইজার ইন্টারিং ইনটু দি কগনিশন অ্যাজ এ নেসেসারি ফ্যাক্টর'- ঝা, গঙ্গানাথ, *দি প্রভাকর স্কুল অফ পূর্ব মীমাংসা,* ১৯১১, পৃ.৭৮.

৩১. মহান্তি, জে. এন., *কনসাশনেস অ্যান্ড নলেজ ইন ইন্ডিয়ান ফিলোজফি,* জানুয়ারী ১৯৭৯, পৃ. ৮.

৩২. 'গ্রাহকৈকরূপং জ্ঞানমনুমীয়ত ইত্যর্থঃ'- প্রভাকরমিশ্র, *বৃহতী,* টী. শালিকনাথ মিশ্র, ঋজুবিমলয়া, ১৯২৯, পৃ. ৬২.

৩৩. চ্যাটার্জী, তারা, *এন অ্যাটেমপ্‌ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ ইন অদ্বৈতবেদান্ত,* সেপ্টেম্বর ১৯৯১, পৃ.২৭০.

৩৪. 'নাস্যাঃ কর্মভাবো বিদ্যতে ইত্যর্থঃ- প্রভাকরমিশ্র, *বৃহতী,* টী. শালিকনাথ মিশ্র, ঋজুবিমলয়া, ১৯২৯, পৃ. ৬৪.

৩৫. শাস্ত্রী, রায়নরসিংহ, *নৃসিংহপ্রকাশিকা,* পৃ. ২৬৩.

৩৬. শালিকনাথ মিশ্র, *প্রকরণপঞ্চিকা,* ২০১৮, পৃ. ১৭২.

৩৭. সদানন্দযোগীন্দ্র, *বেদান্তসার,* ২০১১, পৃ. ৪২.

৩৮. তৈত্তিরীয় উপনিষদ্- ২/১/৩.

৩৯. 'ঔপনিষদস্য ত্বাত্মৈকত্বাভ্যুপগমাদেকস্য চ বিষয়বিষয়িভাবানুপপত্তের্বিকার ভেদস্য'– শঙ্করাচার্য, *ব্রহ্মসূত্র শাঙ্কর ভাষ্য,* ১৯৩৮, পৃ. ৫০২.

৪০. 'যথা হি লোকে শশকুশপলাশপ্রভৃতীনামত্যন্তভিন্নানাং সতাং নেতরেতরাধীনত্বং ভবতি এবং দ্রব্যাদীনামত্যন্তভিন্নত্বান্নৈবদ্রব্যাধীনত্বং গুণাদীনাং ভবিতুমর্হতি'– ঐ, পৃ, ৫১৭.

৪১. 'দ্রব্যাত্মকতা গুণস্য'- ঐ।

৪২. 'ধায়ানং চিন্তনং যদ্যপি মানসং; তথাহপি পুরুষেণ কর্তুমকর্তুমন্যথা বা কর্তং শক্য, পুরুষতন্ত্রত্বাৎ'– ঐ, পৃ, ১২৯.

৪৩. 'জ্ঞানন্তু প্রমাণজন্যম্'– বেদান্তবাগীশ, কালীবর, *বেদান্তদর্শনম্,* ২০১৭, পৃ. ১০৬.

৪৪. 'জ্ঞানং তু প্রমাণ জন্যং'- শঙ্করাচার্য, *ব্রহ্মসূত্র শাঙ্কর ভাষ্য,* ১৯৩৮, পৃ. ১২৯.

৪৫. 'জ্ঞো নিত্যচৈতন্যোহয়মাত্মা...'- ঐ, পৃ. ৬০৪.

৪৬. 'অবেদ্যত্বে সতি অপরোক্ষব্যবহারযোগ্যতায়াস্তল্লক্ষণত্বাত্'– চিৎসুখাচার্য, *তত্ত্বপ্রদীপিকা=চিৎসুখী,* ১৯১৫, পৃ. ৯.

৪৭. মধুসুদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি,* ১৯৩৭, পৃ. ৭৬৮.

৪৮. 'আত্মানস্তৎপ্রকাশত্বং যৎপদার্থাবভাসনম্ । নাগ্ন্যাদি দীপ্তিবদ্দীপ্তির্ভবতি আন্ধ্যং যতো নিশি' ।।- *অপরোক্ষানুভূতি,* সূত্র- ২২.

৪৯. 'অন্তঃকরণপরিণামে জ্ঞানত্বোপচারাত্'– পদ্মপ্পাদাচার্য, *পঞ্চপাদিকা,* প্রকাশাত্মন্, পঞ্চপাদিকাবিবরণ, অখণ্ডানন্দ, তত্ত্বদীপন এবং ঋজুবিবরণ সহ, ১৯৯৫, পৃ. ২৫৯.

৫০. 'ক্রিয়াভেদো যস্মিন্নর্থানাং প্রাপ্তিকর্মতা'- সুচরিত মিশ্র, *কাশিকা,* ১৯৯০, পৃ. ১২৩.

৫১. 'জ্ঞানক্রিয়া হি সকর্মিকা কর্মভূতেহর্থে ফলং জনয়তি পাকাদিবৎ'– পার্থসারথি মিশ্র, *শাস্ত্রদীপিকা,* ২০০৮,পৃ. ১৫৭.

৫২. 'জ্ঞানজন্যা জ্ঞাততা প্রত্যক্ষা, তথা চ জ্ঞানমনুমীয়া'– বিশ্বনাথ পঞ্চানন ভট্টাচার্য, *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী,* ২০০৩, পৃ. ৪৩৬.

৫৩. বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদঃ,* ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫২৪.

জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ে ন্যায়মত

জ্ঞানের পরতঃপ্রকাশবাদের সমর্থকদের মধ্যে অন্যতম হল নৈয়ায়িক সম্প্রদায় । জ্ঞান ন্যায় মতে নিরাকার এবং সবিষয়ক । অন্যান্য দর্শনে জ্ঞানকে সবিষয়ক অর্থাৎ জ্ঞানের কোন না কোন বিষয় থাকে একথা বলা হলেও ন্যায় দর্শনে 'সবিষয়ক' শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে এক বিশেষ অর্থে । তদনুসারে জ্ঞান 'সবিষয়ক' বলতে বোঝানো হয়েছে জ্ঞান নিজ ভিন্ন বিষয়কে বিষয়রূপে গ্রহণ করে । অর্থাৎ তাঁদের মতে, কোন জ্ঞান বিষয়ের প্রকাশ করলেও সেই জ্ঞানেরই বিষয় জ্ঞানটি নিজে হতে পারে না । কোন জ্ঞান উৎপন্ন হলে জ্ঞানটি নিজেই নিজের গ্রাহক হতে পারে না ঠিকই তবে আন্তর পদার্থরূপে সেই জ্ঞানও সেই জ্ঞান ভিন্ন জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয় । যেহেতু ন্যায় মতে, বিষয়রূপে বাহ্য পদার্থ যেমন জ্ঞানের দ্বারা বিষয়রূপে গৃহীত হয় তেমনি আন্তর পদার্থগুলিও জ্ঞানের দ্বারাই বিষয়রূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে । আন্তর পদার্থরূপে জ্ঞানও তাই জ্ঞানের দ্বারাই, আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে জ্ঞানান্তরের দ্বারা প্রকাশিত হয় । তাঁদের বক্তব্য অনুসারে ধরা যাক্ 'ক' একটি জ্ঞান উৎপন্ন হল যা 'খ' নামক বিষয়কে প্রকাশ করছে । কিন্তু সেই 'ক' জ্ঞান বিষয়রূপে 'খ'- কে প্রকাশ করলেও 'ক' কে প্রকাশ করতে পারে না । সেই 'ক'- কে প্রকাশ করার জন্য 'গ' নামক একটি ভিন্ন জ্ঞানের প্রয়োজন । বস্তু গ্রাহক যে জ্ঞান তা নিরাকার ও সবিষয়ক, সেই বিষয়ে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি । জ্ঞান মাত্রেই নিজ ভিন্ন অন্য বিষয়কে বিষয় করে । সেই কারণে জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন এবং বিষয়ের প্রকাশক জ্ঞান তার নিজের প্রকাশের জন্য জ্ঞানান্তরের উপর নির্ভরশীল । জ্ঞানের প্রকাশ সম্পর্কিত এই ন্যায় মত,

পরতঃপ্রকাশবাদ নামে পরিচিত । জ্ঞান প্রকাশক সেই জ্ঞানটি, ন্যায় দর্শনে, পরিচিত অনুব্যবসায় নামে । প্রশ্ন হচ্ছে জ্ঞান প্রকাশক অনুব্যবসায়ের স্বরূপ কী ?

'অনুব্যবসায়' শব্দটি 'অনু' ও 'ব্যবসায়' শব্দ দ্বয়ের যোগফল । সেই শব্দ যুগলমধ্যে 'ব্যবসায়' শব্দ আবার বি+অব+ষো - ধাতু এবং 'ঘঞ্' প্রত্যয় হতে নিষ্পন্ন । ব্যুৎপন্ন শব্দ মধ্যে বি+অব+ষো – ধাতু নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধির বাচক হয় এবং ভাববিহিত 'ঘঞ্' প্রত্যয় সেই ধাত্বর্থকেই জ্ঞাপন করে, কোন অতিরিক্ত অর্থের সংযোজন করে না। কাজেই বি+অব+ষো – ধাতুর সঙ্গে 'ঘঞ্' প্রত্যয় যোগে উৎপন্ন 'ব্যবসায়'- রূপ সমগ্র শব্দ নিশ্চয়রূপ অর্থের জ্ঞাপক হয় । মহর্ষি গৌতম প্রদত্ত প্রত্যক্ষ লক্ষণ সূত্রে উল্লিখিত 'ব্যবসায়াত্মক' শব্দের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেছেন 'ব্যবসায়াত্মক' শব্দ অনিশ্চয়াত্মক বা সংশয় জ্ঞান থেকে প্রত্যক্ষ প্রমার ব্যবচ্ছেদের উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হয়েছে।[১] তাঁর মতে, উক্ত সূত্রে 'ব্যবসায়' শব্দ প্রয়োগে মহর্ষির অভিপ্রায় হল একথা বোঝানো যে, প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হল ব্যবসায়াত্মক বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, যা সংশয়াত্মক জ্ঞান থেকে বিলক্ষণ । বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরও ভাষ্যকারের মত সমর্থন করে নিয়েই বলেছেন – '.......তদ্‌ব্যুদাসার্থমাহ – ব্যবসায়াত্মকমিতি । ন, সংশয়স্যানিন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষপূর্বকত্বাৎ' ।[২] 'ব্যবসায়াত্মক' শব্দ কেবল নিশ্চয়ার্থেরই বাচক নয়, বিকল্প অর্থেরও বোধক হয় । তাই 'ব্যবসায়াত্মক' শব্দ প্রয়োগের দ্বারা মহর্ষি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অন্যতম একটি প্রকার সবিকল্পক জ্ঞানকেই নির্দেশ করেছেন- এই মত মেনে তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলেন ব্যবসায়, বিনিশ্চয় এবং বিকল্প শব্দগুলি সমার্থক ।[৩] তাঁর মতে, মহর্ষির ১.১.৪ নং প্রত্যক্ষ লক্ষণ সূত্রে সংশয়াত্মক জ্ঞানে অতিব্যাপ্তির যে আশঙ্কা করা হয় তা উক্ত লক্ষণে 'অব্যভিচারি' পদ নিরাস্য । তিনি বলেন সংশয় হল একধরণের ব্যভিচারী জ্ঞান । ব্যভিচারী জ্ঞান বলতে বোঝায় অতদ্ –

কে অর্থাৎ বস্তুতঃপক্ষে বস্তুটি যা নয় তাকে তদ্ রূপে অর্থাৎ সেই পদার্থরূপে জ্ঞান ।[৪] সংশয় স্থলে একই ধর্মীতে বিরুদ্ধ নানা ধর্মের জ্ঞান হয় । অর্থাৎ সংশয় স্থলে, কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্মের নিশ্চয় না হওয়ায় এবং বিরুদ্ধ নানা ধর্মের জ্ঞান হওয়ায়, ধর্মীটি যে ধর্ম বিশিষ্ট নয় সেই ধর্মেরও প্রকারাংশে ভান হয়ে থাকে । যেমন– দূর থেকে কোন একটি মাঝারি উচ্চতার বস্তুকে দেখে 'অয়ং স্থানুর্বা পুরুষো বা'– এরূপ সংশয় স্থলে প্রকৃতই বস্তুটি হয় স্থানুত্ব ধর্ম বিশিষ্ট নতুবা পুরুষত্ব ধর্ম বিশিষ্ট হয় । উভয় ধর্মই বা উক্ত দুই বিরুদ্ধ ধর্মই একই ধর্মীতে থাকতে পারে না । কিন্তু যে ধর্মটি উক্ত ধর্মীতে থাকে না সেই ধর্মেরও জ্ঞান হওয়ায় সংশয় জ্ঞান স্থলেও অতদ্-কে তদ্– রূপে জ্ঞান হয় । কাজেই সংশয় জ্ঞান হল ব্যভিচারী জ্ঞান। তাই বাচস্পতি মিশ্রের মতে, প্রত্যক্ষের লক্ষণ সূত্রে মহর্ষি গৌতম 'অব্যভিচারি' পদের নিবেশ করায় তার দ্বারাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান যে সংশয় জ্ঞান থেকে ভিন্ন তা নিশ্চয় হয়ে যায় । সংশায়াত্মক জ্ঞানে প্রত্যক্ষ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণার্থে 'ব্যবসায়াত্মক' শব্দ প্রয়োগ করা নিষ্প্রয়োজন । এই কারণেই তাৎপর্যটীকাকার বলেছেন, 'ব্যবসাত্মক' শব্দের দ্বারা সংশয় জ্ঞানে প্রত্যক্ষ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি বারণ মহর্ষির অভিপ্রেত হতে পারে না । মহর্ষি উক্ত স্থলে বিকল্পরূপ অর্থ বোধের অভিপ্রায়েই 'ব্যবসায়াত্মক' শব্দ গ্রহণ করেছেন । 'ব্যবসায়াত্মক' শব্দের বিকল্প বা বিনিশ্চয় অর্থ গ্রহণ পূর্বক মহর্ষি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অন্যতম একটি প্রকার সবিকল্পক জ্ঞানকে নির্দেশ করেছেন ।[৫] বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এই মতের সমর্থনেই বলেছেন– 'তস্য বিভাগঃ অব্যপদ্যেশ্যং ব্যবসায়াত্মকমিতি' ।[৬] অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বিবিধ বিভাগ হল নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক । 'অব্যপদেশ্য' শব্দ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ এবং 'ব্যবসায়' শব্দ সবিকল্পক প্রত্যক্ষের দ্যোতক । কিন্তু তাৎপর্যটীকাকার তথা বৃত্তিকারের ব্যাখ্যায় যতটা অভিনবত্ব পাওয়া যায় ততটা যৌক্তিকতা দেখা যায় না । তদপেক্ষা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই

অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। তাৎপর্যটীকা কিংবা বৃত্তি উভয় স্থলেই সংশয় জ্ঞান 'অব্যভিচারী' পদ নিরাস্য বলা হলেও তা সর্বক্ষেত্রে যথাযথ নয় । কেননা সংশয় সর্বত্রই ব্যভিচারী হয় না । ব্যভিচারী জ্ঞানের অর্থ যদি হয় 'অতদ্' অর্থাৎ যেটি যা নয় তাতে 'তদ্' নিশ্চয় অর্থাৎ সেই প্রকারের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান তাহলে সংশয় জ্ঞান ব্যভিচারী জ্ঞান হতে পারে না । কেননা একধর্মীতে বিরুদ্ধ নানা ধর্মের জ্ঞান জন্য সংশয় স্থলে বিশেষ ধর্মের অদর্শন বশতঃ কোন একটি নির্দিষ্ট ধর্মের নিশ্চিত জ্ঞান সম্ভব হয় না । ফলে এই প্রকার সংশয় জ্ঞানে ঐ প্রকার নির্দিষ্ট ধর্মের বা 'তদ্' নিশ্চয়ের অভাবে 'অতদ্'-এ 'তদ্'-এর নিশ্চয় বা ব্যভিচার নিশ্চয়ও সম্ভব হয় না । যেমন– 'অয়ং স্থানুর্বা পুরুষো বা'– পূর্বোক্ত স্থলের কথাই ধরা যাক্ । দূরে দৃষ্ট বস্তুটিতে স্থানুত্ব ধর্মের নিশ্চয় যেমন সম্ভব নয় তেমনি বস্তুটির পুরুষত্ব ধর্মাবচ্ছিন্নরূপেও জ্ঞান হয় না । কাজেই সংশয়ের স্থলে কোন ধর্মেরই নিশ্চয় না হওয়ায়, বস্তুটি যা নয় সেই রূপে নিশ্চয় বা ব্যভিচার নিশ্চয়ও সম্ভব নয় । এমতাবস্থায় সংশয় জ্ঞান এক প্রকারের ব্যভিচারী জ্ঞান এই অভিমত অসঙ্গত হয় । উপরন্তু 'ব্যবসায়াত্মক' পদের আভিধানিক তথা পারিভাষিক অর্থ হল নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান ।

অন্যদিকে 'অনুব্যবসায়' শব্দ মধ্যস্থ 'অনু' শব্দ পশ্চাৎ বা পরবর্তীরূপ অর্থের বাচক । কিন্তু 'পশ্চাৎ' বা 'পরবর্তী' শব্দ হল নিয়ত সাপেক্ষ শব্দ । পূর্ববর্তীরূপে কোনকিছু স্বীকৃত না হলে 'পরবর্তী' শব্দ নিরর্থক হয় । এখন বিবেচ্য 'অনুব্যবসায়' শব্দ মধ্যস্থ 'অনু' শব্দ পূর্ববর্তীরূপে কাকে অপেক্ষা করে ? নিয়মানুযায়ী 'পরবর্তী' প্রভৃতি শব্দ স্থলে পূর্ববর্তীরূপে কী স্বীকৃত হবে সেই বিষয়ে বক্তার তাৎপর্যই প্রমাণ হয়ে থাকে । কাজেই এখন প্রশ্ন হল বর্তমান স্থলে বক্তার তাৎপর্যটি কী অর্থাৎ কোন্ বস্তুর পরবর্তীত্ব বোঝানোর অভিপ্রায়ে 'অনুব্যবসায়' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে ? প্রত্যক্ষাদি ব্যবসায় জ্ঞানের

অনন্তর তৎপ্রকাশক অনুব্যবসায় স্বীকৃত হওয়ায় 'অনু' শব্দের দ্বারা পূর্ববর্তী ব্যবসায় জ্ঞানেরই নির্দেশ করা হয়েছে । এইরূপে 'অনুব্যবসায়' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হয় জ্ঞান পরবর্তী নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান । কিন্তু অনুব্যবসায়ের এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তার লক্ষণ ধর্ম হতে পারে না । কেননা, 'জ্ঞান পরবর্তী নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানত্ব' অনুব্যবসায়ের লক্ষণ ধর্ম হলে অনুভবের পরবর্তী স্মৃতি, পরামর্শ জ্ঞানের পরবর্তী অনুমিতি এবং শব্দ জ্ঞানের পরবর্তী শাব্দ বুদ্ধিতেও অনুব্যবসায়ের লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যায়। উক্ত স্মৃত্যাদি জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি বারণার্থে 'জ্ঞান পরবর্তী নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানত্ব'-কে অনুব্যবসায়ের লক্ষণ বলার পরিবর্তে 'জ্ঞান পরবর্তী জ্ঞান বিষয়ক মানস প্রত্যক্ষত্ব'-কে অনুব্যবসায়ের লক্ষণরূপে নির্দেশ করা হয় ।[৭]

স্মৃত্যাদি জ্ঞানে অতিব্যাপ্তি নিবারণের লক্ষ্যে অনুব্যবসায়কে মানস প্রত্যক্ষ বললেও লক্ষণটি সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ হয় না । 'অনুব্যবসায়' শব্দ থেকে ব্যুৎপন্ন শব্দের মধ্যে কেবল 'ব্যবসায়' শব্দের দ্বারাই জ্ঞান বিষয়ক মানস প্রত্যক্ষরূপ অর্থ বোধিত হয় । যে কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য যে, তা কারণরূপে বিষয়াপেক্ষী অর্থাৎ কারণ হিসাবে বিষয় পূর্বে না থাকলে তদ্বিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব নয় । জ্ঞান বিষয়ক মানস প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় না । এইরূপ মানস প্রত্যক্ষও বিষয়রূপ পূর্বোৎপন্ন জ্ঞানাপেক্ষী ; বিষয়স্বরূপ জ্ঞান পূর্বে থাকলে তবেই তদ্বিষয়ক মানস প্রত্যক্ষ উৎপত্তির অবকাশ থাকে । এখন 'জ্ঞান বিষয়ক মানস প্রত্যক্ষ' যদি জনক রূপে পূর্বের জ্ঞানকে অপেক্ষা করে তাহলে কেবল 'ব্যবসায়' শব্দই 'জ্ঞান পরবর্তী জ্ঞান বিষয়ক মানস প্রত্যক্ষ'- রূপ অর্থের জ্ঞাপক হয় । কেননা 'ব্যবসায়' শব্দের অর্থ 'জ্ঞান বিষয়ক মানস প্রত্যক্ষ' এবং জ্ঞান বিষয়ক মানস প্রত্যক্ষ আবার পূর্বের জ্ঞানকে অপেক্ষা করে । সুতরাং কেবল 'ব্যবসায়' শব্দই 'জ্ঞান পরবর্তী জ্ঞান

বিষয়ক মানস প্রত্যক্ষ'- রূপ অর্থের বাচক হয়ে যায় । ফলে পুনরায় 'জ্ঞান পরবর্তী'-রূপ অর্থ বোধের অভিপ্রায়ে 'ব্যবসায়' শব্দের পূর্বে 'অনু' শব্দের প্রয়োগে পুনরুক্তি দোষ প্রসক্ত হয় অথবা 'অনু' শব্দের প্রয়োগ ব্যর্থ হয় ।

পূর্বোক্ত সমস্যার সমাধানে বলা হয় যে, 'অনুব্যবসায়'-রূপ সমগ্র শব্দের অর্থ হল জ্ঞান পরবর্তী জ্ঞান বিষয়ক মানস প্রত্যক্ষ । কেবল 'ব্যবসায়' শব্দই উক্তার্থের বোধক হলেও সমগ্র 'অনুব্যবসায়' শব্দও একই অর্থ বহন করে । কেননা ব্যুৎপন্ন শব্দ মধ্যে 'অনু' শব্দ কোন অতিরিক্ত অর্থের সংযোজন করে না । তবে অতিরিক্ত অর্থ সংযোজন না করলেও অনুব্যবসায় স্থলে 'অনু' শব্দ বক্তার 'জ্ঞান পরবর্তীত্ব'রূপ তাৎপর্যার্থেরই জ্ঞাপক হয় । বক্তার অভিপ্রেতার্থ বা তাৎপর্যার্থের অনুরোধে 'অনু' শব্দের প্রয়োগ হওয়ায় 'অনু' শব্দের প্রয়োগ প্রসঙ্গে বৈফল্যের আশঙ্কাও ওঠে না । সুতরাং 'অনুব্যবসায়' শব্দের অর্থ হল জ্ঞান পরবর্তী জ্ঞান বিষয়ক মানস প্রত্যক্ষ ।

মীমাংসক ভাট্ট সম্প্রদায় এবং নৈয়ায়িক উভয়েই পরতঃপ্রকাশবাদী ও বস্তুবাদে বিশ্বাসী । অর্থাৎ উভয়েই স্বীকার করেন জ্ঞান অতিরিক্ত বিষয়ের সত্তা আছে এবং উভয়েই মানেন জ্ঞান বিষয়রূপে জ্ঞানান্তরের দ্বারা প্রকাশিত হয় অথচ জ্ঞান প্রকাশক জ্ঞানকে ভাট্টদের মতো নৈয়ায়িক জ্ঞাততা লিঙ্গক অনুমিতি বলেননি । তাঁরা জ্ঞানকে মানস প্রত্যক্ষগম্য বলেছেন । স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন ওঠে এরূপ অনুব্যবসায়াত্মক মানস প্রত্যক্ষ স্বীকারের পেছনে তাঁদের যুক্তি কী ?

নৈয়ায়িকদের স্বীকৃত জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য এক অর্থে জ্ঞানের জ্ঞান সংক্রান্ত পরতঃপ্রকাশবাদ স্বীকার তথা অনুব্যবসায় স্বীকারের পথ প্রশস্ত করেছে । তাঁদের মতে, উৎপন্ন জ্ঞান মাত্রই সবিষয়ক । তাঁদের মতে, জ্ঞান মাত্রই কোন বিষয়কে অবলম্বন করে

উৎপন্ন হয় এবং সেই বিষয় উক্ত জ্ঞান থেকে ভিন্ন । একইভাবে জ্ঞানও বিষয়রূপে অপর জ্ঞানের দ্বারা গৃহীত হয় । অর্থাৎ বিষয়রূপে জ্ঞানও গ্রাহক জ্ঞান থেকে ভিন্ন হয় । জ্ঞান সবিষয়ক একথার নৈয়ায়িক স্বীকৃত অর্থ পূর্বেই বলা হয়েছে জ্ঞান নিজ ভিন্ন অন্য বিষয়কে জানে । অর্থাৎ জ্ঞানে যাবতীয় পদার্থ বিষয় হলেও সেই জ্ঞান নিজে নিজের বিষয় হতে পারে না । তাই জ্ঞান ওপর জ্ঞানের বিষয় রূপেই জ্ঞাত হতে পারে । জ্ঞান কোন ভাবেই স্বপ্রকাশ হতে পারে না । এইরূপে নৈয়ায়িকগণ জ্ঞানকে স্বীকার করার ফলে একাধারে যেমন জ্ঞান অতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে সেই সঙ্গে জ্ঞানের প্রকাশ বিষয়ে নৈয়ায়িকগণকে পরতঃপ্রকাশবাদ স্বীকার করতে হয়েছে । কেননা বিষয় জ্ঞান থেকে ভিন্ন হলে বিষয়রূপ জ্ঞান তার গ্রাহক জ্ঞান থেকেও ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। ফলে তাঁদের মতে, জ্ঞান ও প্রকাশক জ্ঞান স্বপ্রকাশত্ববাদীদের ন্যায় অভিন্ন বলার উপায় নেই । তবে তাঁরা জ্ঞানকে ফল বলে স্বীকার করলেও ক্রিয়া বলে স্বীকার করেন না ।[৮] জ্ঞান, তাঁদের মতে, আত্মার গুণ । আত্মার গুণ রূপে স্বীকার করার ফলে সেই জ্ঞানকে অন্যান্য সুখ-দুঃখাদি গুণের ন্যায় মানস প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বলেই স্বীকার করতে হয়েছে । আর সেই জ্ঞান গ্রাহক মানস প্রত্যক্ষের নৈয়ায়িক সম্মত নাম হল অনুব্যবসায়।

ন্যায় মতে, কোন জ্ঞানকে জানার অবকাশ থাকে তখনই যখন সেই জ্ঞান বিষয়ে সংশয় হয় । ঘট-পটাদি বিষয় জেনেছি কিনা সেই বিষয়ে সংশয় যেমন প্রমাণসিদ্ধ তেমনি জ্ঞানের বিষয়েও অর্থাৎ ‘আমার এই বিষয়ে জ্ঞান আছে কিনা’, ‘আমি ঘট জানি কি না’– এইরূপ সংশয়ও অনুভব সিদ্ধ । সংশয়ের অন্যতম কারণ হল ধর্মিতাবচ্ছেদক পুরস্কারে ধর্মীর জ্ঞান এবং উক্ত ধর্মীতে কোনও এক বিশেষ কোটির নিশ্চয়াভাব । দূর থেকে পুরুষ ও স্থানুর সমান উচ্চতারূপ সাধারণ ধর্মের দর্শনে সম্মুখস্থ বস্তুটিতে ‘অয়ং স্থানুর্বা পুরুষো বা’– এইরূপ সংশয় দেখা যায় । এইরূপ সংশয়ের ক্ষেত্রে ইদং ধর্মীতে

ইদন্ত্ব ধর্মীতাবচ্ছেদকরূপে এবং পুরুষত্ব ও স্থানুত্ব বিরুদ্ধ ধর্মের কোন একটির নিশ্চয়াভাব কারণ হয়ে থাকে । ঠিক একই ভাবে আত্মারূপ ধর্মীতে আত্মত্ব ধর্মীতাবচ্ছেদক এবং ঘটজ্ঞান ও ঘটজ্ঞানাভাবরূপ কোটিদ্বয়ের কোন একটির নিশ্চয়াভাব 'ঘটজ্ঞানবান্ অহং ন বা'– এইরূপ সংশয়ের জনক হতে পারে । আর এইরূপ জ্ঞান বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকায় ঘট জ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান বা অনুব্যবসায়রূপ মানস প্রত্যক্ষ অবশ্য স্বীকার্য । এখন লক্ষ্য করা যাক্ এই প্রত্যক্ষকে মানস প্রত্যক্ষ বলার কারণ কি ? এই অনুব্যবসায় চাক্ষুষাদি বাহ্য প্রত্যক্ষ নয় কেন ?

ন্যায় দর্শনে জীব প্রত্যক্ষ তথা অনিত্য প্রত্যক্ষকে মূলতঃ ছয় প্রকার বলা হয়ে থাকে– ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, স্পার্শন, শ্রোত্র ও মানস ।[৯] সেগুলির মধ্যে যে প্রত্যক্ষে মন করণ হয় সেই প্রত্যক্ষ হল মানস প্রত্যক্ষ । মন জ্ঞান মাত্রের প্রতি কারণ হলেও জ্ঞান মাত্রের প্রতি তা করণ হয় না । কিন্তু মন যে প্রত্যক্ষের প্রতি করণ হয় সে প্রত্যক্ষকে বলা মানস প্রত্যক্ষ । ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান প্রকাশক এই অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান বাহ্য প্রত্যক্ষ হতে পারে না । যেহেতু বাহ্য প্রত্যক্ষ হল চক্ষুরাদি পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষ । চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে চাক্ষুষ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় সেই সব কোন বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞান সন্নিকৃষ্ট হতে পারে না । ফলে বাহ্যেন্দ্রিয় জন্য না হওয়ায় সেই সমস্ত জ্ঞানের জ্ঞানকে বাহ্য প্রত্যক্ষ বলা যায় না । যেমন ধরা যাক্ আমি একটি ঘট দেখছি । এখানে দেখার বা প্রত্যক্ষের বিষয় হল ঘট । ঘটটি চাক্ষুষ জ্ঞানের বিষয় যেহেতু ঘটের সঙ্গে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের যে সংযোগ ঘটটির প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে ঘটটি সেই সংযোগের আশ্রয় । কিন্তু চাক্ষুষাদি জ্ঞান সেই বাহ্য প্রত্যক্ষের জনক চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় জন্য যে সংযোগ সেই সংযোগের আশ্রয় হতে পারে না । ফলে চাক্ষুষাদি জ্ঞান চাক্ষুষ, ঘ্রাণ প্রভৃতি কোন বাহ্য প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না । বাহ্যেন্দ্রিয় ঘটাদি বাহ্য বিষয়

গ্রহণেই সমর্থ হয় ; ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানাদি আন্তর বিষয়ের গ্রহণে নয় । আত্মার গুণ বিশেষ জ্ঞানের বা ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের গ্রহণে অন্তরিন্দ্রিয় মনই সক্ষম । কেবল জ্ঞান নয় মনের দ্বারা আত্মা ও আত্মগত সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, কৃতি, দ্বেষ প্রভৃতি বিশেষ গুণ প্রভৃতির জ্ঞানও হয়ে থাকে । কাজেই আন্তর বিষয় গ্রহণে করণ হল মন । তাই সেই ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান গ্রাহক জ্ঞানকে বা অনুব্যবসায়কে মানস প্রত্যক্ষ বলা হয়েছে । অনুব্যবসায় যে মানস প্রত্যক্ষ তার সমর্থনে তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ বলেছেন– '................জানামীত্যনুব্যবসায়ো মানস ইতি চেৎ' ।[১০] আচার্য উদয়নও জ্ঞানের প্রত্যক্ষ যে মানস প্রত্যক্ষই এই মতের সমর্থনেই বলেছেন – '.......পূর্বজ্ঞানোপনীতস্যৈব মনসা বেদনাৎ' ।[১১] অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানকে মানস প্রত্যক্ষ বলা হলে এই জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক যে, সেই প্রত্যক্ষ কীভাবে সম্ভব হয় বা অনুব্যবসায় কখন উৎপন্ন হয় ?

ঘট-পটাদি বস্তুকে বিষয় করে প্রথমে 'অয়ং ঘটঃ', 'অয়ং পটঃ' ইত্যাকারের ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান আত্মাতেই উৎপন্ন হয় । ব্যবসায় জ্ঞানোৎপত্তির পরে সেই ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানকে বিষয় করে ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান প্রকাশক জ্ঞান বা অনুব্যবসায় সংযুক্ত-সমবায়রূপ সন্নিকর্ষের দ্বারা হয়ে থাকে । মনঃসংযুক্ত আত্মায় জ্ঞান তথা ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি হওয়ায় অন্তরিন্দ্রিয় মনের সঙ্গে ব্যবসায় জ্ঞানের সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষই হয়ে থাকে । অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় মন, সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষরূপ লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা, আত্মস্থ ব্যবসায় জ্ঞান বিষয়ক মানস প্রত্যক্ষের জনক হয়ে থাকে । কেবল লৌকিক সন্নিকর্ষ নয়, অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান অলৌকিক সন্নিকর্ষ জন্যও । 'অহং ঘটং জানামি'- এই আকারের অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানে যেমন পূর্বের ঘট বিষয়ক ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান বিষয়রূপে ভাসমান হয় তেমনি সেই ব্যবসায় জ্ঞানের বিষয় ঘটও বিষয় হয় । মনঃসংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষরূপ লৌকিক সন্নিকর্ষ

ব্যবসায় জ্ঞানের কারণরূপে অপেক্ষিত হলেও তার দ্বারা ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের বিষয় ঘটাদির গ্রহণ হতে পারে না । কেননা মন রূপ অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা ঘটাদি বাহ্য বিষয় গৃহীত হয় না । শুধু তাই নয় ঘটাদি বাহ্য বিষয় কারণরূপে ব্যবসায়ের পূর্ববর্তী হলেও সাক্ষাৎভাবে অনুব্যবসায়ের পূর্বে থাকে না বা পূর্ববর্তী হতে পারে না । কিন্তু ব্যবসায় জ্ঞানের বিষয় ঘট-পটাদি সাক্ষাৎভাবে অনুব্যবসায়ের পূর্ববর্তী না হলেও জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষের সাহায্যে অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের বিষয় হতে পারে । আসলে কোনও ঘটনার প্রতি অন্য কোনও ঘটনা কারণ হতে পারে দুই ভাবে– সত্ত্বয়া বা কেবল তার উপস্থিতি অথবা জ্ঞাততয়া অর্থাৎ জ্ঞাতরূপে । যেমন অনুমিতি স্থলে ব্যাপ্তির সত্তা নয়, ব্যাপ্তির জ্ঞানই কারণ হয় । প্রত্যক্ষাত্মক বুদ্ধির প্রতি ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান কারণ হয় না, ইন্দ্রিয় সত্ত্বয়া কারণ হয় । অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের পূর্বে সাক্ষাৎভাবে উপস্থিত থেকেই ঐরূপ বুদ্ধির উৎপাদক হয় । তাই ইন্দ্রিয় হল ঐ প্রত্যক্ষাত্মক বুদ্ধির প্রতি সত্ত্বয়া কারণ । ঘটাদির সঙ্গে অনুব্যবসায়ের জনক মন সন্নিকৃষ্ট হতে পারে না । তাই ঘটদি সাক্ষাৎভাবে অনুব্যবসায়ের জনক হয় না । তবে ঘটাদি বিষয়ের স্বরূপতঃ সত্ত্বা না থাকলেও জ্ঞানগত সত্ত্বা অনুব্যবসায়ের জনক হতে পারে । ঘটাদি বিষয় সাক্ষাৎভাবে অনুব্যবসায়ের পূর্বক্ষণে উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, পূর্বের সেই ঘট বিষয়ক অনুভব জন্য সংস্কারই উদ্বুদ্ধ হয়ে অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের জনক হতে পারে । যে ঘট-পটাদি ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের বিষয় হয়, সেই ঘট-পটাদি জ্ঞান জন্য সংস্কার আত্মাতে থেকে যায় । পরবর্তী কালে সেই ঘট-পটাদি বিষয়ক ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান জন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয় এবং ঘট-পটাদির স্মরণ হয় । পূর্বজ্ঞাত ঘট-পটাদির স্মরণই বর্তমান কালীন জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তুর বিশেষণরূপে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ করে । এইভাবে

অন্তরিন্দ্রিয় মন বাহ্যেন্দ্রিয় নিরপেক্ষভাবে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষের দ্বারা ঘট-পটাদি বাহ্য বিষয়ের সঙ্গে সন্নিকৃষ্ট হয়ে অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের প্রতি কারণ হয় ।

ব্যবসায় জ্ঞানের প্রতিও আত্মমনঃ সন্নিকর্ষ কারণ । যেহেতু জ্ঞানমাত্রেরই প্রতিই আত্মঃমন সন্নিকর্ষ কারণ । তবে আত্মমনঃসংযোগ রূপ কারণ অভিন্ন হলেও ব্যবসায়াত্মক এবং অনুব্যবসায়াত্মক এই দ্বিবিধ জ্ঞান কিন্তু অভিন্ন নয় । কেননা অনুব্যবসায় ও ব্যবসায় জ্ঞানদ্বয় অভিন্ন বলা হলে উভয়ের যুগপৎ উৎপত্তি স্বীকার করতে হয় । কিন্তু ন্যায় মতে তা স্বীকার করা যায় না । অনুব্যবসায় ও ব্যবসায়ের যুগপৎ বা একইসঙ্গে উৎপত্তি হতে হলে উভয়ের উৎপত্তির কারণসামগ্রীকেও তাদের পূর্বে একইসঙ্গে উপস্থিত থাকতে হবে । কিন্তু ব্যবসায় জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বক্ষণে ব্যবসায় জ্ঞানোৎপত্তি সামগ্রীই থাকে, অনুব্যবসায় উৎপত্তি সামগ্রী থাকে না । কেননা অনুব্যবসায়ের অন্যতম কারণ ব্যবসায় জ্ঞান, যা অনুব্যবসায়ের পূর্বে থেকে তার জনক হয় । কারণরূপে ব্যবসায় পূর্বে না থাকলে অনুব্যবসায় হতে পারে না ।

আগেই বলা হয়েছে ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান প্রকাশিত হয় অনুব্যবসায়ের দ্বারা । ব্যবসায় হল সেই অনুব্যবসায়ের বিষয়রূপে কারণ । যেহেতু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতি বিষয় অন্যতম কারণ । আবার ব্যবসায় জ্ঞানের বিষয় হল ঘট, পট প্রভৃতি । ঘট-পটাদি যা ব্যবসায় জ্ঞানের বিষয় সেই ঘট-পটাদি বিষয়ক ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানই অনুব্যবসায়ের বিষয়রূপে কারণ । কারণ হিসাবে ব্যবসায় অনুব্যবসায়ের পূর্বে না থাকলে যে অনুব্যবসায় সম্ভব হতে পারে না- সেই মতের সমর্থনে বাৎস্যায়নের বক্তব্য উপস্থাপন করা যেতে পারে । ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে, বিনষ্টেন্দ্রিয় অর্থাৎ অন্ধ, বধির প্রভৃতি যাদের ইন্দ্রিয় বৈকল্য আছে তাদের সেই বৈকল্যবশতঃ তদ্ তদ্ ইন্দ্রিয় জন্য

ব্যবসায়রূপ জ্ঞান জন্মায় না । ফলে বিষয়াভাবে মনের দ্বারা সেই বিষয়ে অনুব্যবসায়ও জন্মে না ।[১২] আচার্য উদয়নের মতে, বিষয়ের দ্বারা অবিশেষিতরূপে কেবল জ্ঞান সম্ভব নয় । অনুব্যবসায়ও জ্ঞান সুতরাং তারও আবশ্যিকরূপে বিষয় আছে । জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হওয়ার অর্থই হল কোনও বিষয় বিষয়ক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হওয়া ।[১৩] ব্যবসায় ও অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয় না । বিষয় ভিন্ন হওয়ায় অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান থেকে ভিন্ন হয় । তাছাড়া এরূপ স্থলে কারণরূপে বিষয় পূর্বে থাকলে তবেই কার্য উৎপন্ন হয় এবং একইসঙ্গে সেই কারণ কার্য থেকে ভিন্নও হয় । কারণরূপে ব্যবসায় পূর্বে থাকলে তবেই তার পরবর্তীতে ব্যবসায়কে বিষয় করে অনুব্যবসায় সম্ভব হতে পারে । এর দ্বারা ব্যবসায়রূপ কারণের সঙ্গে কার্য অনুব্যবসায়ের ভেদও সিদ্ধ হয়ে থাকে ।

ব্যবসায়ের প্রকাশক বাক্য এবং অনুব্যবসায়ের উপস্থাপক বাক্যও কিন্তু ভিন্ন । ভাষার এরূপ ব্যবহারও ব্যবসায় ও অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান দ্বয়ের ভেদ সূচনা করে । যখন আমরা একটা ঘটকে দেখি তখন ‘এটা একটা ঘট’ বলে সেই জ্ঞানকে প্রকাশ করি । ‘এটা একটা ঘট’ এরূপ বাক্যের ব্যবহার সাধক জ্ঞানটি হল ঘটের জ্ঞান । অন্যদিকে সেই ব্যবসায় জ্ঞানের প্রকাশক অনুব্যবসায়কে ব্যক্ত করা হয় ‘আমি জানি যে, এটি একটি ঘট’– এরূপ বাক্যের দ্বারা । ‘আমি জানি যে, এটি একটি ঘট’– এইরূপ ভাষায় যা প্রকাশ করি তা, ‘এটি একটি ঘট’ বলে যা প্রকাশ করি তা থেকে ভিন্ন । এইরূপ দ্বিবিধ ভাষার ব্যবহারও, তাদের জনক ব্যবসায় ও অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান দ্বয়ের ভেদ সিদ্ধ করে । এর পরেও প্রশ্ন উঠতে পারে ব্যবসায় ও অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানে ঠিক কোন কোন বিষয় ভাসিত হয় ? অর্থাৎ ব্যবসায় ও অনুব্যবসায়ের মধ্যে বিষয়গত পার্থক্যটি ঠিক কীরূপ ?

কোন জ্ঞানের বিষয় কি হবে বা কোনটি জ্ঞানের বিষয় হবে সেই প্রসঙ্গে তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ বলেছে- যে জ্ঞান যৎ ব্যবহারের অনুকুল শক্তিযুক্ত সেই জ্ঞান তদ্বিষয়ক ।[১৪] যেমন- 'অয়ং ঘটঃ'– এই আকারের ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান জ্ঞাতার ঘট ব্যবহারে সহায়ক হয়ে থাকে । ঘট ব্যবহারের অনুকূল শক্তিবিশিষ্ট এই জ্ঞান তাই ঘট বিষয়ক । কেবল ঘট জ্ঞানের অস্তিত্বই ঘট ব্যবহারে সহায়ক হওয়ায় নৈয়ায়িকগণ 'অয়ং ঘটঃ'– এই আকারের ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানে কেবল ঘটকেই বিষয়রূপে স্বীকার করে থাকেন । প্রসঙ্গত বলা দরকার 'অয়ং ঘটঃ'– এরূপ বিশিষ্ট বুদ্ধির প্রতি বিশেষণের জ্ঞান কারণ হয় ।[১৫] 'অয়ং ঘটঃ'- এরূপ জ্ঞানে ঘট বিশেষ্যরূপে, ঘটত্ব বিশেষণরূপে ও সমবায় সংসর্গরূপে ভাসিত হয় । নৈয়ায়িকগণ এরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষ্যতা, বিশেষণতা ও সংসর্গতারূপে ত্রিবিধ বিষয়তাই স্বীকার করেন । তবে তদতিরিক্ত বা সেই বিষয় প্রকাশের অতিরিক্ত সেই বিষয় প্রকাশক জ্ঞান বা তদাশ্রয় আত্মা কোন কিছুই সেই জ্ঞানের বিষয়রূপে স্বীকৃত হয় না । ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান বিষয়রূপে কাকে প্রকাশ করে, তার সপক্ষে আরো যুক্তি হল বিষয় সাধনতারূপ ধর্মের বিদ্যমানতা । যেমন 'অয়ং ঘটঃ' এই ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানে কেবল ঘট ব্যবহার সাধনতারূপ ধর্ম বিদ্যমান থাকায় তা কেবল ঐ ঘট বিষয় মাত্রেরই প্রকাশক হয়ে থাকে।[১৬] যদি সেই বিষয় প্রকাশ অতিরিক্ত ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানে আত্মা বা জ্ঞাতা ও জ্ঞান বিষয়রূপে স্বীকৃত হতো তাহলে তৎতৎ বিষয়ক ব্যবহার সাধনতাও ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানে অবশ্যই স্বীকৃত হত । কিন্তু তা স্বীকৃত হতে পারে না । পূর্বেই বলা হয়েছে ব্যবসায় জ্ঞানের পূর্বে ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষের অভাবে ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানোৎপত্তিক্ষণে ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের প্রকাশ সম্ভব হয় না । একই ভাবে ব্যবসায় জ্ঞানোৎপত্তিক্ষণে জ্ঞাতার প্রকাশও সম্ভব হয় না । কেননা জ্ঞানোৎপত্তিক্ষণে জ্ঞাতার প্রকাশ সম্ভব হতে গেলেও

জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে জ্ঞাতার সন্নিকর্ষ আবশ্যক । আত্মার প্রকাশে মন ইন্দ্রিয়ত্ব ধর্মাবচ্ছিন্নরূপে কারণ হয় । কাজেই ব্যবসায়ের দ্বারা আত্মার প্রকাশের জন্য ব্যবসায়ের পূর্বে আত্ম-মনঃ-সংযোগের উপস্থিতি আবশ্যক । কিন্তু মন যেমন আত্মাদি আন্তর বিষয়ের গ্রাহক হয় তেমনি বাহ্য বিষয় প্রত্যক্ষের প্রতি অর্থাৎ ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের প্রতিও কারণ হয় । অর্থাৎ মন জ্ঞান মাত্রের প্রতি কারণ । তবে মন সকল জ্ঞানের প্রতি কারণ হলেও একই কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম পুরষ্কারে কারণ হয় না । মনস্ত্ব ধর্মাবচ্ছিন্ন রূপে মন জ্ঞানমাত্রের প্রতি কারণ । তাই মন যখন মনস্ত্ব ধর্মাবচ্ছিন্নরূপে কোন কার্যের জনক হয় তখন মনে থাকে সাধারণ কারণতা ।[১৭] ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের প্রতি যেমন ইন্দ্রিয় বিষয় সংযোগ কারণ তেমনি ইন্দ্রিয়-মনঃ-সংযোগ ও আত্ম-মনঃ-সংযোগও সাধারণ কারণ । ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের উৎপত্তির পূর্বক্ষণে বাহ্য বিষয়ের গ্রাহক বাহ্যেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সম্বন্ধ হলে এবং আত্মার সঙ্গে মন সম্বন্ধিত হলে তবেই আত্মায় বাহ্য বিষয়ক ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান সম্ভব হয় । অন্যদিকে আন্তর বিষয়ের গ্রহণে মন ইন্দ্রিয়ত্ব ধর্মাবচ্ছিন্ন রূপে কারণ হয় । মন ইন্দ্রিয়ত্ব ধর্মাবচ্ছিন্নরূপে যে জ্ঞান উৎপন্ন করে তাই মানস প্রত্যক্ষ ।আত্মা কিংবা জ্ঞানের প্রত্যক্ষে তাই ইন্দ্রিয়ত্ব ধর্মাবচ্ছিন্নরূপে মনের সঙ্গে বিষয়রূপে আত্মা ও জ্ঞানের সন্নিকর্ষ কারণ । কাজেই ঘটাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষক্ষণে সেই আত্মার ও জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হতে গেলে ঘটাদি বিষয় প্রত্যক্ষের পূর্বে ইন্দ্রিয়ত্ব ধর্মাবচ্ছিন্ন রূপে মনের সঙ্গে আত্মার ও জ্ঞানের সম্বন্ধ হওয়া প্রয়োজন । কিন্তু ঘটাদির প্রত্যক্ষ উৎপত্তির পূর্বক্ষণে মন মনস্ত্ব ধর্মাবচ্ছিন্নরূপে সেই প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ । ফলে সেই ক্ষণে জ্ঞাতার বা জ্ঞানের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ত্ব ধর্মাবচ্ছিন্ন রূপে মনের সম্বন্ধ হতে পারে না । সুতরাং ব্যবসায় উৎপত্তিক্ষণে জ্ঞাতা কিংবা জ্ঞান কোনটিরও

প্রকাশ সম্ভব হয় না । ব্যবসায় জ্ঞানের দ্বারা কেবল ঘট-পটাদি বিষয়েরই জ্ঞান বা প্রকাশ সম্ভব ।

ঘট-পটাদি বিষয় প্রকাশের পাশাপাশি জ্ঞান ও জ্ঞাতারও প্রকাশ হয় অনুব্যবসায়ের দ্বারা । পূর্বেই বলা হয়েছে অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান মনঃসংযুক্ত সমবায় সন্নিকর্ষের দ্বারা যেমন ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানকে বিষয় করে, তেমনি জ্ঞান- লক্ষণ সন্নিকর্ষরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষ বলে পূর্বের ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের বিষয় ঘট-পটাদিকেও বিষয়রূপে উপস্থাপিত করে । ন্যায় মতে অনুব্যবসায়ের দ্বারা তদ্বদ্‌বিশেষ্যকত্ব ও তৎপ্রকারকত্বও বিষয়রূপে প্রকাশিত হয় । যেমন- 'অয়ং ঘটঃ' এই ব্যবসায় জ্ঞানের প্রকাশক 'ঘটমহং জানামি'– এই অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানে আত্মা বিশেষ্যরূপে, আত্মায় পূর্বোৎপন্ন জ্ঞান, জ্ঞানে ঘট এবং ঘটে ঘটত্ব প্রকাররূপে ভাসিত হয় ।[১৮] একইসঙ্গে আত্মাতে জ্ঞানের, জ্ঞানে ঘটের এবং ঘটে ঘটত্বের সম্বন্ধও সংসর্গরূপে ভাসমান হয় । অর্থাৎ ন্যায় মতে, জ্ঞান হয়েছে এইটুকুই মাত্র অনুব্যবসায়ে বিষয় হয় না । জ্ঞান হয়েছে এটি যেমন অনুব্যবসায়ের দ্বারা জানা যায় তেমনি জ্ঞানটি কী প্রকারের বা জ্ঞানটির স্বরূপ কীরূপ, তাও জানা যায় । পূর্ববর্তী ব্যবসায় জ্ঞানটি প্রত্যক্ষাত্মক না অনুমিত্যাত্মক সেটিও অনুব্যবসায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয়ে থাকে । কিন্তু প্রশ্ন হল, জ্ঞান মাত্রই যখন বিষয়াপেক্ষী বলা হয়েছে ও সেই নিয়মে অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানে পূর্ববর্তী ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানটি বিষয়রূপে স্বীকৃত হয়েছে তার পরেও অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানে বিষয়রূপে ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের বিষয়কে স্বীকার করার বিশেষ কারণ কী ?

পূর্ববর্তী জ্ঞানের বিষয়টি অর্থাৎ বাহ্য বিষয়টি অনুব্যবসায়ে বিষয় হয় একথা যদি স্বীকার না করা হয় অর্থাৎ 'এটি ঘট', 'এটি পট' ইত্যাদি জ্ঞানোৎপত্তির পর উৎপন্ন

অনুব্যবসায়ে যদি কেবল জ্ঞানটিই বিষয় হয় ঘট-পটাদি বিষয় প্রকাশিত না হয়, তাহলে ঘট জ্ঞানের অনুব্যবসায় ও পট জ্ঞানের অনুব্যবসায়ের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে না । কেননা সেক্ষেত্রে পূর্বের ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের অনন্তর 'আমার ঘট জ্ঞান আছে' কিংবা 'আমার পটের জ্ঞান আছে'– এরূপ অনুব্যবসায়ের পরিবর্তে উভয় প্রকার জ্ঞানের অনুব্যবসায়েরই আকার হবে– 'আমার জ্ঞান আছে' কিংবা 'আমি জ্ঞানবান্' এইরূপে । কিন্তু তা হতে পারে না যেহেতু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে 'আমার ঘট জ্ঞান আছে' ও 'আমার পট জ্ঞান আছে'– এই আকারের অনুব্যবসায় অনুভব সিদ্ধ । যেকোন ধরণের জ্ঞানের অনুব্যবসায় অভিন্ন আকারের হলে তা থেকে পূর্ববর্তী জ্ঞানগুলির মধ্যে ভিন্নতা অধরা থেকে যাবে । সব ক্ষেত্রে অনুব্যবসায়ের দ্বারা কেবল আমার জ্ঞান হয়েছিল এটিই সিদ্ধ হবে কোন্ বিষয়ের জ্ঞান হয়েছিল তা উপলব্ধি করা যাবে না ।

নিরাকার বিজ্ঞানের বিষয়ই হল ব্যাবর্তক ।[১৯] অর্থাৎ বিষয়ের ভেদের জন্যই বিভিন্ন জ্ঞান পরস্পরের থেকে পৃথক্ হয়ে থাকে । অনুব্যবসায় প্রভৃতি জ্ঞানকে যদি কেবল জ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান বলা হয় তাহলে তা বৌদ্ধ বিজ্ঞানমাত্রতাবাদ স্বীকারেরই নামান্তর । এরূপ জ্ঞান স্বীকার করলে জ্ঞান জ্ঞানাতিরিক্ত বিষয় বিষয়কই - এই পক্ষের হানি ঘটে । ফলে তা ভাববাদের স্বীকারকে আবশ্যিক করে তোলে । কাজেই অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান যে পূর্ববর্তী জ্ঞানের বিষয়কে অর্থাৎ ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের বিষয়কেও বিষয় করে একথা স্বীকার করতে হয় । কিন্তু সেক্ষেত্রে অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান লৌকিক সন্নিকর্ষ ও অলৌকিক উভয় প্রকার সন্নিকর্ষ জন্য হওয়ায় এরূপ আলোচনার অবকাশ থেকে যায় যে, অনুব্যবসায় লৌকিক প্রত্যক্ষ নাকি অলৌকিক প্রত্যক্ষ ?

ন্যায় দর্শনে লৌকিক প্রত্যক্ষ ও অলৌকিক প্রত্যক্ষ– প্রত্যক্ষের দ্বিবিধ ভেদ স্বীকৃত । কোন প্রত্যক্ষ লৌকিক সন্নিকর্ষ জন্য উৎপন্ন হলে সেই প্রত্যক্ষ লৌকিক নামে পরিচিত হয় । ন্যায় মতে এই লৌকিক প্রত্যক্ষের জনক লৌকিক সন্নিকর্ষ মূলতঃ ছয় প্রকার– সংযোগ সন্নিকর্ষ, সংযুক্ত-সমবায় সন্নিকর্ষ, সংযুক্ত-সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ, সমবায় সন্নিকর্ষ, সমবেত-সমবায় সন্নিকর্ষ এবং বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষ । উক্ত ষড়্বিধ সন্নিকর্ষের যেকোন একটির সহযোগে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হলে তা লৌকিক প্রত্যক্ষ নামেই পরিচিত হয় । যেমন– চক্ষু সংযুক্ত ঘটের প্রত্যক্ষ এক ধরণের লৌকিক প্রত্যক্ষ। অন্যদিকে কোন প্রত্যক্ষ অলৌকিক সন্নিকর্ষ জন্য হলে তা অলৌকিক প্রত্যক্ষ নামে খ্যাত হয় । অলৌকিক সন্নিকর্ষ আবার তাঁদের মতে, ত্রিবিধ– জ্ঞানলক্ষণ, সামান্যলক্ষণ এবং যোগজ সন্নিকর্ষ । এই তিন প্রকার সন্নিকর্ষের যেকোন একটির সহযোগে উৎপন্ন প্রত্যক্ষ অলৌকিক প্রত্যক্ষ নামে পরিচিত হয় । যেমন– যোগীরা যে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত অর্থাৎ ত্রিকালের আকাশ, পরমাণু প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ বিষয়ক প্রত্যক্ষ করে থাকেন তা লৌকিক কোন প্রকার সন্নিকর্ষের দ্বারা হতে পারে না। কেননা ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ কেবল বর্তমান কালে স্থিত বস্তুর সঙ্গেই সম্ভব, অতীত, অনাগত ও আকাশাদি মহৎ বা পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্তুর সঙ্গে সম্ভব নয় । তাই যোগীর বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি ত্রিকালের আকাশ, পরমাণু প্রভৃতি সমস্ত পদার্থের প্রত্যক্ষে লৌকিক সন্নিকর্ষ অতিরিক্ত যোগজ সন্নিকর্ষ নামক অলৌকিক সন্নিকর্ষ স্বীকার করতে হয় । যোগজ সন্নিকর্ষ জন্য যোগীর যে প্রত্যক্ষ তা অলৌকিক প্রত্যক্ষ নামে পরিচিত । কাজেই অনুব্যবসায়ে লৌকিক ও অলৌকিক উভয় প্রকার সন্নিকর্ষের ভূমিকা থাকলেও অনুব্যবসায় লৌকিক প্রত্যক্ষ নাকি অলৌকিক প্রত্যক্ষরূপে গণ্য হবে সেই প্রশ্নটি থেকে যায় ।

উভয় প্রকার সন্নিকর্ষজ হলেও সাধারণত উৎপন্ন জ্ঞানটি প্রকৃতিগত ভাবে কোন প্রকারের হবে তা নির্ভর করে জ্ঞানটির মূল বিশেষণের জ্ঞানের উপর । সাধারণতঃ কোন জ্ঞানের মূল বিশেষণটির জ্ঞান যে সন্নিকর্ষ সহায়ে হয়ে থাকে জন্য জ্ঞানটি সেই সন্নিকর্ষ জন্য উৎপন্ন জ্ঞানের প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় । এই স্থলে দেখা যাক্ অনুব্যবসায়ের বিষয়গুলির মধ্যে মূল বিশেষণ কোন্‌টি ? পূর্বে অনুব্যবসায়ের বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ্য করেছি অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানে আত্মা বিশেষ্যরূপে এবং সেই আত্মায় ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান বিশেষণরূপে বিষয় হয়ে থাকে ।[২০] অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের সেই মূল বিশেষণ ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানটি মনরূপ ইন্দ্রিয় সংযুক্ত-সমবায় রূপ লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বারা গ্রহণ করে থাকে । তাই তা লৌকিক প্রত্যক্ষরূপে পরিচিত । যেমন প্রত্যভিজ্ঞাত্মক জ্ঞানের ক্ষেত্রে লৌকিক ও অলৌকিক উভয় প্রকার সন্নিকর্ষ কার্যকর হলেও মূল বিশেষণের জ্ঞান লৌকিক সন্নিকর্ষ জন্য হওয়ায় তা লৌকিক প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানরূপেই বিবেচিত হয়ে থাকে । তবে অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানও লৌকিক ও অলৌকিক সন্নিকর্ষ সহায়ে উৎপন্ন লৌকিক প্রত্যক্ষ হলেও তা কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞা নয়, প্রত্যভিজ্ঞা থেকে ভিন্ন ।

পূর্বদেশ ও পূর্বকালে দৃষ্ট কোন বিষয়ের বর্তমান দেশ ও বর্তমান কালে পুনরায় সাক্ষাৎকার হলে পূর্ব অভিজ্ঞতার স্মরণ জন্য জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলে ‘এটি সেই বস্তু’- এই আকারের যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকেই প্রত্যভিজ্ঞাত্মক জ্ঞান বলা হয় । বর্তমান দেশ ও বর্তমানকালে বস্তুটির ইন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষই পূর্বদেশ বা পূর্বকাল বিষয়ক সংস্কারের উদ্বোধক হয়ে প্রত্যভিজ্ঞাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন করে । সুতরাং এক্ষেত্রে পূর্বকাল ও পূর্বদেশে স্থিত বস্তুটির বর্তমান দেশ ও বর্তমানকালে সাক্ষাৎ উপস্থিতি আবশ্যক । যেমন পূর্বে বারাণসীতে দৃষ্ট দেবদত্তের কালান্তরে অযোধ্যায় সাক্ষাৎকার ঘটলে পূর্বের অভিজ্ঞতা জন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়ে ‘সোহয়ং দেবদত্তঃ’– এই আকারের প্রত্যভিজ্ঞাত্মক

জ্ঞান উৎপন্ন হয় । এরূপ জ্ঞানে দেবদত্তের অযোধ্যায় সাক্ষাৎ উপস্থিতি অর্থাৎ অতীতের জ্ঞানের বিষয়টির বর্তমান কালে সাক্ষাৎ উপস্থিতি আবশ্যক । কিন্তু অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের ক্ষেত্রে আগেই বলা হয়েছে পূর্বানুভবের বিষয় অর্থাৎ ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের বিষয়টির সাক্ষাৎ উপস্থিতি নয়, বিষয়টির জ্ঞান আবশ্যক হয় । পূর্বের ব্যবসায় জ্ঞানের বিষয় ঘট-পটাদি সাক্ষাৎ উপস্থিত থেকে অনুব্যবসায়ের বিষয় হয় না, সেই ঘট-পটাদি বিষয়ক ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানই অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের বিষয়রূপে অপেক্ষিত হয় । কারণগত ভিন্নতা জ্ঞান দ্বয়ের ভিন্নতার পরিচায়ক হয় । পূর্ব অভিজ্ঞতার বিষয় যে ঘট-পটাদি তা বর্তমান ক্ষণে বিনষ্ট হলেও বা সাক্ষাৎ ভাবে বিদ্যমান না থাকলেও অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে । কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞাত্মক জ্ঞানের ক্ষেত্রে ঘট-পটাদি বিষয় বিনষ্ট হলে বা বর্তমানকালে তাদের সাক্ষাৎ উপস্থিতি না থাকলে প্রত্যভিজ্ঞা হতে পারে না । এরূপ কারণগত ভিন্নতা প্রমাণ করে যে অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান প্রত্যক্ষস্বরূপ প্রত্যভিজ্ঞাত্মক জ্ঞান থেকে ভিন্ন । উভয় প্রকার জ্ঞান জন্য শব্দ ব্যবহারও উভয় জ্ঞানের ভিন্নতা প্রমাণ করে । যেমন- কোন ঘট বিষয়ে ‘এটি ঘট’ এরূপ জ্ঞান হওয়ার পর পুনরায় সেই ঘটের প্রত্যক্ষ জন্য আমাদের যে প্রত্যভিজ্ঞাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় তার আকারটি হল– ‘এটি সেই ঘট’ । অন্যদিকে ঘট জ্ঞানের অনন্তর সেই ঘট বিষয়ক যে অনুব্যবসায় হয় তার আকারটি হল– ‘আমি জানি যে, এটি ঘট’ । এরূপ দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানকে যেমন প্রত্যভিজ্ঞা বলা হয় না, তেমনি প্রথম প্রকার জ্ঞানটিকেও অনুব্যবসায়ের আকার বলে স্বীকার করা হয় না । প্রথম আকারের জ্ঞানে অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হয়েছে পূর্বদেশ ও বর্তমান দেশে স্থিত ঘট । অন্যদিকে অনুব্যবসায়ে বিষয়রূপে ঘট বিষয়ক পূর্বের জ্ঞান বা ব্যবসায়কে স্বীকার করা হয়েছে ।

অনুব্যবসায় ও প্রত্যভিজ্ঞা স্থলে এরূপ দ্বিবিধ আকারে শব্দ ব্যবহারও তাই উভয় প্রকার জ্ঞান যে ভিন্ন তা প্রমাণ করে ।

পূর্বেই বলা হয়েছে ব্যবসায় অনুব্যবসায়ের দ্বারা প্রকাশিত হয় । কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, ব্যবসায় উৎপন্ন হওয়ার কতক্ষণ পরে অনুব্যবসায় উৎপন্ন হয় ? জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার কতক্ষণ পরে অনুব্যবসায় হতে পারে সেই প্রসঙ্গে তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায়ের বক্তব্যটি তুলে ধরা যেতে পারে । আচার্য গঙ্গেশ সুখাদির প্রতিবন্ধকতার প্রসঙ্গ এনে বলেছেন– সুখাদি এবং সুখাদি জ্ঞানের সামগ্রী দ্বারা বাধ বশতঃ জ্ঞান উৎপন্ন হয়েই বেদ্য হবে এমন নয় ।[২১] তাৎপর্য এই যে, বাহ্যেন্দ্রিয় সহযোগে ব্যবসায় জ্ঞানোৎপত্তির পর যদি সুখাদি উৎপন্ন হয় তাহলে সেই সুখাদির সামগ্রী অনুব্যবসায়ের উৎপত্তির প্রতি প্রতিবন্ধক হয় । সুখাদির কারণসামগ্রী এবং জ্ঞান গ্রাহক কারণসামগ্রী উভয়ই বিদ্যমান থাকলেও তদ্বিষয়ক সুখাদির কারণসামগ্রী জন্য সেই বিষয়ে সুখাদি উৎপন্ন হতে পারে । ফলে সেক্ষেত্রে জ্ঞানের গ্রহণ সম্ভব হয় না । সাধারণতঃ কোনও কার্যের প্রতি যাদের উপস্থিতি কার্যের সহায়ক হয় তাদের অনুপস্থিতি কার্যটির ব্যাঘাতক বা প্রতিবন্ধক হয়, তেমনি যে সমস্ত বস্তুর অভাব কার্যের জনক হয় তাদের ভাব বা উপস্থিতিও কার্যটির প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে । মৃত্তিকা, কুম্ভকার প্রভৃতির উপস্থিতি যেমন ঘট কার্যের জনক হয়, তেমনি কুম্ভকারের গৃহে হিংস্র বাঘের অনুপস্থিতিও ঘট কার্যের সহায়ক হয়। ফলে মৃত্তিকা প্রভৃতির অভাব যেমন ঘট কার্যের প্রতিবন্ধক হয়, তেমনি কুম্ভকারের গৃহে বাঘের উপস্থিতিও ঘটরূপ কার্যটির প্রতিবন্ধক হয় । একইভাবে ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের উৎপত্তির পরে সুখাদি উৎপন্ন না হলে অনুব্যবসায় উৎপন্ন হতে পারে । ফলে সুখাদির উপস্থিতি অনুব্যবসায়াত্মক

জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি প্রতিবন্ধক হয় । সেক্ষেত্রে জ্ঞান উৎপন্ন হলেও তার অনুব্যবসায় উৎপন্ন হয় না ।

জ্ঞানোৎপত্তির অব্যবহিত পরেই জ্ঞানের প্রকাশ বা অনুব্যবসায় অনিবার্যভাবে হয় এরূপ যদি বলা হয় তাহলে ধারাবাহিক বুদ্ধিও উৎপন্ন হতে পারে না । কিন্তু ধারাবাহিক বুদ্ধি স্বীকৃত হয় । অবিচ্ছেদে প্রতিক্ষণে একই বিষয়ের একই আকারের জ্ঞানকে ধারাবাহিক জ্ঞান বলে । যেমন– যখন ঘটের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ জন্য ঘট প্রত্যক্ষের অন্যান্য কারণ সামগ্রীর উপস্থিতিতে ঘট বিষয়ে 'অয়ং ঘটঃ', 'অয়ং ঘটঃ'– এইরূপে একই আকারের জ্ঞান হয়ে থাকে তখন তাকে বলা হয় ধারাবাহিক জ্ঞান । যেক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্নভাবে একই বিষয়ে একই আকারের একাধিক জ্ঞান বা ধারাবাহিক জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেক্ষেত্রে সেই বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েই অনুব্যবসায় হবে এরূপ বলা যায় না । কাজেই জ্ঞানের উৎপত্তি হলেই তা অন্য জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হবে এটি মানা যায় না । তাছাড়া যদি জ্ঞান উৎপত্তির পর অনিবার্যভাবে অনুব্যবসায় হয় বলে স্বীকার করা হয় তাহলে পরামর্শ জ্ঞানের পর অনুমিতি, পদজ্ঞানের পর শাব্দ বুদ্ধি কিংবা সাদৃশ্য জ্ঞানের পর উপমিতি জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হবে না । কেননা সেক্ষেত্রেও পরামর্শাদি জ্ঞান হওয়ার পর আবশ্যিকভাবে তৎ তৎ জ্ঞান প্রকাশক অনুব্যবসায়ই উৎপন্ন হতে থাকবে । কিন্তু, দেখা যায় পরামর্শাদির অনন্তর অনুব্যবসায়ের পরিবর্তে অনুমানাদিই উৎপন্ন হয় । অর্থাৎ পরামর্শাদি অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের জনক হওয়ার পরিবর্তে অনুমিত্যাদির জনক হয় । কাজেই ব্যবসায় জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পরেই তার অনুব্যবসায় হবে বা জ্ঞান উৎপন্ন হলেই প্রকাশিত হবে– এই মত ন্যায় দর্শনে স্বীকৃত নয় । সুতরাং ব্যবসায় উৎপন্ন হলে তার পরেই আবশ্যিকভাবে অনুব্যবসায় উৎপন্ন হবে এমনটি নয় । প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে কী এপক্ষ স্বীকার করতে হবে যে, ব্যবসায়

জ্ঞানোৎপত্তির পরে যদি কারো অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের ইচ্ছা হয় তবে তার অনুব্যবসায় উৎপন্ন হবে ? বস্তুতঃ অনুব্যবসায়ের উৎপত্তি ব্যক্তির ইচ্ছা নির্ভর- এপক্ষও স্বীকার করা যায় না । কারণ ইচ্ছা হল ইচ্ছা বিষয়ক জ্ঞানপূর্বক । একইভাবে অনুব্যবসায় বিষয়ক ইচ্ছা অনুব্যবসায়ের জ্ঞান পূর্বক হবে । অর্থাৎ যদি অনুব্যবসায়ের জ্ঞান বা জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান পূর্বে থাকে তবে সেই অনুব্যবসায় বিষয়ক ইচ্ছা হতে পারে । কিন্তু অনুব্যবসায়ের পূর্বে অনুব্যবসায়ের জ্ঞান থাকতে পারে না । কাজেই এপক্ষ স্বীকার করা সম্ভব নয় যে, অনুব্যবসায়ের উৎপত্তি ব্যক্তির ইচ্ছা নির্ভর । সুতরাং জ্ঞান উৎপন্ন হলেই তার অনুব্যবসায় আবশ্যিকভাবে উৎপন্ন হবে একথা স্বীকার করা যায় না ।

কিন্তু তার পরেও এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যে কোন জ্ঞান বা ব্যবসায়েরই কী অনুব্যবসায় উৎপন্ন হতে পারে ? অর্থাৎ সব জ্ঞানেরই কী অনুব্যবসায় হয় ? ‘ঘটমহং জানামি’ কিংবা ‘ঘটজ্ঞানবানহম্’ – এইরূপে ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের যে প্রত্যক্ষ হয় তা একপ্রকারের বিশিষ্ট বৈশিষ্টাবগাহী বুদ্ধি । পূর্বেই বলা হয়েছে অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানে ‘অহম্’ বিশেষ্যরূপে, ‘জ্ঞান’ বিশেষণরূপে, জ্ঞানে ঘট বিশেষণরূপে এবং ঘটে ঘটত্ব বিশেষণরূপে বিষয় হয় । আবার আত্মাতে জ্ঞানের, জ্ঞানে ঘটের এবং ঘটে ঘটত্বের সম্বন্ধটিও সম্বন্ধরূপে বিষয় হয়েছে । এইরূপে অনুব্যবসায় বিশিষ্টের বৈশিষ্ট্যকে বা সম্বন্ধকে বিষয় করায় অনুব্যবসায় একপ্রকারের বিশিষ্ট বৈশিষ্টাবগাহী বুদ্ধি বা বিশিষ্টের বৈশিষ্ট্যবিষয়ক জ্ঞান । বিশিষ্ট বৈশিষ্টাবগাহী বুদ্ধি বা বিশিষ্টের বৈশিষ্ট্যবিষয়ক জ্ঞানে বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক জ্ঞান কারণ হয় । বিশেষণের যা বিশেষণ হয় তাকে বিশেষণতাবচ্ছেদক বলা হয় ।[২২] যেমন- ‘ঘটমহং জ্ঞানামি’ এটি একটি বিশিষ্ট বৈশিষ্টাবগাহী বুদ্ধি এবং এর প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক জ্ঞান কারণ । এই জ্ঞানের বিশেষণ ঘট এবং সেই বিশেষণ ঘটের বিশেষণ হল ঘটত্ব । কাজেই ঘটত্ব হল

বিশেষণতাবচ্ছেদক । সুতরাং 'ঘটমহং জ্ঞানামি' এই বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহী বুদ্ধির প্রতি বিশেষণতাবচ্ছেদক প্রকারক জ্ঞান বা 'ঘটত্ব বিশিষ্ট ঘটের জ্ঞান' অপেক্ষিত হবে ।

তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ এই বিষয়টিকেই একটু অন্যভাবে উপস্থাপন করেছেন । তাঁর মতে, 'ঘটমহং জানামি' এইরূপ অনুব্যবসায় স্থলে 'অহং' হল বিশেষ্য এবং বিশেষণ হল জ্ঞান । এই জ্ঞানরূপ বিশেষণাংশে আবার ঘটবিষয়কত্ব প্রকার হয়েছে । এইরূপ অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানে ঘটবিষয়কত্ব এবং জ্ঞানত্ব এই দুইটিই বিশেষণ হওয়ায় অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানকে বলা হয় জ্ঞানত্ববিশিষ্ট জ্ঞানপ্রকারকজ্ঞান । জ্ঞানত্ব বিশিষ্ট জ্ঞান প্রকারক জ্ঞানের প্রতি জ্ঞানত্ব বিশিষ্ট জ্ঞানের জ্ঞান কারণ । সুতরাং অনুব্যবসায়ের জন্য জ্ঞানত্ব বিশিষ্ট জ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োজন । জ্ঞানত্ব বিশিষ্ট জ্ঞানের প্রতি আবার জ্ঞানত্বের জ্ঞান কারণ । এই জ্ঞানত্বের জ্ঞানটি নির্বিকল্পক জ্ঞান । কেননা এই জ্ঞানত্বের জ্ঞানকেও যদি আবার বিশিষ্ট জ্ঞান বা সবিকল্পক জ্ঞান বলা হয় তাহলে সেই বিশিষ্ট জ্ঞানও বিশেষণের জ্ঞানকে অপেক্ষা করবে এইক্রমে অনবস্থা দোষ অনিবার্য হবে । তাই সেই সমস্যা সমাধানে বলা হয় জ্ঞানত্ব বিশিষ্ট জ্ঞানের জন্য অপেক্ষিত যে জ্ঞানত্বরূপ বিশেষণের জ্ঞান তাতে জ্ঞান ও জ্ঞানত্ব পরস্পর অসম্বন্ধ হয়ে বিষয় হয় । অর্থাৎ এটি এক ধরণের নির্বিকল্পক জ্ঞান । সুতরাং প্রথমে ব্যবসায় জ্ঞান হলে তবে জ্ঞান ও জ্ঞানত্বের নির্বিকল্পক জ্ঞান হয়[২৩] এবং তদনন্তর জ্ঞানত্ব বিশিষ্ট জ্ঞানের জ্ঞান হয়। এরূপ জ্ঞানের পরে জ্ঞানত্ব বিশিষ্ট জ্ঞান প্রকারক অহং এর জ্ঞান অর্থাৎ অনুব্যবসায় হতে পারে।[২৪] স্বাভাবিকভাবেই যে জ্ঞানের অনুব্যবসায় হয় সেই জ্ঞানটি এক প্রকারের সবিকল্পক জ্ঞান । অর্থাৎ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের অনুব্যবসায় হয় না ।

তবে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকে অনুব্যবসায়গম্য না বললেও নৈয়ায়িকগণ অনুমানের দ্বারা তার গ্রহণ স্বীকার করেন । নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ, ন্যায় মতে, অতীন্দ্রিয় ।[২৫] তাই তাঁরা সবিকল্পক প্রত্যক্ষের দ্বারা নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষকে অনুমেয় বলেন । নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ স্বীকারে যে অনুমানটি তাঁরা প্রদান করেন তার আকারটি হল 'গৌরিতিবিশিষ্টজ্ঞানং বিশেষণজ্ঞানজন্যং বিশিষ্টজ্ঞানত্বাৎ দণ্ডীতি জ্ঞানবৎ' ।[২৬] অর্থাৎ গৌ ইত্যাদি বিশিষ্ট জ্ঞান বিশেষণ জ্ঞান থেকে উৎপন্ন যেহেতু তাতে বিশিষ্টজ্ঞানত্ব-রূপ ধর্ম আছে, যেমন– দণ্ডী । দণ্ড বিশেষণের জ্ঞান পূর্বে থাকলে তবেই কোন ব্যক্তিকে দণ্ডী বলে জানা যায়, তেমনি বিশেষণ গোত্বের জ্ঞান পূর্বে থাকলে গোত্ববিশিষ্ট গোব্যক্তির জ্ঞান হতে পারে । গোব্যক্তির জ্ঞানের জন্য অপেক্ষিত যে গোত্বের জ্ঞান তা একধরণের নির্বিকল্পক জ্ঞান । অন্যথায় গোত্বের জ্ঞানটিকেও সবিকল্পক বললে অনবস্থা দোষ অনিবার্য হয় । কেননা গোত্বের জ্ঞানটিও সবিকল্পক হলে পূর্বোক্ত নিয়মে সেই গোত্বের সবিকল্পক জ্ঞানটিও বিকল্প বা বিশেষণ 'গোত্বত্ব'- এর জ্ঞানকে অপেক্ষা করবে । পুনরায় এই 'গোত্বত্ব'- এর জ্ঞানটি সবিকল্পক হবে এবং সেই সবিকল্পক জ্ঞানের জন্য বিশেষণের জ্ঞান অপেক্ষিত হবে । এই অনবস্থা দোষ বারণের জন্য স্বীকার করা হয় 'এইটি গো'– এই সবিকল্পক জ্ঞানের জন্য অপেক্ষিত 'গোত্ব'- এর জ্ঞানটি নির্বিকল্পক জ্ঞান । 'গোত্ব'– রূপ নির্বিকল্পক জ্ঞান পূর্বে হলে তবেই 'এইটি গো'– এরূপ সবিকল্পক জ্ঞান হতে পারে । তাই 'এইটি গো'– এই আকারের বিশিষ্ট জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হলেই তজ্জনকরূপে গোত্ব বিশেষণের জ্ঞানটি অনুমিত হয়ে থাকে ।

নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের অনুব্যবসায় স্বীকারের আবশ্যকতাও নেই । যেহেতু নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হল নাম, জাত্যাদি বিশেষণ বর্জিত জ্ঞান ।[২৭] বিশেষণের অনবগাহনবশতঃ এই ধরণের জ্ঞান কোন ব্যবহারেরই হেতু হয় না । কাজেই

নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের ব্যবহার সাধক জ্ঞান বা অনুব্যবসায়ের প্রয়োজনই নেই । নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের যে অনুব্যবসায়াত্মক প্রত্যক্ষ হতে পারে না তার সমর্থনে বিশ্বনাথও বলেছেন – 'জাত্যখণ্ডোপাধ্যতিরিক্ত-পদার্থ-জ্ঞানস্য কিঞ্চিদ্ধর্ম-প্রকারকত্ব-নিয়মাত্' ।[২৮] অর্থাৎ জাতি ও অখণ্ডোপাধি ভিন্ন যেকোন পদার্থের জ্ঞানের জন্য কোন কিছু ধর্ম অবশ্যই প্রকার হতে হবে । যেমন ঘটের জ্ঞানের ক্ষেত্রই ধরা যাক্ । ঘট জাতি ও অখণ্ডোপাধি ব্যতিরিক্ত হওয়ায় ঘটের জ্ঞানোৎপত্তির ক্ষেত্রে আত্মাতে জ্ঞানের বিশেষণরূপে ঘটের জ্ঞান হলে সেই ঘটের প্রকাররূপে ঘটত্ব অবশ্যই ভাসিত হবে । এই ঘটত্বকে প্রকার না করে আত্মাতে ঘটাদি বিশিষ্ট জ্ঞানের বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান হতে পারে না । নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ নিষ্প্রকারক জ্ঞান । নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষে কোন প্রকার বা বিশেষণ বিষয় হয় না । কাজেই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের বিশিষ্টের বৈশিষ্ট্যবুদ্ধি বা অনুব্যবসায়রূপ মানস প্রত্যক্ষ হতে পারে না । সুতরাং যে জ্ঞানের অনুব্যবসায় সম্ভব তা আবশ্যিকভাবে সবিকল্পক । কিন্তু সবিকল্পক জ্ঞান মাত্রেরই কী অনুব্যবসায় উৎপন্ন হয়?

ধরা যাক্ অনুব্যবসায়ের কারণ সামগ্রী উপস্থিত থাকলেও কোন ব্যক্তির বা জ্ঞান কর্তার সবিকল্পক জ্ঞানের উৎপত্তির পরে চেতনা যদি লুপ্ত হল অথবা যদি সেই ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে তবে কী তার অনুব্যবসায়ের উৎপত্তি সম্ভব হবে ? তাছাড়া যদি ব্যবসায় উৎপত্তির পরে কোন বিষয়ান্তরের গ্রহণে মন সন্নিকৃষ্ট হয়ে যায় তবে সেক্ষেত্রে তার অনুব্যবসায় উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয় । আবার ক্ষেত্র বিশেষে জ্ঞান সবিকল্পক হওয়া সত্ত্বেও তাকে নৈয়ায়িকগণ অনুব্যবসায়গম্য বলেন না । তাঁদের মতে, কোনও কোনও জ্ঞান স্বপ্রকাশযোগ্য, যেমন- ঈশ্বরীয় জ্ঞান । ন্যায় দর্শনে যাগাদি ক্রিয়াজন্য অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতারূপে সর্বজীব বিলক্ষণ, সর্বানুভাবী তথা সর্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বীকৃত ।[২৯] সর্বজ্ঞের তথা ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রকাশে জ্ঞানান্তর স্বীকার করলে কিংবা ঈশ্বরীয় জ্ঞানকে ঈশ্বরীয়

জ্ঞানের বিষয় করলে ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বের হানি অনিবার্য হয় । তাই নৈয়ায়িকরা ঈশ্বরীয় জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলে থাকেন । ন্যায় মতে যেহেতু ঈশ্বরীয় জ্ঞান স্বপ্রকাশ সেহেতু ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রকাশে জ্ঞানান্তরের স্বীকার অনাবশ্যক । সুতরাং আপত্তি হতে পারে যে নৈয়ায়িকগণ সমস্ত জ্ঞানই পরতঃপ্রকাশ এ পক্ষ স্বীকার করেননি ।

বস্তুতঃ নৈয়ায়িকের বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত আপত্তি যথাযথ নয় । কারণ জ্ঞানের প্রকাশ বিষয়ে ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রসঙ্গই অযৌক্তিক । আমরা সর্বপ্রথমেই জন্য বা উৎপন্ন জ্ঞান প্রসঙ্গেই প্রকাশের প্রশ্ন উত্থাপন করেছি । কাজেই ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞান প্রসঙ্গে এই প্রশ্ন ওঠে না । উপরন্তু ঈশ্বরীয় জ্ঞান বা তার প্রকাশ যে ন্যায় শাস্ত্রের অভিপ্রেত নয় তা ন্যায় সূত্রকার মহর্ষি গৌতমের অভিপ্রায় থেকেই ব্যক্ত হয় । মহর্ষি গ্রন্থালোচনার শুরুতেই তত্ত্বজ্ঞান লাভেচ্ছু ব্যক্তিকে অধিকারী হিসাবে উল্লেখের মাধ্যমে জীবাত্মার জ্ঞানই যে তাঁর আলোচ্য বা জন্য প্রত্যক্ষই যে তাঁর লক্ষ্য- তা নির্দেশ করেছেন । কেননা তত্ত্বজ্ঞান লাভের ইচ্ছা বা প্রয়োজনীয়তা কোনটিই পরমাত্মার বা ঈশ্বরের নেই । এই তত্ত্বজ্ঞানের সহায়করূপেই তিনি প্রমাণ চতুষ্টয়ের উল্লেখ করেছেন । এর মাধ্যমেও জীবাত্মার জ্ঞানই যে তাঁর অভিপ্রেত তা ব্যক্ত হয়েছে । কেননা ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মকই । যদিও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রমুখ নৈয়ায়িকগণ প্রত্যক্ষের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, যে জ্ঞানের করণ জ্ঞান নয় তাই প্রত্যক্ষ ।[৩০] প্রত্যক্ষের উক্ত লক্ষণের লক্ষ্য যে জীব ও ঈশ্বর প্রত্যক্ষ উভয়ই তা নির্দেশ করেন । তথাপি বলা যায় না যে, ঈশ্বরের জ্ঞান পর্যালোচনা তাঁদের লক্ষ্য । আসলে জীব ও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যাবৎ প্রত্যক্ষের অসাধারণ ধর্ম নির্দেশই তাঁদের অভিপ্রেত । কেননা জ্ঞান জন্য বন্ধন থেকে মুক্তি, নিত্যমুক্ত ঈশ্বরের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক । ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ যে মহর্ষি গৌতমের অভিপ্রেত নয় সেকথা বিশ্বনাথ নিজেও স্বীকার করেছেন ।[৩১] জ্ঞান মাত্রই আবশ্যিকভাবে জ্ঞানান্তর বেদ্য বা অন্য জ্ঞান

প্রকাশ্য- এই তত্ত্ব যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে সমস্ত জ্ঞানই জ্ঞানান্তবেদ্য হওয়ায় অনবস্থা দোষের উদ্ভব হয় । কারণ ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের ন্যায় অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানকেও জ্ঞানান্তরবেদ্য বলা হলে সেই জ্ঞানান্তরও একই যুক্তিতে জ্ঞানান্তরবেদ্য হওয়ায় পুনরায় প্রকাশের অপেক্ষা রাখবে । এইরূপে পরতঃপ্রকাশবাদের স্বীকারে অনবস্থা দোষের উদ্ভব ঘটবে । বস্তুতঃ পূর্বপক্ষীদের কেউ কেউ নৈয়ায়িক মতের বিরুদ্ধে এরূপ আপত্তি উত্থাপনও করেছেন ।

অনবস্থার দোষের আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে তত্ত্বচিন্তামণিকার বলেছেন যে, জ্ঞান জ্ঞানান্তরবেদ্য হলেও অনবস্থা দোষ হয় না কেননা জ্ঞান জ্ঞানান্তরবেদ্য হলেও অবশ্যবেদ্য নয়– 'বিত্তেরবশ্যবেদ্যত্বাভাবেনানবস্থাবিগমাৎ' ।[৩২] কাজেই তাঁর মতে, জ্ঞান অবশ্যবেদ্য না হওয়ায় পরতঃপ্রকাশবাদ সমর্থনে অনবস্থা দোষ হয় না ।

জ্ঞান বিষয়ক অনুব্যবসায় যে অবশ্যবেদ্য নয় সে বিষয়ে আমাদের ব্যবহারও প্রমাণ । একজন লোক কোন বিষয়ক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে কাজ করে । যেমন- কোন ব্যক্তি ঘট, পটাদির দ্বারা কোন কার্যের জন্য ঘট-পটাদি বিষয়ক জ্ঞানের উপরই নির্ভর করে । কিন্তু সেই কাজের জন্য সেই ব্যক্তির ঐ বিষয় বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োজন হয় না । অর্থাৎ বস্তু ব্যবহারের জন্য তার সেই বস্তু বিষয়ক জ্ঞান অপেক্ষিত হলেও সেই জ্ঞানের জ্ঞান অপেক্ষিত হয় না । আবার ক্ষেত্র বিশেষে সেই জ্ঞান বিষয়ে সংশয় দেখা দিলে জ্ঞানের জ্ঞানও আবশ্যক । পূর্বেই বলা হয়েছে জ্ঞানকে জানার অবকাশ থাকে সেই জ্ঞান বিষয়ে সংশয় দেখা দিলে । কিন্তু এই সংশয় সর্বত্র দেখা যায় না । ধরা যাক্ 'ক' বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে । 'ক' বিষয়ক জ্ঞানটি সত্যই উৎপন্ন হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে সংশয় হতে পারে । তখন সেই 'ক' বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান

প্রয়োজন হয় । কিন্তু ‘ক’ বিষয়ক জ্ঞানের বিষয়ে অনুরূপ সংশয় যদি না থাকে তাহলে তার জ্ঞানের প্রশ্ন ওঠে না । সুতরাং জ্ঞান মাত্রই অবশ্যবেদ্য নয় । ফলে অনবস্থা দোষের অবকাশও নেই ।

জ্ঞাতার জ্ঞান বিষয়ে সংশয়ের কথা স্বীকার করলে মনে হতে পারে জ্ঞাতার নিজস্ব ব্যক্তিগত জ্ঞান বিষয়ে সেই জ্ঞাতারই সংশয় কীরূপে হতে পারে ?[৩৩] এরূপ সংশয় যে হতে পারে তা আমরা ব্যবহারেই লক্ষ্য করে থাকি । অনেক সময়েই আমাদের কোন বিষয়ে জ্ঞান হওয়ার পরেও আমরা অবহিত থাকি না সেই বিষয়ে আমার জ্ঞান আছে । সেই কারণে যখন কাউকে কোন বিষয়ের উপরে কোন কিছু বলতে বলা হয় বা কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় তখন এরূপ বলতে দেখা যায়– ‘আমি বিষয়টা জানি কিনা তা জানি না তবে চেষ্টা করতে পারি’ । হয়ত দেখা যায় উত্তরে যা বললেন পুরোটাই সঠিক । কিংবা অনেক সময়েই এমন হয় ‘তুমি কি এটি জান’ বা ‘তোমার কি এই বিষয়ে জ্ঞান আছে’– এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে আমরা সরাসরি হ্যাঁ বলতে পারি না । এরূপ অবস্থার সম্মুখীন আমরা অনেক সময়ে হয়ে থাকি । এইসব ক্ষেত্র থেকেই বোঝা যায় আমার কোন বিষয়ে জ্ঞান থাকলেও আমি সেই জ্ঞান বিষয়ে আমার জ্ঞান আছে কিনা সর্বাদা নিশ্চিত নই, সেখানে সংশয়ের অবকাশ থেকে যায় । অর্থাৎ আমাদের কোন বিষয়ে জ্ঞান থাকলেই সর্বদা সেই জ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান বা অনুব্যবসায় আমাদের থাকে না ।

পূর্বে আমরা দেখেছি যে সবিকল্পক বা বিশিষ্ট জ্ঞান ভিন্ন জ্ঞানের অনুব্যবসায় সম্ভব । কিন্তু ভ্রমাদিও বিশিষ্ট জ্ঞান । এখন বিশিষ্ট জ্ঞান হওয়ায়, প্রত্যক্ষাদি প্রমা কিংবা ভ্রমাদি অপ্রমা যাই হোক, উৎপত্তির পর অনুব্যবসায়ের দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে ।

আচার্য উদয়নের মতে, মন যেরূপ প্রমারূপ ব্যবসায়ের অনুব্যবসায়ের জনক হয়, সেইরূপ অপ্রমারূপ ব্যবসায়ও অনুব্যবসায়ের জনক হইয়া থাকে ।[৩৪] কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হবে ভ্রমাত্মক জ্ঞানের প্রকাশক যে অনুব্যবসায় তা কি ভ্রমাত্মক হতে পারে, নাকি ভ্রমাত্মক ও প্রমাত্মক উভয় প্রকার জ্ঞানের অনুব্যবসায় প্রমাত্মকই হবে ? তাছাড়া ন্যায় মতে স্বীকৃত ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও অভ্রমাত্মক । স্বর্বজ্ঞ হওয়ায় এই জগতে আমাদের যে সকল প্রমাত্মক জ্ঞান হয় সেগুলি যেমন ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয় হতে পারে তেমনি আমাদের ভ্রম জ্ঞানও ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয় হতে পারে । এখন ভ্রমাত্মক জ্ঞানের অনুব্যবসায়কে যদি ভ্রমাত্মক বলা হয় অর্থাৎ ভ্রমাত্মক জ্ঞানের জ্ঞানকে যদি ভ্রমাত্মক বলা হয় তাহলে আমাদের ভ্রমাত্মক জ্ঞান বিষয়ে ঈশ্বরের যে জ্ঞান সেই জ্ঞানও ভ্রম হবে একথা মেনে নিতে হবে ।

সর্বাগ্রে দেখা যাক্ একটা জ্ঞান কখন ভ্রম হয় । ন্যায় মতে, তদভাববতি তৎপ্রকারক জ্ঞানই ভ্রম । অর্থাৎ যেখানে যে ধর্মের অভাব থাকে সেটিকে সেই ধর্ম বিশিষ্টরূপে জ্ঞানই ভ্রম । সহজ কথায় ব্যধিকরণ ধর্ম প্রকারক জ্ঞানই ভ্রম । ধরা যাক্ শুক্তিতে রজত ভ্রম হল । অর্থাৎ একটি শুক্তি খণ্ডকে ‘এটি রজত’ এই আকারের জ্ঞান হল । এখানে প্রকারাংশে ভাসমান হচ্ছে রজতত্ব ধর্ম । রজতত্ব ধর্ম কোন জ্ঞানে ভাসমান হলেও বস্তুতঃ রজতত্ব ধর্ম বিশিষ্ট যা নয় তা যদি ঐ জ্ঞানের বিশেষ্য অংশে ভাসমান হয় তবে ঐ জ্ঞানটি মিথ্যা । ঐ জ্ঞানটি ব্যধিকরণ ধর্ম প্রকারক জ্ঞান হওয়ায় ভ্রম । এই জ্ঞানের যদি অনুব্যবসায় উৎপন্ন হয় তাও কী ভ্রম বলে গণ্য হবে ? এখন ধরা যাক্ ঐ জ্ঞানটির অনুব্যবসায়ের আকার হবে ‘আমি জানি যে, আমি রজতকে জানি’। এই জ্ঞানে ‘আমি’ পদবাচ্য আত্মা বিশেষ্য । তাতে প্রকার হচ্ছে জ্ঞান । জ্ঞানে প্রকার হচ্ছে রজত । রজতের প্রকারাংশে রজতত্ব ভাসমান । এখন প্রশ্ন হল এই

জ্ঞানটিও কী ব্যধিকরণ প্রকারক জ্ঞান ? পূর্ববর্তী ব্যবসায়ে শুক্তিরূপ বিশেষ্যাংশে রজত প্রকাররূপে ভাসমান এবং ‘এটি রজত’ বলে জ্ঞান হয়েছে । অর্থাৎ রজতত্ব ধর্ম জ্ঞানটির প্রকার অংশে ভাসমান হয়েছে । অনুব্যবসায় তখনই ব্যধিকরণ হতে পারবে যদি ব্যবসায়ে যা প্রকাররূপে ভাসমান হয়েছে তা অনুব্যবসায়ে প্রকাররূপে ভাসমান না হয় । যেমন যদি ‘আমি জানি যে আমি রজতকে জানি’ না হয়ে ‘আমি জানি যে আমি ঘটকে জানি’ এই আকারের অনুব্যবসায় হত তাহলে ব্যবসায়ে যা প্রকার রূপে ভাসমান হয়েছে তাকে সেরূপে গ্রহণ না করে অন্য প্রকার ভাসমান হওয়ায় পূর্ববর্তী জ্ঞানটিকে অপেক্ষা করে তা ব্যধিকরণ প্রকারক জ্ঞান বলে পরিগণিত হোত । কিন্তু রজত জ্ঞানের পর ‘আমি জানি যে রজতকে জানি’ এইরূপে যে অনুব্যবসায় হয় তাকে তো ভ্রম বলা যাবে না । যেহেতু পূর্ববর্তী জ্ঞানে যা প্রকার অংশে ভাসমান হয়েছে সেই প্রকার বিশিষ্ট বস্তু বিষয়ক জ্ঞানেরই জ্ঞান হওয়ায় জ্ঞানটি ভ্রমাত্মক হতে পারে না । ‘এটি রজত’ এই আকারের জ্ঞানের বিষয় ‘এটি’ শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট বিশেষ্য । রজতত্ব প্রকারাংশে ভাসমান। বিশেষ্য ও প্রকারের সম্বন্ধও এই জ্ঞানের বিষয় । এই জ্ঞানের যা প্রকার তা কিন্তু অনুব্যবসায়েও ভাসমান হয়েছে । তবে ব্যবসায়ের যা বিষয় তা কিন্তু অনুব্যবসায়ের বিশেষ্য বা সম্বন্ধাংশে ভাসমান হয়নি । কিন্তু ব্যবসায়ের যা প্রকার তা অনুব্যবয়ায়ের ঠিক প্রকারাংশে ভাসমান না হলেও এক অর্থে প্রকার রূপেই ভাসমান হয়েছে । ব্যবসায়ে যা প্রকাররূপে ভাসমান অনুব্যবসায়ের তা প্রকারের প্রকাররূপে ভাসমান । অর্থাৎ ব্যবসায়ের যা প্রকার তা অনুব্যবসায়ের প্রকারতাবচ্ছেদক অংশে ভাসমান । কোন জ্ঞান তার বিষয়ের নিরিখে সেই জ্ঞান বলে নিরূপিত হয় । সুতরাং অনুব্যবসায়ও তার বিষয় ব্যবসায়ের নিরিখেই সেই জ্ঞান । ব্যবসায়ের বিষয়টি নির্দিষ্ট প্রকার বিশিষ্ট হলেই সেই বিষয়রূপে গণ্য হয় । সুতরাং অনুব্যবসায়টিও সেই অনুব্যবসায় রূপে

নির্ধারিত হয় সেই প্রকারের মহিমায় । ‘এটি রজত’ এই আকারের ব্যবসায়ের অনুব্যবসায়ের আকার হবে ‘আমি জানি যে এটি রজত’ । সুতরাং অনুব্যবসায়ের প্রকার হচ্ছে আগের ব্যবসায় । তার দ্বারা সেই অনুব্যবসায়টি সেই অনুব্যবসায় বলে নির্ধারিত হয় । এই অর্থে ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের যা প্রকার তা অনুব্যবসায়ের প্রকারতাবচ্ছেদক ধর্ম ।

পূর্ববর্তী জ্ঞানের বিষয়টি যদি ভ্রমাত্মক হয় তাহলে সেই বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান বা অনুব্যবসায়ও ভ্রমাত্মক বিষয়কে অবলম্বন করে ভ্রমাত্মক যে হয় না, তা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় । এক ব্যক্তি, যার ভ্রম জ্ঞান হচ্ছে আর অন্য এক ব্যক্তি, যে জ্ঞানটি ভ্রম সে বিষয়ে জ্ঞানবান্– তাদের উভয়ের ব্যবহার কিন্তু অভিন্ন হয় না । যে ব্যক্তির দড়িকে সর্পরূপে জ্ঞান হচ্ছে সে হয়ত প্রাণের ভয়ে দূর দেশে গমন করতে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে । অন্যদিকে যে ব্যক্তি এই বিষয়ে জ্ঞানবান যে, ‘এটি দড়িতে সর্পভ্রম’ সেই ব্যক্তির ভয়ের যেমন কোন কারণ থাকে না তেমনি পলায়নের চেষ্টাও থাকে না । কেবল ভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রেই নয় একই ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ভ্রম জ্ঞান হওয়া ও জ্ঞানটি ভ্রম ছিল জানার পর ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারই দৃষ্ট হয় । ভ্রম বিষয়ক জ্ঞানের অনুব্যবসায়কে ভ্রমাত্মক বলা হলে যে ব্যক্তির ভ্রম হচ্ছে ও যে ব্যক্তির ভ্রম বিষয়ে জ্ঞান আছে সেই উভয় ব্যক্তিরই কর্মকে অভিন্ন বলতে হবে । কিন্তু তা হয় না । কাজেই ভ্রমকে অবলম্বন করে উৎপন্ন জ্ঞানও ভ্রমাত্মকই হবে– এমনটি নয় ।[৩৫] আসলে ভ্রমাত্মক জ্ঞান বিষয়ে অনুব্যবসায় ভ্রমাত্মক হয় এরূপ আপত্তির অবকাশ থাকছে যেহেতু একথা স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যে, যারই কোন বিষয়ক জ্ঞানের জ্ঞান থাকবে সে সেই পূর্ববর্তী জ্ঞানের বিষয়টিকেও জানবে । কিন্তু এই দুই প্রকার জ্ঞান অভিন্ন নয় । প্রথম প্রকার জ্ঞান জন্য ব্যবহার এবং দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞান জন্য ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন এর

দ্বারাই একথাই প্রমাণিত হয় যে দুই প্রকার জ্ঞান ভিন্ন । এইরূপে অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞান, ব্যবসায়টি যেরূপ তাকে সেরূপে প্রকাশ করায়, ভ্রম নয় । যদি তা স্বীকার না করা হয় অর্থাৎ ভ্রান্তিজ্ঞ ব্যক্তির জ্ঞানকে প্রমা না বলা হয় তাহলে ভ্রমের উচ্ছেদ হবে যেহেতু সেই বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণ নেই ।[৩৬] কেননা ভ্রম জ্ঞানের সিদ্ধি প্রমা জ্ঞানের দ্বারা হয় যদি একথা স্বীকার করা না হয়, অর্থাৎ একথা স্বীকার করা হয় যে ভ্রম বিষয়ক জ্ঞানটিও অপ্রমা হবে তাহলে ভ্রম জ্ঞানেরই সিদ্ধি হবে না । প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক একই সঙ্গে এই যুক্তির দ্বারা ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান ও অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের থেকে অপর একটি পার্থক্য নিশ্চয় হয়ে যায় । কেননা এই বক্তব্য অনুসারে ব্যবসায় জ্ঞান ভ্রমাত্মক বা মিথ্যা হতে পারে কিন্তু অনুব্যবসায় ভ্রমাত্মক বা মিথ্যা হয় না । ব্যবসায় ভ্রম হলেও সেই বিষয়ক অনুব্যবসায় ভ্রম নয় যদি অবশ্যই অনুব্যবসায়ে নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবসায় সারূপ্য থাকে ।

ঈশ্বরের জ্ঞানের ভ্রমত্বাপত্তির বিরুদ্ধে বলা যায় ঈশ্বরীয় জ্ঞানটি ভ্রমাত্মক হতেই পারে না । প্রথমতঃ ঈশ্বরের কোন বিষয়ে জ্ঞান জীবাত্মার জ্ঞানের ন্যায় ইন্দ্রিয় সংযোগাদি কারণ সহযোগে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনুসরণে উৎপন্ন হয় না । যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য । যে কোন বিষয়ে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ জ্ঞান । দ্বিতীয়তঃ জীবাত্মার কোন বিষয়ে ভ্রমাত্মক জ্ঞান উৎপত্তির পর সেই জ্ঞান বিষয়েও সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের জ্ঞান ভ্রমাত্মক হতে হলে জীবাত্মার জ্ঞানের পরে ঈশ্বরের জ্ঞান হতে হবে । কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞানকে, ন্যায় মতে, সাক্ষাৎকারাত্মক অর্থে প্রত্যক্ষ বলা হয়েছে ।[৩৭] অর্থাৎ জীবাত্মার জ্ঞানের ন্যায় ঈশ্বরের যে প্রত্যক্ষ তা জন্য প্রত্যক্ষ নয় । ঈশ্বরের প্রত্যক্ষকে বলা হয়েছে নিত্য প্রত্যক্ষ । কাজেই জীবাত্মার ভ্রমাত্মক জ্ঞানের বিষয়ে ঈশ্বরের যে জ্ঞান হবে তা ভ্রমাত্মক হবে সেই আপত্তিও যথাযথ হবে না । যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞান উৎপন্নই হয় না,

ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য । তৃতীয়তঃ জীবাত্মার যে জ্ঞান তা বিপরীত বিষয়ক হওয়াতে অর্থাৎ তদভাববতি তৎপ্রকারক হওয়াতেই ভ্রম । কিন্তু ভ্রান্তিজ্ঞ ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি ভ্রমকে ভ্রম বলে জানেন তাঁর সেই জ্ঞান যেমন ভ্রম হয় না তেমনি ঈশ্বরের জ্ঞানও ভ্রম হতে পারে না । ঈশ্বরের জ্ঞানে জীবাত্মার ভ্রমাত্মক জ্ঞান ভ্রম রূপেই জ্ঞাত হয় । কাজেই জীবাত্মার ভ্রম বিষয়ে ঈশ্বরের যে জ্ঞান তা প্রমাই ।

কিন্তু সমস্যা হল অনুব্যবসায় মাত্রই যদি প্রমাত্মক হয় তাহলে অনুব্যবসায়কে স্বতঃপ্রমাণ বলে স্বীকার করতে হবে । সেক্ষেত্রে নৈয়ায়িক স্বীকৃত পরতঃপ্রামাণ্যবাদের হানি হবে । অন্যথায় যদি পূর্বোক্ত যুক্তি অস্বীকার করে অনুব্যবসায়কে ভ্রমাত্মক হতে পারে বলে স্বীকার করা হয় সেক্ষেত্রে অনুব্যবসায় যে ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারক প্রমাণ বলে স্বীকার করা হয়েছে তা আর বলা যাবে না । অনুব্যবসায়ের স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে যা ব্যক্ত হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় ন্যায় মতে, অনুব্যবসায় তৎপূর্ববর্তী জ্ঞানের জ্ঞাপকই শুধু নয় তা পূর্ববর্তী জ্ঞানটির অর্থাৎ ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের স্বরূপেরও নির্ধারক । এখন অনুব্যবসায় নিজে যথার্থ না হলে তার দ্বারা নির্ণীত ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের স্বরূপ বিষয়েও সংশয় দেখা দেবে । অর্থাৎ অনুব্যবসায়কে সেক্ষেত্রে আর ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের প্রকৃতির নির্ণায়ক বলে স্বীকার করা যাবে না ।

অনুব্যবসায়ে ব্যবসায়টা যেরূপ উৎপন্ন হয়েছিল সেই রূপেই বিষয় হলে অনুব্যবসায়টি যথার্থ হয় । সুতরাং বলা যায় যে, অনুভব সারূপ্য হচ্ছে অনুব্যবসায়টির যাথার্থ্য । ফলে সেক্ষেত্রে অনুব্যবসায়কে পূর্ববর্তী ব্যবসায়ের স্বরূপ নির্ধারক হিসাবে স্বীকার করতে কোন অসুবিধা থাকে না । অনুব্যবসায়টি যথার্থ হলেও তার দ্বারা অনুব্যবসায় স্বতঃপ্রমাণ বলা যায় না । তার কারণ তাঁরা জ্ঞানের যাথার্থর সঙ্গে জ্ঞানগত

প্রামাণ্যের প্রভেদ করেন । বস্তুতঃ কোন জ্ঞান ‘তদ্বতি তৎপ্রকারক’ হলে তা যথার্থ হয় বটে কিন্তু যথার্থ হলেই যে জ্ঞান প্রমা পদবাচ্য হবে তা নয় । তাকে প্রমাণজন্য হতে হবে । নৈয়ায়িক কর্তৃক ব্যবসায়ের স্বরূপ নির্ণায়ক হিসাবে অনুব্যবসায়ের স্বীকৃতি কতটা যুক্তিসঙ্গত ?- সেই বিষয়টি আলোচনা করা আবশ্যক ।

পূর্বেই বলা হয়েছে ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ অনুব্যবসায়কেই জ্ঞানের প্রকৃতি নির্ণায়ক হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন । ‘অহং প্রত্যক্ষামি’, ‘অহং অনুমিনোমি’ প্রভৃতি আকারের অনুব্যবসায়কে পূর্ববর্তী জ্ঞানের স্বরূপ নির্ধারকরূপে গণ্য করা হয়েছে । কিন্তু অনুব্যবসায় সেই পূর্ববর্তী জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়ে একমাত্র কার্যকর বলে স্বীকার করার অসুবিধে আছে । কেননা ন্যায়-বৈশেষিক দার্শনিকগণ প্রমাণসংপ্লববাদী । বৌদ্ধ দর্শনে প্রমাণব্যবস্থা স্বীকৃত হওয়ায় তাঁরা একই বিষয়ে একাধিক প্রমাণ জন্য জ্ঞানের সম্ভাবনা যেমন মানেন না, তেমনি তাঁরা সেই একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির জ্ঞানের সম্ভাবনাও স্বীকার করেন না । তাঁদের মতে, জগতে দুই ধরণের বস্তুই বিদ্যমান- স্বলক্ষণ ও সামাণ্যলক্ষণ । এই দুই ধরণের বস্তুর গ্রাহক প্রমাণও দুই প্রকৃতির– স্বলক্ষণ বস্তুর গ্রাহক প্রত্যক্ষ প্রমাণ[৩৮] এবং সামাণ্যলক্ষণের গ্রাহক হল অনুমাণ প্রমাণ[৩৯] । স্বলক্ষণ যেমন অনুমানের বিষয় হয় না তেমনি সামাণ্যলক্ষণও প্রত্যক্ষ প্রমাণ গ্রাহ্য হতে পারে না। কিন্তু প্রমাণসংপ্লববাদী, ন্যায়-বৈশেষিকাচার্যগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেন । একই বিষয়ে, ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণ জন্য, একাধিক জ্ঞানের সম্ভাবনাকে তাঁরা স্বীকার করেন। অর্থাৎ সময়ের ব্যবধানে একই ব্যক্তির কিংবা একই ক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির, কোন একই বিষয়ের গ্রাহক জ্ঞানের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে । এমতাবস্থায় এই প্রশ্ন থেকে যায় যে, কোনও অভিন্ন বিষয়ক জ্ঞানের ক্ষেত্রে দুই প্রকার অনুব্যবসায়কে একই সঙ্গে কীরূপে উক্ত জ্ঞানের প্রকৃতি নির্ণায়ক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে ? এমন যদি

হয় যে কোনও ব্যক্তির যে সময়ে যে বিষয়ে 'অহং অনুমিনোমি'– এই আকারের অনুব্যবসায় হচ্ছে, অন্য ব্যক্তির সেই ক্ষণেই সেই বিষয়ে ' অহং শব্দয়ামি' এই আকারে অনুব্যবসায় হচ্ছে । সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে উক্ত দ্বিবিধ অনুব্যবসায়কেই কী যুগ্মভাবে পূর্ববর্তী জ্ঞানের প্রকৃতি নির্ণায়ক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে ? আলোচ্য স্থলে আমরা আচার্য জগদীশের মত উল্লেখ করতে পারি । আচার্য জগদীশ কিন্তু উৎপন্ন জ্ঞানের কারণ সমূহের নিরিখে জ্ঞানটির স্বরূপ নির্ণয় করতে সচেষ্ট হয়েছেন । সেক্ষেত্রে অবশ্যই অনুব্যবসায়ের মধ্যে আবদ্ধ থেকে উৎপন্ন জ্ঞানটির স্বরূপ নির্ণয় সম্ভব হচ্ছে না।

আচার্য জগদীশ, তাঁর শব্দশক্তি-প্রকাশিকা গ্রন্থে বলেছেন বৈশেষিকাচার্যগণ প্রমাণের দ্বিত্ব স্বীকার করেন । বৈশেষিক মতে, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটিই হল প্রমাণ । উক্ত মতে ন্যায়দর্শনাদিতে শব্দ, যা অতিরিক্ত প্রমাণরূপে পরিচিত তা অনুমান অতিরিক্ত নয় । 'গৌরস্তি' প্রভৃতি বাক্য শ্রবণ জন্য যে জ্ঞান আমাদের হয়, তা তাঁদের মতে, অনুমিতিই । বাক্য শ্রবণজন্য জ্ঞান যে অনুমিত্যাত্মক তাঁদের মতে, তা অনুব্যবসায়গম্য । কিন্তু শব্দশক্তি প্রকাশিকা গ্রন্থে আচার্য জগদীশ, বাক্য শ্রবণ জন্য উৎপন্ন জ্ঞানকে শাব্দবোধ বলেছেন । তিনিও উক্ত জ্ঞানে শাব্দত্ব ধর্মের পক্ষে 'অহং শব্দয়ামি'– এই আকারের অনুব্যবসায় উপস্থাপনা করেছেন ।[৪০] নৈয়ায়িকের প্রদর্শিত অনুব্যবসায়কে অস্বীকার করলে বৈশেষিক মতের পক্ষে উপস্থাপিত অনুব্যবসায় স্বীকারের প্রসঙ্গ ওঠে না । কারণ উক্ত জ্ঞানের অনুমিতিত্ব স্থাপনার্থে তাঁদেরও 'অহং অনুমিনোমি' এই আকারের অনুব্যবসায়কেই প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপিত করতে হবে । প্রশ্ন হচ্ছে একই বাক্য শ্রবণ পূর্বক উৎপন্ন জ্ঞান কীরূপে অনুমিতি ও শাব্দবোধরূপে গণ্য হতে পারে ? কোন পক্ষই অপর পক্ষের স্বীকৃত অনুব্যবসায়কে অস্বীকার করতে

পারবেন না । কারও পক্ষেই একথা বলা সম্ভব নয় যে অপরের নির্দিষ্ট আকারের অনুব্যবসায় হয় না । কারণ সেই পক্ষে সেই আকারের অনুব্যবসায়ই অনুভূত হয় । সুতরাং জগদীশের উক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে যে সমস্যাগুলি এস্থলে দেখা যায় সেগুলি হল, বৈশেষিক মত অস্বীকার করলে হয় তাঁকে অনুব্যবসায়ের ন্যায় ব্যক্তির একান্ত নিজস্ব অনুভূতিকে অস্বীকার করতে হবে অথবা বলতে হবে, অনুমিনোমি ও শব্দয়ামি এই দুই ধরণের অনুব্যবসায়ই সম্ভব হয় । এখন প্রশ্ন হল, জগদীশ কী তাহলে ব্যাথা-বেদনা, সুখ-দুঃখাদির ন্যায় অনুব্যবসায় যা একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির বিষয় তা অস্বীকার করছেন ? বস্তুত তা করা যায় না । যে অনুব্যবসায় ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতি, তা সরাসরি অন্য ব্যক্তি অস্বীকার বা সংশয় করতে পারেন না । উভয় পক্ষেরই বিরুদ্ধ পক্ষ থাকায় খুব সতর্কভাবে ঐ অনুব্যবসায়কে নিজ পক্ষ প্রতিষ্ঠার পক্ষে হেতুরূপে গ্রহণ করা যায় কিনা বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে । কারণ বিরুদ্ধ পক্ষেরও যথেষ্ট যুক্তি আছে। তাই কোন একটা বিশেষ মতের পক্ষে যে অনুব্যবসায় হয় বলে বলা হচ্ছে তাকে আক্ষরিক অর্থে প্রথমাবস্থাতেই গ্রহণ করা যাবে না ।

পূর্বোক্ত পরিস্থিতিতে ‘অহং অনুমিনোমি’ এই আকারের অনুব্যবসায় হতে পারে না এরূপ বলার ক্ষেত্রে জগদীশের পক্ষে একটি সমাধান হতে পারে যে, শব্দ জন্য জ্ঞান স্থলে ‘অহং অনুমিনোমি’ এই আকারের যে অনুব্যবসায় উৎপন্ন হয়েছে, সেই অনুব্যবসায়টি ভ্রম হতে পারে । কেননা ব্যবসায় জ্ঞান প্রকাশক অনুব্যবসায়ে কেবল ব্যবসায় জ্ঞানটিই বিষয় হয় না, ব্যবসায় জ্ঞানের প্রকৃতিও অনুব্যবসায়ে প্রকাশিত হয় তা বলা হয়েছে । সেক্ষেত্রে অনুব্যবসায় ভ্রমাত্মক হওয়ার অর্থ হতে পারে, জ্ঞানটি প্রকৃতই যে প্রকৃতির সেইরূপে তা অনুব্যবসায়ে ভাসমান হচ্ছে না । যেমন, ধরা যাক্ জ্ঞানটি প্রকৃতই প্রত্যক্ষাত্মক । কিন্তু তার অনুব্যবসায় হল ‘অহং শব্দয়ামি’– এই

আকারের । ব্যবসায় জ্ঞানটির উৎপত্তি বিষয়ে অর্থাৎ জ্ঞান হয়েছে– এ বিষয়ে সংশয় না থাকলেও তার প্রকৃত রূপটি অনুব্যবসায়ে অন্যরূপে প্রতিপাদিত হতে পারে । কিন্তু অনুব্যবসায়ে জ্ঞানটি যদি প্রকৃত স্বরূপে প্রকাশিত না হয়, তাহলে সমস্যা হবে জগদীশ উক্ত স্থলে 'অহং শব্দয়ামি'– এই আকারের অনুব্যবসায়ই হয়েছে এটাই বা কীভাবে জোর করে প্রমাণ করবেন ? বৈশেষিক স্বীকৃত অনুব্যবসায়ের ন্যায় তাঁর স্বীকৃত অনুব্যবসায়ও ভ্রমাত্মক- এই আপত্তিও উঠতে পারে । শুধু তাই নয়, অনুব্যবসায়ের প্রকৃতি সম্পর্কে জগদীশ নিজেই যখন সন্দিহান, তখন তিনিই অনুব্যবসায়কে কীভাবে জ্ঞানের প্রকৃতি নির্ণায়ক হিসাবে উপস্থাপনা করতে পারেন ?– সেই প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দেয় ।

আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য জগদীশ তর্কালঙ্কারের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে পারি । বাক্য শ্রবণ হেতু উৎপন্ন জ্ঞানের বিষয়ে নৈয়ায়িক 'অহং শব্দয়ামি'এই আকারের অনুব্যবসায়ের সাহায্য নেন অপরপক্ষে বৈশেষিক নিজ পক্ষ স্থাপনার্থে 'অহং অনুমিনোমি'এই আকারের অনুব্যবসায়ের উপস্থাপনা করেন । এ স্থলে জ্ঞানটির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ার্থে জগদীশ জ্ঞানের উৎপাদক কারণকূটের সাহায্য নিয়েছেন । পূর্বপক্ষী 'অহং অনুমিনোমি' এই আকারের অনুব্যবসায়ের দাবী করলেও সেই জাতীয় দাবীর সত্যতা যাচাইয়ের উপায় হল উক্ত ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের কারণ সামগ্রীর অনুসন্ধান করা । সেক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে, পূর্বের ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানটি ব্যাপ্তিজ্ঞানাদি অনুমিতির কারণ সামগ্রীর দ্বারা উৎপন্ন হয়নি তাহলে ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানটি অনুমিতি হতে পারে না । আর ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানটি প্রকৃতই অনুমিত্যাত্মক না হওয়ায় 'অহং অনুমিনোমি' এই আকারের অনুব্যবসায় পূর্বজ্ঞানের অনুমিতিত্ব পক্ষে যুক্তিরূপে গণ্য হতে পারে না ।

আচার্য জগদীশ দেখিয়েছেন যে বিশেষ কারণ জন্য কোনও জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই কারণ দ্বারাই তার স্বরূপ নির্ধারিত হয় । বস্তুতঃ নৈয়ায়িকদের পক্ষে এ ছাড়া গত্যন্তর নেই । একই বিষয় একাধিক প্রমাণের সাহায্যে জ্ঞাত হতে পারে । সুতরাং বিষয় জ্ঞানের প্রকার ভেদের হেতু হতে পারে না । আবার একই বিষয় একাধিক ব্যক্তি জানতে পারে তাই জ্ঞাতার সাহায্যেও জ্ঞানের প্রকারভেদ সম্ভব নয় । সে কারণে জগদীশ বৈশেষিক স্বীকৃত বাক্য শ্রবণ জন্য উৎপন্ন জ্ঞানের প্রতি প্রকৃত কারণের অনুসন্ধান করেছেন । তবে তার দ্বারা অনুব্যবসায় স্বরূপ নির্ধারক হতে পারে না এরূপ বলা যায় না । প্রাথমিক পর্যায়ে জ্ঞানটি কোন প্রকৃতির তা অনুব্যবসায়ের দ্বারাই জ্ঞাত হতে পারে । অনুব্যবসায় সন্দিগ্ধ হবেই এমন কোনও নিয়ম নেই । আবার যেক্ষেত্রে অনুব্যবসায় সন্দিগ্ধ হওয়ার অবকাশ নেই, সেক্ষেত্রেও নিঃসন্দিগ্ধ হওয়ার অর্থ প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়ে যাওয়া নয় । পূর্বেই বলা হয়েছে যদি অনুব্যবসায়ে ব্যবসায়ের স্বারূপ্য থাকে তাহলে অনুব্যবসায় যথার্থ হতে পারে । যথার্থ হলেও তা জ্ঞানটির প্রমাত্ব নিশ্চয় করতে পারে না । যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন একটি পক্ষের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যাবতীয় আপত্তি খণ্ডিত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেই জ্ঞানটির প্রমাত্ব নিশ্চয় করা যায় না । সুতরাং অনুব্যবসায় যথার্থ হওয়ায় অনুব্যবসায়ের প্রামাণ্য স্বতঃই প্রকাশিত হয় একথা বলা যায় না । বস্তুতঃপক্ষে এখানে জ্ঞানের যাথার্থ্যতার সঙ্গে জ্ঞানগত প্রামাণ্যের প্রভেদ করা হয়েছে । জ্ঞান যথার্থ হয়েও যে প্রমা হয় না অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান মাত্রই যে প্রমা নয় সেই কথা আচার্য উদয়ন প্রমুখ নৈয়ায়িকগণও স্বীকার করেছেন । তাই ‘ন্যায়কুসুমাঞ্জলি’ প্রভৃতি গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায় স্মৃতিকে যথার্থ বলে স্বীকার করেও প্রমা বলতে অস্বীকার করেছেন তিনি । তাঁদের মতে, যথার্থ অনুভবই প্রমা । স্মৃতি যথার্থ হলেও অনুভব না হওয়ায় প্রমা নয় । একই যুক্তিতে বলা যায় ভ্রম জ্ঞান বিষয়ক যে অনুব্যবসায় সেই

অনুব্যবসায়ে ব্যবসায়ের সারূপ্য থাকায় যথার্থ হলেও তার প্রামাণ্য থাকতে পারে না । যদি বিরুদ্ধ পক্ষের থেকে উত্থাপিত সম্ভাব্য সমস্ত আপত্তি খণ্ডন উক্ত পক্ষে সম্ভব না হয় তবে তার গ্রাহ্যতা নেই । জ্ঞান স্বরূপ অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের প্রামাণ্য বিষয়ে কিন্তু, নৈয়ায়িকগণের মধ্যে ভিন্ন মতও লক্ষ্য করা যায় । বাচস্পতি প্রমুখ নৈয়ায়িক অনুব্যবসায়ের স্বতঃপ্রামাণ্য স্বীকার করেন ।[৪১] যদিও স্বতঃপ্রমাণ্যের তিনি ভিন্ন একটি অর্থ করেন । তাঁর মতে জ্ঞান স্বতঃপ্রামাণ যেহেতু তার প্রামাণ্য বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকে না ।[৪২] প্রশ্ন উঠতে পারে যে অনুব্যবসায়ের দ্বারা ব্যবসায় প্রকাশিত হয় সেই অনুব্যবসায়ের দ্বারা সেই ব্যবসায়ের প্রামাণ্য প্রকাশিত হতে পারে কিনা ?

যাঁরা মনে করেন অনুব্যবসায়ের দ্বারা ব্যবসায়ের প্রামাণ্য প্রকাশিত হতে পারে তাঁদের মতে, 'অয়ং ঘটঃ'– এইরূপ ব্যবসায় জ্ঞান প্রকাশক 'ঘটমহং জানামি'– রূপ অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানে ঘট ধর্মী, এবং ঘটত্বরূপ ধর্মের সঙ্গে ঘটত্ববৎ ধর্মীও বিষয় হয়ে থাকে । কেননা কোন সম্বন্ধীকে যদি সম্বন্ধিতাবচ্ছেদকরূপে জানা যায় তাহলে সম্বন্ধীর সঙ্গে সম্বন্ধ অন্য পদার্থও নির্ণীত হয়ে থাকে ।[৪৩] যেমন- ধরা যাক্ যজ্ঞদত্ত দেবদত্তের পিতা এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হল । এই জ্ঞানে পিতৃত্ব এবং পুত্রত্বরূপ সম্বন্ধের সম্বন্ধী হয় যথাক্রমে যজ্ঞদত্ত ও দেবদত্ত, সেক্ষেত্রে এই দেবদত্ত যজ্ঞদত্তের পুত্র এইভাবে সম্বন্ধিতাবচ্ছেদক পুত্রত্বরূপে দেবদত্তকে জানা যায় । একইভাবে অনুব্যবসায়ের দ্বারা ব্যবসায়ের ঘটরূপ ধর্মী, ঘটত্ব প্রকার এবং তাদের বৈশিষ্ট্য নির্ণীত হয়ে যায় । কিন্তু বিশ্বনাথ প্রমুখ নৈয়ায়িকগণ এই মত স্বীকার করেন না । তাঁদের মতে, অনুব্যবাসায়ের দ্বারা যখন জ্ঞানের প্রকাশ হয় তখন জ্ঞানের প্রকাশের পাশাপাশি জ্ঞানগত বা প্রমাগত তদ্বদ্বিশেষ্যকত্ব এবং তৎপ্রকারকত্বও গৃহীত হয় । কিন্তু যেহেতু উৎপন্ন জ্ঞানে সর্বদা নিশ্চয়তা থাকে না, সংশয়ের অবকাশও থাকতে পারে, তাই সেই সংশয় জ্ঞানের

অনুরোধে তৎপ্রকারকত্বটি তদ্বদ্বিশেষ্যকতত্বাবচ্ছিন্নরূপে গৃহীত হয় না । যেমন পৃথিবীতে গন্ধ- এইরূপ জ্ঞানের গ্রহণ যখন হয় তখন পৃথিবীত্ব প্রকারটি গৃহীত হয় এবং গন্ধবদ্ বিশেষ্যকত্বটিও গৃহীত হয়ে থাকে । কিন্তু সংশয়ের অনুরোধে পৃথিবীত্ব-প্রকারটি গন্ধবদ্ বিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্নরূপে গৃহীত হয় না ।[৪৪] এখানেই মুরারী মিশ্রের সঙ্গে ন্যায় মতের পার্থক্য । মীমাংসক মুরারী মিশ্রের মতে, অনুব্যবসায়ের দ্বারা পূর্ববর্তী জ্ঞানটি যখন গৃহীত হয় তখন তার দ্বারা সেই জ্ঞানগত প্রামাণ্যও প্রকাশিত হয় । কেননা অনুব্যবসায়ের দ্বারা যেমন জ্ঞানগত তদ্বদ্বিশেষ্যকত্ব ও তৎপ্রকারকত্ব গৃহীত হয় তেমনি তৎপ্রকারকত্বটি তদ্বদ্বিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্নরূপে গৃহীত হয়ে থাকে ।[৪৫] ফলে সেই অনুব্যবসায়ের দ্বারাই পূর্ববর্তী জ্ঞানের প্রামাণ্যও প্রকাশিত হয়ে থাকে । কিন্তু নৈয়ায়িকগণ তা স্বীকার করেন না ।

নৈয়ায়িক মতে, অনুব্যবসায়ের দ্বারা জ্ঞানের প্রামাণ্য প্রকাশিত বা গৃহীত হয় না। প্রামাণ্য গ্রহণ প্রশ্নে নৈয়ায়িকগণ পরতঃপ্রামাণ্যবাদী । তাঁদের মতে, যার দ্বারা অর্থাৎ যে অনুব্যবসায়ের দ্বারা জ্ঞানের গ্রহণ হয় সেই অনুব্যবসায়ের দ্বারাই জ্ঞানগত প্রমাত্ব বা প্রামাণ্যের গ্রহণ হতে পারে না । জ্ঞান গ্রাহক জ্ঞানের অতিরিক্ত জ্ঞানান্তরের দ্বারাই জ্ঞানগত প্রামাণ্যের গ্রহণ হয়ে থাকে । অনুব্যবসায়ের দ্বারা জ্ঞানের গ্রহণ কালেই জ্ঞানগত প্রমাত্বের কিংবা অপ্রমাত্বের গ্রহণ হলে অর্থাৎ জ্ঞানটি প্রমা কি অপ্রমা এটির বোধ হলে ভ্রম জ্ঞান স্থলে কোন ব্যক্তিই ভ্রমের বিষয়টি গ্রহণে প্রবৃত্ত হত না । কিন্তু ব্যক্তি সত্য বা সৎ বিষয়ের মত মিথ্যা বা অসৎ বিষয়ের গ্রহণেও প্রবৃত্ত হয় । সম্মুখে একখণ্ড রূপা দেখে– 'এটি রূপা' এরূপ জ্ঞান যেমন আমাদের হয়ে থাকে তেমনি দূর থেকে চকচকে ঝিনুকের টুকরো দেখেও 'এটি রূপা' এরূপ জ্ঞান হয়ে থাকে । কিন্তু দুই ক্ষেত্রেই রূপার জ্ঞান হলেও কোন জ্ঞানটি সত্য ও কোন জ্ঞানটি ভ্রম সেটা বোঝার

একমাত্র উপায় হল বিষয়টির গ্রহণে প্রবৃত্ত হওয়া এবং প্রবৃত্ত হয়ে বিষয়টিকে লাভ করা। ‘এটি রূপা’ এরূপ জ্ঞান হওয়ার পর রূপার খণ্ডটি আমার কাজে লাগবে এরূপ মনে করে যদি কেউ রূপার খণ্ডটিকে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরার চেষ্টা করে এবং রূপার টুকরোটি সেখানে পায় তাহলে বুঝতে হবে জ্ঞানটি সত্য । কিন্তু ব্যক্তি যদি রূপার পরিবর্তে হাতে ঝিনুকের টুকরো পায় তাহলে বুঝতে হবে পূর্বের জ্ঞানটি মিথ্যা বা ভ্রম। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে ন্যায় মতে, জ্ঞানের সত্যতা বা মিথ্যাত্ব স্বতঃই গ্রহণ হতে পারে না । জ্ঞান গ্রাহক সামগ্রী অতিরিক্ত প্রবৃত্তি সামর্থ্য ও অসামর্থ্য হেতু জন্য জ্ঞানের যথাক্রমে প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্যের গ্রহণ হয়ে থাকে । জ্ঞানের প্রমাণ্য গ্রাহক সেই জ্ঞানটি হল– সফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব হেতুক অনুমান । অর্থাৎ তাঁদের মতে, মানস প্রত্যক্ষের দ্বারা জ্ঞানের গ্রহণ হলেও সেই জ্ঞানগত প্রামাণ্যের গ্রহণ হয় অনুমানের দ্বারা । কোন বিষয়ে জ্ঞান হওয়ার পর জ্ঞাতা সেই জ্ঞানের বিষয়টিকে গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় । জ্ঞাতার এই প্রবৃত্তি যদি সফল হয় অর্থাৎ গ্রাহ্য বস্তুর গ্রহণ ও ত্যাজ্য বস্তুর ত্যাগ হয় তাহলে সেই সফল প্রবৃত্তি হেতুক প্রবৃত্তির জনক জ্ঞানটি প্রমাত্মকরূপে জ্ঞান হয় অন্যথায় অর্থাৎ প্রবৃত্তি বিফল হলে জনক জ্ঞানটি অপ্রমা বলে নিশ্চয় হয় । দূর থেকে একটি কলস দেখে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির এরূপ জ্ঞান জন্মে যে ‘এখানে জল আছে’ । তারপর সেই ব্যক্তি কলসের দিকে প্রবৃত্ত হয়ে কলসে জল পেলে তার প্রবৃত্তি সফল হওয়ায় ‘মদীয়ং জ্ঞানং প্রমা সফলপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ’– এরূপ সফলপ্রবৃত্তি হেতুক অনুমানের দ্বারা জনক জ্ঞানটির প্রমাত্ব নিশ্চয় হয়ে থাকে । অন্যদিকে কোন তৃষ্ণার্থ ব্যক্তির মরুদেশে দূর থেকে কোন স্থানে সূর্যকিরণে বালিকণার চাকচিক্য দেখে ‘ঐস্থানে জল আছে’– এরূপ জ্ঞান হয় । তারপর সেই ব্যক্তি জল পাওয়ার জন্য প্রবৃত্ত হলে তার প্রবৃত্তি বিফল হয় । তখন ‘মদীয়ং জ্ঞানম্ অপ্রমা বিফলপ্রবৃত্তিজনকত্বাৎ’– এরূপ বিফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব হেতুক

অনুমানের দ্বারা জনক প্রবৃত্তির জনক জ্ঞানটি অপ্রমা বলে নিশ্চয় হয় । কাজেই ন্যায় মতে, কোন জ্ঞান প্রমা কি অপ্রমা অর্থাৎ কোন জ্ঞানের প্রামাণ্য ও অপ্রামান্য অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় । যদিও তাঁরা অভ্যাসদশা ও অনভ্যাসদশা ভেদে জ্ঞানের উৎপত্তির পশ্চাতে দ্বিবিধ কালের কথা স্বীকার করেন । 'অভ্যাস' শব্দের অর্থ হল এক বিষয়ক জ্ঞানের পৌনঃপুন্য এবং 'দশা' শব্দের অর্থ হল কাল বা অবস্থা । 'অভ্যাসদশা' বলতে বোঝানো হয়েছে 'পূর্বজ্ঞানসমানাকারজ্ঞানান্তরাধিকরণ-কালঃ' ।[৪৬] অর্থাৎ বর্তমানে যে বস্তুর যেভাবে জ্ঞান হচ্ছে পূর্বেও সেই বস্তুর সেইভাবে জ্ঞান হলে, বর্তমান জ্ঞান কালকে সেই জ্ঞানের অভ্যাসদশা বলা হয় । অন্যদিকে 'অনভ্যাসদশা' বলতে বোঝায় যে জ্ঞানের সমানাকার জ্ঞান পূর্বে কখনও হয়নি বা যে জ্ঞানটি প্রাথমিক জ্ঞান । অনভ্যাসদশায় উৎপন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্রে নৈয়ায়িকগণ প্রামাণ্য সংশয়ের কথা স্বীকার করেন এবং সফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব হেতুক অনুমানের দ্বারা সেই জ্ঞানের প্রামাণ্যের গ্রহণ স্বীকার করেন। কিন্তু অভ্যাসদশা উৎপন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্রে যেহেতু সেই জ্ঞান বিষয়ে জ্ঞাতা বার বার অভ্যস্ত হয়ে যায় । সেক্ষেত্রে উৎপন্ন জ্ঞানে তজ্জাতীয়ত্ব থাকায় তার দ্বারাই জ্ঞানের প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়ে যায় । অর্থাৎ অভ্যাসদশা উৎপন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির পূর্বেই জ্ঞাতার 'মদীয়ং জ্ঞানং প্রমা অভ্যস্তজ্ঞানত্বাৎ' কিংবা 'মদীয়ং জ্ঞানং প্রমা তজ্জাতীয়ত্বাৎ' – এইরূপে অনুমানের দ্বারা প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়ে যায় ।[৪৭] সেক্ষেত্রে সফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব হেতুক অনুমানের প্রয়োজন হয় না ।

যদিও বাচস্পতি এবং তাঁকে অনুসরণে বর্দ্ধমানাচার্য প্রমুখ অনুব্যবসায় দ্বারা জ্ঞান গ্রহণের অনন্তর প্রামাণ্য গ্রহণ প্রশ্নে ঐরূপ সংশয়ের আবশ্যকতা স্বীকার করেন না । বাচস্পতি মিশ্রের মতে, 'পর্বত বহ্নিমান্' এই আকারের জ্ঞানের অনুব্যবসায়ে কেবল 'পর্বত বহ্নিমান্' এই বিষয়টাই প্রকাশিত হয় না, তাকে অনুমান বলেও জ্ঞান হয় ।

যেহেতু অনুমান হল সেরূপ জ্ঞান যা সৎ হেতুর ভিত্তিতে উৎপন্ন বলে জ্ঞাত হয় । পরামর্শ যদি ভ্রান্ত হয় এবং এই পরামর্শ প্রভৃতি জ্ঞান গুলির সঙ্গে সিদ্ধান্তের যদি কোনও আবশ্যিক সম্বন্ধ না থাকে তাহলে অনুমিতির উৎপত্তিই সম্ভব নয় । আর ন্যায় মতে, অনুমান যদি সৎ লিঙ্গপরামর্শ থেকে উৎপন্ন না হয় তাহলে অনুমান সৎ হতে পারে না । যেহেতু অনুমান সৎ হেতুর ভিত্তিতে উৎপন্ন বলে জ্ঞাত হয় সেহেতু অনুমানের অনুব্যবসায়ে অবশ্যই অনুমানের প্রমাত্ব বা প্রমাণ্য গৃহীত হবে । কিন্তু সেক্ষেত্রে জ্ঞান গ্রাহক অনুব্যবসায় প্রমাত্বের গ্রাহক হয়ে যাবে– যা নৈয়ায়িক সম্মত পরতঃপ্রামাণ্য বাদের বিরোধী । উদয়নাচার্যও বলেছেন, জ্ঞানের জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে প্রথম জ্ঞানের প্রামাণ্য 'সুকর এব' অর্থাৎ সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয় । কেননা, সেক্ষেত্রে সংশয়ের কোনও অবকাশ থাকে না । তাঁর মতে, ধর্মী জ্ঞান কখনও অপ্রমা হতে পারে না । ধরা যাক্, কোনও জ্ঞান হল 'A is B' এই আকারের । উদয়নের মতে, ধর্মী 'A'-এর বিষয়ে সংশয় কিছুতেই হতে পারে না । কারণ, তাহলে 'A is B'- এই জ্ঞানও হতে পারে না । তবে তাঁরা ব্যক্তি জ্ঞানের ধর্মী অংশে কোন সংশয় থাকে না একথা স্বীকার করলেও জ্ঞান প্রমাণ্যের স্বতঃস্তু ধর্ম স্বীকার করেন না । কেননা তাঁদের মতে, অনুব্যবসায়ের ক্ষেত্রে জ্ঞানাত্মক ধর্মী অংশে সংশয়ের কোনও অবকাশ না থাকলেও অর্থাৎ ব্যক্তির জ্ঞান যে হচ্ছে সে বিষয়ে ব্যক্তির নিজের সংশয় না হলেও প্রকারাংশে ভুল হতেই পারে । সেক্ষেত্রে জ্ঞানটি যে বিশেষ প্রকারের বলে গৃহীত হয়, জ্ঞানটি যদি সেই প্রকারের না হয় তাহলে অনুব্যবসায় সত্য নাও হতে পারে । সেই সম্ভাবনা বশতঃ ব্যক্তির অনুব্যবসায় হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে সংশয় হতেই পারে । ফলতঃ, জ্ঞান গ্রহণ দ্বারাই বা অনুব্যবসায় দ্বারাই জ্ঞানের প্রামাত্ব বা প্রামাণ্য গ্রহণ হতে পারে– এই মত উদয়ন থেকে বর্দ্ধমান উপাধ্যায় কোনও নৈয়ায়িক কর্তৃকই সমর্থিত হয়নি ।

তথ্যসূত্র

১. ‘দুরাচক্ষুষা হ্যয়মর্থ................ব্যবসায়াত্মকমিতি’– বাৎস্যায়ন, *ন্যায়সূত্র-ভাষ্য,* ১৯৯৭, পৃ. ১১.

২. উদ্দ্যোতকর, *ন্যায়ভাষ্যবার্ত্তিক,* ১৯৯৭, পৃ. ৩৫.

৩. ‘তথা হি ব্যবসায়ো বিনিশ্চয়ো বিকল্প ইত্যনর্থান্তরম্................’- বাচস্পতি, *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকা,* ১৯৯৬, পৃ. ১০৭.

৪. ‘যদতস্মিংস্তদিতি তদব্যভিচারি’– বাৎস্যায়ন, *ন্যায়সূত্র-ভাষ্য,* ১৯৯৭, পৃ. ১১.

৫. ‘তস্মাৎ সবিকল্পপ্রত্যক্ষাবিরোধার্থং ব্যবসায়াত্মকপদমিতি সিদ্ধম্’– ঐ, পৃ. ১১৭.

৬. বিশ্বনাথ, *ন্যায়সূত্র-বৃত্তি,* ১৯৩৬-৪৪, পৃ. ১২০.

৭. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, *অনুব্যবসায়,* পৃ. ১.

৮. ‘জ্ঞান ইজ নট অ্যান অ্যাকটিভিটি, বাট এ প্রোডাক্ট’– মহান্তি, জে এন, *গঙ্গেশ’স থিয়োরি অফ ট্রুথ,* পৃ ২৩.

৯. ‘ঘ্রাণজং রাসনং চাক্ষুষং স্পার্শনং শ্রৌত্রং মানসমিতি ষট্‌বিধং প্রত্যক্ষম্’– বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদ,* ১৩৭৪, পৃ. ২৬৭.

১০. গঙ্গেশোপাধ্যায়, *তত্ত্বচিন্তামণি,* ১৯৯০, পৃ. ৭৮৯.

১১. উদয়ন, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ,* ১৯৯৫, পৃ. ৩৬৯.

১২. '..................উপহতেন্দ্রিয়াণামনুব্যবসায়াভাবাদিতি'– বাৎস্যায়ন, *ন্যায়সূত্র-ভাষ্য,* ১৯৯৭, পৃ. ১১.

১৩. 'বিষয় নিরূপ্যং হি জ্ঞানমিষ্যতে'– উদয়ন, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ,* ১৯৫৭, পৃ. ৪৭৪.

১৪. 'যদ্ব্যবহারানুকূলশক্তিযোগি যত্জ্ঞানং তসৈব তদ্বিষয়কত্বাত্'– গঙ্গেশোপাধায়, *তত্ত্বচিন্তামণি,* ১৯৯০, পৃ. ৩৮৫.

১৫. 'বিশিষ্টবুদ্ধৌবিশেষণজ্ঞানস্য কারণত্বাত্'– বিশ্বনাথপঞ্চানন ভট্টাচার্য,*কারিকাবলী,* ১৯৩৯, পৃ. ১০৪.

১৬. অন্নংভট্ট, *তর্কসংগ্রহঃ অধ্যাপনাসহিতঃ,* ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪১৯.

১৭. 'যদ্যপি জ্ঞানমাত্রং প্রতি সাধারণং কারণং মনঃ............'- বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদঃ,* ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ. পৃ. ২৬১.

১৮. 'তত্রাত্মনি জ্ঞানং প্রকারীভূয় ভাসতে, জ্ঞানে ঘটস্তত্র ঘটত্বম্'– ঐ, পৃ. ২৮১.

১৯. তর্কতীর্থ, শ্রীরামকৃষ্ণ, *কুসুমাঞ্জলি-সৌরভ,* ১৯২৩, পৃ. ২৭৬.

২০. 'তত্রাত্মনি জ্ঞানং প্রকারীভূয় ভাসতে'– বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদঃ,* ১৩৭৪, পৃ. ২৮১.

২১. 'সুখাদি-তদ্বুদ্ধ্যাদিসামগ্রা প্রতিবন্ধাৎ বিষয়ান্তরসংচারদর্শনেন তস্যা বলবত্ত্বাৎ অনুভবাদিতি......'– গঙ্গেশোপাধ্যায়, *তত্ত্বচিন্তামণি,* ১৯৯০, পৃ. ৭৯৯.

২২. 'বিশেষণে যদ্ বিশেষণং, তদ্ বিশেষণতাবচ্ছেদকমিত্যুচ্যতে । বিশেষণতাবচ্ছেদক-প্রকারকং জ্ঞানং বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যজ্ঞানে কারণম্'– বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদ,*১৩৭৪, পৃ. ২৮১-২৮২.

২৩. 'জ্ঞানং জ্ঞানত্বঞ্চ নির্বিকল্পকে ভাসতে'- গঙ্গেশোপাধ্যায়, *তত্ত্বচিন্তামণি*, ১৪১৬, পৃ. ৪৮৮.

২৪. 'ততোজ্ঞানত্ববৈশিষ্ট্যং জ্ঞানে জ্ঞানবৈশিষ্ট্যঞ্চাত্মনিভাসতে'- ঐ।

২৫. 'জ্ঞানং যন্নির্বিকল্পাখ্যং তদতীন্দ্রিয়মিষ্যতে'– বিশ্বনাথপঞ্চানন ভট্টাচার্য,*কারিকাবলী*, ১৯৩৯, পৃ. ১০৩.

২৬. অন্নংভট্ট, *তর্কসংগ্রহঃ অধ্যাপনাসহিতঃ*, ১৩৯০, পৃ. ২৪৫.

২৭. 'বিশেষণবিশেষ্যসম্বন্ধানবগাহি জ্ঞানম্'- অন্নংভট্ট, *তর্কসংগ্রহঃ অধ্যাপনাসহিতঃ*, ১৩৯০, পৃ. ২৪৫.

২৮. বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদ*, ১৩৭৪, পৃ. ২৮৩.

২৯. 'ন চাদৃষ্টেন ব্যবহারঃ । ততো লোকোত্তরঃ সর্বানুভাবী সম্ভাব্যতে'– উদয়ন, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ*, ১৯৫৭, পৃ. ২০৯.

৩০. 'তেন জ্ঞানাকরণকমত্যর্থঃ'– বিশ্বনাথ, *ন্যায়সূত্র-বৃত্তি*, ১৯৩৬-৪৪ পৃ. ১০১.

৩১. 'ঈশ্বরপ্রত্যক্ষন্তু ন লক্ষণম্......'– বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদঃ*, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ. পৃ. ২৬২.

৩২. গঙ্গেশোপাধ্যায়, *তত্ত্বচিন্তামণি*, ১৯৯০, পৃ. ৭৯৮.

৩৩. প্রাশ্চাত্য দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর 'প্রবলেম অফ ফিলোজফি' গ্রন্থে পরিচিত মূলক জ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে অনেকটা একই রকমের কথা বলেছেন । তাঁর মতে, আমরা কেবল কোন বিষয় সম্পর্কেই জ্ঞানলাভ করি না সেই জ্ঞানকে বিষয় করে যে জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞানকেও জেনে থাকি । যখন আমরা সূর্য দেখি তখন আমাদের

কেবল সূর্যের সঙ্গে নয়, 'আমাদের সূর্য দেখার চেতনার' সঙ্গেও সরাসরি পরিচয় ঘটে । কেবল বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান নয়, তাঁর মতে, আমাদের সুখ-দুঃখ প্রভৃতি সমস্ত রকমের মানসিক বস্তু সম্পর্কে সাক্ষাৎ জ্ঞান হয়ে থাকে । এই ধরনের জ্ঞানকে রাসেল বলেছেন, 'আত্ম-চেতনা' বা স্ব-চেতনা' ।

৩৪. 'অপ্রমা হপি প্রমেত্যেব গৃহ্যতে.........'- উদয়ানাচার্য, *ন্যায়-বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি*, ১৯১১ পৃ. ৪৯.

৩৫. 'অত্র এব অপ্রমা অপি প্রমা ইতি এব গৃহ্যতে'– গঙ্গেশোপাধ্যায়, *তত্ত্বচিন্তামণি*, ১৯৯০, পৃ. ১৭৪.

৩৬. 'অন্যথা ভ্রান্তিসমুচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ প্রমাণাভাবাৎ'– উদয়ন, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ*, ১৯৯৫, পৃ ৩৭৬.

৩৭. 'সাক্ষাৎকারিপ্রমাবত্তয়া প্রত্যক্ষান্তর্ভাবাৎ'– উদয়ন, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ*, ১৯৯৫, পৃ. ৩৭৫.

৩৮. 'তস্য চতুর্বিধস্য প্রত্যক্ষস্য বিষয়ো বোদ্ধব্যঃ স্বলক্ষণম্'– ধর্মোত্তর, *ন্যায়বিন্দুটীকা*, ২০০৭, পৃ. ১০৬.

৩৯. 'সামাণ্যলক্ষণম্ অনুমানস্য বিষয়ং.........'– ধর্মোত্তর, *ন্যায়বিন্দুটীকা*, ২০০৭, পৃ. ১২০.

৪০. 'গৌরস্তীতিবাক্যাদস্তিত্বেন গৌঃ শ্রুতো নত্বনুমিত ইত্যনুভবাচ্চ'– জগদীশ, *শব্দশক্তি প্রকাশিকা*, ১৯৩৪, পৃ. ১৭.

৪১. 'জ্ঞানস্য মানসপ্রত্যক্ষস্য....................স্বতঃ প্রামাণ্যমিতি... ....,'- বাচস্পতি মিশ্র, *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকা*, ১৯৩৬-৪৪, পৃ. ৯.

৪২. '......নিষ্কম্পমুৎপদ্যতে...'- বাচস্পতি মিশ্র, *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকা*, ১৯৩৬-৪৪, পৃ. ৯.

৪৩. 'সম্বন্ধিতাবচ্ছেদকরূপবত্তয়া জ্ঞায়মানে সম্বন্ধিনি সসম্বন্ধিক পদার্থনিরূপণম্ ....'- গঙ্গেশোপাধ্যায়, *তত্ত্বচিন্তামণি*, ১৯৯০, পৃ. ১৭৩.

৪৪. 'তৎপ্রকারকত্বাবচ্ছিন্নতদ্বদ্বিশেষ্যকত্বং পরং ন গৃহ্যতে, সংশয়ানুরোধাৎ'– বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদঃ*, ১৭৩৪, পৃ. ৫২৭.

৪৫. 'তজজ্ঞানবিষয়ক-জ্ঞানেন তজজ্ঞানপ্রামাণ্যং গৃহ্যতে'- বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদঃ,* ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫২৪.

৪৬. ভট্টাচার্য, শ্রীমোহন ও দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতীয় দর্শন কোষ*- প্রথমখণ্ড, ১৯৭৮, পৃ. ২৪.

৪৭. 'তজ্জাতীয়ত্বেন লিঙ্গেন প্রামাণ্যাবধারণাদর্থবিনিশ্চয়েন প্রবর্তন্তে' – বাচস্পতি মিশ্র, *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকা*, ১৯৩৬-৪৪, পৃ. ৯.

জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ে বিরোধী মতের খণ্ডন

জ্ঞানের জ্ঞান সংক্রান্ত পূর্বোক্ত আলোচনার অনন্তর একথাই স্পষ্ট হয় যে, ভারতীয় দার্শনিক সমাজে জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ক বিবিধ মত আছে । একইসঙ্গে একথাও সহজেই উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে, জ্ঞানের স্বরূপগত প্রশ্নে দার্শনিকদের মধ্যে যেমন কোন সহমত নেই, একইভাবে জ্ঞানের জ্ঞান প্রসঙ্গেও তাঁদের মধ্যে মতবিরোধের অন্ত নেই । জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ে নৈয়ায়িক মতই আমার আলোচ্য । নৈয়ায়িকরা জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ে নিজ মত প্রতিষ্ঠার্থে সাধক যুক্তির উপস্থাপনা করেছেন । কিন্তু তা যথেষ্ট নয় । বিরুদ্ধ মতের অবকাশ থাকায় বিরুদ্ধ মত খণ্ডন ব্যতীত স্বমত প্রতিষ্ঠা অসম্ভব । সেই কারণে ন্যায় মতের আলোচনা প্রসঙ্গে সাধক যুক্তির আলোচনা যেমন আবশ্যক বিরুদ্ধ মত খণ্ডনের আলোচনাও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ । পরতঃপ্রকাশবাদী নৈয়ায়িকদের মত স্বপ্রকাশবাদীদের মত অপেক্ষা যেমন পৃথক্ তেমনি পরতঃপ্রকাশবাদের সমর্থক অন্য দার্শনিক সম্প্রদায়ের মত থেকেও স্বতন্ত্র । সেই দিক থেকে স্বপ্রকাশবাদীগণের পাশাপাশি অন্যান্য পরতঃপ্রকাশবাদীরাও ন্যায়ের প্রতিপক্ষ । কিন্তু গবেষণা নিবন্ধের বেঁধে দেওয়া নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সীমিত সামর্থ্য বিশিষ্ট আমার পক্ষে সমস্ত পূর্বপক্ষের মত ও নৈয়ায়িক পক্ষ থেকে তার খণ্ডন আলোচনা করা একটি নির্দিষ্ট নিবন্ধে দুরূহ । বিশেষতঃ আমার মত একজন মন্দবুদ্ধির পক্ষে তা কোন ক্রমেই সম্ভব নয় । একই গবেষণা পত্রে পূর্বোক্ত সব সম্প্রদায়ের আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করলে সব সম্প্রদায়ের প্রতি যথাযোগ্য বিচার কিংবা গুরুত্ব কোনটিই দেওয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে । তাই পূর্বপক্ষরূপে পরতঃপ্রকাশবাদের সমর্থক কুমারিল ভট্টের মত ও স্বপ্রকাশবাদের সমর্থক বৌদ্ধ মত, বিশেষতঃ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ মতকেই গ্রহণ করেছি ।

প্রতিপক্ষ হিসাবে পরতঃপ্রকাশবাদের সমর্থকদের মধ্যে ভাট্ট মতকে এই কারণেই গ্রহণ করা হচ্ছে যেহেতু ভাট্ট ও নৈয়ায়িক উভয়ই বস্তুবাদী দার্শনিক এবং উভয়েই পরতঃপ্রকাশবাদের সমর্থক । অথচ জ্ঞানের প্রকাশক যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের স্বরূপ প্রসঙ্গে ভাট্টগণ নৈয়ায়িকদের সঙ্গে সহমত নন । নৈয়ায়িকগণ যেখানে জ্ঞানকে প্রত্যক্ষগম্য বলেছেন সেখানে ভাট্টগণ জ্ঞানকে অনুমানগম্য বলে স্বীকার করেছেন । অথচ বস্তুবাদী হওয়ায় উভয়েই মূলতঃ বস্তুর জ্ঞান নিরপেক্ষ অস্তিত্বেই বিশ্বাসী । অন্যভাবে বলতে গেলে বস্তু ও বিষয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য উভয়েই স্বীকার করেছেন । বস্তুবাদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই জ্ঞান সংক্রান্ত বক্তব্যও রেখেছেন । যেমন- জ্ঞানকে কুমারিল ভট্ট ক্রিয়া রূপে বর্ণনা করেছেন । জ্ঞানকে ক্রিয়া বলে স্বীকার করলে জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার মাধ্যমে বস্তু ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করেছেন । তাঁর মতে জ্ঞান রূপ ক্রিয়ার ফলে বস্তুতে জ্ঞাততা নামক ধর্ম উৎপন্ন হয় । কিন্তু সেই জ্ঞান ক্রিয়া অতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় না । তাঁর মতে, জ্ঞান অজ্ঞাত বস্তুতে জ্ঞাততা নামক ধর্ম উৎপন্ন করে । সুতরাং জ্ঞানের পূর্বে অজ্ঞাত বস্তুর সত্তা স্বীকৃত । অর্থাৎ জ্ঞান নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব তাঁরা স্বীকার করেছেন । যদিও নৈয়ায়িকগণও জ্ঞান ও জ্ঞানের কারণ প্রমাণের ধারণাকে সহজ বোধ্য করার জন্য যে উদাহরণ দিয়ে থাকেন সেখানে বলা হয়– যেমন করে কুঠার কাষ্ঠ সংযোগে বৃক্ষচ্ছেদ হয় একইভাবে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের সংযোগে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় । এই ধরণের যে উপমা ব্যবহার করেন তা থেকে মনে হতে পারে নৈয়ায়িক মতে, জ্ঞান একধরণের ক্রিয়া । কিন্তু নৈয়ায়িকগণ জ্ঞানকে ভাট্টগণের ন্যায় ক্রিয়া বলে স্বীকার করেন না । জ্ঞানকে ক্রিয়া বলে স্বীকার করে ভাট্টদের বস্তুবাদ রক্ষার এই প্রক্রিয়াকে নৈয়ায়িকগণ গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি । তাঁরা বস্তুবাদ রক্ষার্থে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছেন । তাঁদের মতে

জ্ঞানকে ক্রিয়া বলে স্বীকার করা সম্ভব নয় । কারণ জ্ঞান, তাঁদের মতে, আত্মার গুণ । এই আত্মা বিভু হওয়ায় তার ক্রিয়া সম্ভব নয় । সুতরাং আত্মায় উৎপন্ন জ্ঞান ক্রিয়া হতে পারে না । এই গুণ স্বরূপ জ্ঞান, তাঁদের মতে, ব্যক্তির নিকট বিষয় প্রকাশক হয়, বস্তুতে কোন নতুন ধর্মের উদ্ভাবক হয় না । জ্ঞানের দ্বারা যা পূর্বে অপ্রকাশিত ছিল তা প্রকাশিত হয় মাত্র । কাজেই ন্যায় মতে জ্ঞানের পূর্বে বস্তু অপ্রকাশিত থাকে । কিন্তু জ্ঞানের পূর্বে বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না এটা তাঁরা বলেন না । জ্ঞান অতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব আছে একথাই তাঁরা স্বীকার করেন । একইসঙ্গে পূর্বে বলা হয়েছে এই জ্ঞান, তাঁদের মতে, দ্রব্যও হতে পারে না । কেননা সাকারবাদীরাই মূলতঃ জ্ঞানকে দ্রব্য বলতে পারেন । যা সাকার তা অবশ্যই অবয়ব বিশিষ্ট হবে । কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে ন্যায় মতে জ্ঞান সাবয়ব নয়, যেহেতু জ্ঞানের অবয়ব নেই । অন্যদিকে জ্ঞান নিরবয়ব হলেও তা কিন্তু নিত্যও নয় । দ্রব্য নিরবয়ব হলে তা নিত্য হবেই । ন্যায় মতে, জ্ঞান নিরবয়ব ও অনিত্য হওয়ায়, জ্ঞান দ্রব্য হতে পারে না । তাই তাঁদের মতে, জ্ঞানের কোন আকারও থাকে না, জ্ঞান নিরাকার । জ্ঞানকে ক্রিয়া কিংবা দ্রব্য রূপে স্বীকার না করে জ্ঞানকে গুণ বলেই স্বীকার করেন তাঁরা । পূর্বেই বলা হয়েছে এই জ্ঞান গুণ পদার্থ হলেও এটি নিজ ভিন্ন বিষয়ের গ্রাহক । জ্ঞান জ্ঞানভিন্ন বিষয়কে বিষয় করে । সুতরাং বাহ্য বিষয়ের জ্ঞানে বাহ্য বিষয় যেমন বিষয়রূপে বর্তমান আন্তর বিষয়ক জ্ঞানেও আন্তর বিষয়, যেমন জ্ঞান, বিষয়রূপেই গণ্য । এই দিক থেকে ন্যায় মতে, বাহ্য বিষয়ক জ্ঞান ও আন্তর বিষয়ক জ্ঞানের ব্যাখ্যা অভিন্ন । জ্ঞান যেমন বাহ্য বস্তুকে বিষয় করে তেমনি আন্তর বস্তুকেও বিষয়রূপে গ্রহণ করে । সুতরাং জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় ভিন্ন । জ্ঞান জ্ঞানকেও বিষয়রূপে গ্রহণ করায় জ্ঞান স্বপ্রকাশ একথা বলা যাবে না । জ্ঞান জ্ঞানান্তরবেদ্য একথাই স্বীকার্য । জ্ঞানে সেই বিষয়ের আকারই জ্ঞানের আকার বলে

ব্যবহার হয় । জ্ঞানের নিজস্ব কোন আকার নেই । কোন বিষয়ের জ্ঞান উৎপন্ন না হলেও বস্তু অস্তিত্বশীল । তার জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পর ঐ বস্তুটি জ্ঞানের বিষয় হয় । সুতরাং তারা বস্তু ও বিষয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য স্বীকার করেন । এগুলি বস্তুবাদীর মূল বক্তব্য । শুধু তাই নয় 'আমি বুঝেছিলাম,' 'আমি বুঝব' প্রভৃতি রূপে জ্ঞানের ধ্বংস ও প্রাগভাব লক্ষ্য করে বলা যায় জীবাত্মার জ্ঞান অনিত্য । বস্তুবাদের অন্যতম সমর্থক হয়েও এবং নৈয়ায়িকদের ন্যায় জ্ঞানকে নিরাকার বললেও মীমাংসক প্রভাকর কিন্তু স্বপ্রকাশবাদকেই সমর্থন করেছেন এবং জ্ঞান মাত্রকেই স্বপ্রকাশ বলেছেন । কিন্তু জ্ঞান মাত্রের স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করেও অর্থাৎ যাবতীয় জ্ঞানেরও স্বপ্রকাশত্ব স্বীকার করেও বস্তুবাদ রক্ষা করেছেন ।[১] প্রশ্ন হতে পারে উক্ত মতকে পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করা হয়নি কেন ?[২] এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, আমরা দেখেছি প্রভাকর মিশ্র, শালিকনাথ প্রমুখর মতে, প্রভাকর মূলতঃ সম্বিৎ-কে স্বপ্রকাশ বলেছেন । উক্ত মতে, ত্রিপুটি সম্বিৎ স্বীকৃত । অর্থাৎ এই মতে সম্বিৎ, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা একই সঙ্গে প্রকাশিত হয় । 'ঋজুবিমলা' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রভাকর সম্মত সম্বিৎ-কে স্বপ্রকাশ বললেও জ্ঞানকে অনুমেয় বলেই স্বীকার করেছেন । অর্থাৎ প্রভাকর সম্মত সম্বিদের সঙ্গে তাঁরা প্রভাকর সম্মত জ্ঞানের পার্থক্য করেন । কিন্তু আমি মূলতঃ জ্ঞানের প্রকাশ সংক্রান্ত আলোচনায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখছি । তাই প্রভাকরের মতকে পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করছি না । জ্ঞানের জ্ঞান আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে পরপ্রকাশবাদী মিশ্র মত অনেকাংশে ন্যায় মতের সঙ্গে অভিন্ন । নৈয়ায়িকদের ন্যায় মিশ্র মতেও জ্ঞানের প্রকাশের নিমিত্ত অনুব্যবসায়রূপ মানস প্রত্যক্ষ স্বীকৃত । কিন্তু তাসত্ত্বেও সেই অনুব্যবসায়ের স্বরূপ বিষয়ে মিশ্র মত ন্যায়ের মতের পার্থক্য আমরা উল্লেখ করেছি ।

পূর্বেই বলা হয়েছে মীমাংসক মুরারী মিশ্রের মতে যে অনুব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের দ্বারা পূর্ববর্তী ব্যবসায় জ্ঞানের গ্রহণ হয় সেই অনুব্যবসায়ের দ্বারাই জ্ঞানের প্রমাত্ব বা প্রামাণ্যেরও গ্রহণ হয় । জ্ঞান গ্রাহক সামগ্রী ও জ্ঞানের প্রমাত্ব গ্রাহক সামগ্রীকে যাঁরা অভিন্ন বলে স্বীকার করেন তাঁরা মূলতঃ স্বতঃপ্রামাণ্যবাদী । এই অর্থে মীমাংসক মুরারী মিশ্র জ্ঞানের গ্রহণ প্রশ্নে পরতঃপ্রকাশ বাদের সমর্থক হলেও জ্ঞানের প্রমাত্ব গ্রহণ প্রশ্নে স্বতঃপ্রমাণ্যবাদী । আর এখানেই ন্যায় মতের সঙ্গে মিশ্র মতের পার্থক্য । ন্যায় মতে শুক্তিতে রজত ভ্রমের অনন্তর তার প্রকাশক অনুব্যবসায়ে ইদং ধর্মী এবং রজতত্বরূপ ধর্ম বিষয় হলেও ইদন্তটি রজতত্বাবচ্ছিন্নরূপে অনুব্যবসায়ে বিষয় হয় না । অর্থাৎ জ্ঞানগত তদ্বৎ বিশেষ্যকত্ব এবং তৎপ্রকারকত্ব প্রকাশিত হলেও অনুব্যবসায়ে তৎপ্রকারত্বটি তদ্বৎ বিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্নরূপে প্রকাশিত হয় না । কিন্তু মিশ্রমতে, অনুব্যবসায়ের দ্বারা প্রমা যখন গৃহীত হয় তখন সেই প্রমার যে ধর্ম প্রমাত্ব সেটিও অনুব্যবসায়ের দ্বারা গৃহীত হয় । কিন্তু নৈয়ায়কগণ মুরারী মিশ্রের এই যুক্তি গ্রহণ করেন না । তাঁদের মতে অনুব্যবসায়ের দ্বারা ব্যবসায় জ্ঞানের প্রকাশ বা গ্রহণ হওয়া সত্ত্বেও সেই জ্ঞান বিষয়ে সংশয় হতে দেখা যায় । অর্থাৎ এই বিষয়ে অনুভবই প্রমাণ যে অনুব্যবসায়ের পরেও কোন বিষয়ে সংশয় হতে পারে । আর যেহেতু সংশয় হতে পারে তাই নৈয়ায়িকগণ সেই সংশয় জ্ঞানের কারণ হিসাবে বলেন– অনুব্যবসায়ের দ্বারা ব্যবসায় বা প্রমাগত তদ্বদ্বিশেষ্যকত্ব এবং তৎপ্রকারকত্ব গৃহীত হলেও সেই অনুব্যবসায়ের দ্বারাই তৎপ্রকারকত্বটি তদ্বদ্বিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্নরূপে গৃহীত হয় না । ফলে সেই অনুব্যবসায়ের দ্বারা জ্ঞানগত প্রমাত্বটি গৃহীত হয়– এই মত স্বীকৃত হতে পারে না। প্রমাত্ব গৃহীত হয় সফলপ্রবৃত্তিজনকত্ব অথবা তজ্জাতীয়ত্ব হেতুক অনুমানের দ্বারা ।

আমরা আলোচনাক্রমে লক্ষ্য করেছি প্রভাকর মীমাংসক, বেদান্ত এবং বৌদ্ধরা জ্ঞানের স্বপ্রকাশবাদের সমর্থক । ভাট্ট মীমাংসক, ন্যায়-বৈশেষিক এবং মুরারি মিশ্র জ্ঞানের প্রকাশ বিষয়ে পরতঃপ্রকাশবাদ সমর্থন করেছেন । পরতঃপ্রকাশবাদের সমর্থক নৈয়ায়িকদের পূর্বপক্ষ স্বতঃপ্রকাশবাদের সকল সম্প্রদায়ই । কিন্তু জ্ঞানের পরতঃপ্রকাশবাদের সমর্থকদের মধ্যে মিশ্র সম্প্রদায়ের ন্যায় ভাট্ট সম্প্রদায়ও নৈয়ায়িকদের পূর্বপক্ষ । কারণ জ্ঞানের প্রকাশক জ্ঞানান্তরের স্বরূপ বিষয়ে তারা নৈয়ায়িকদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করে । তবে তাঁদের মধ্যে ভাট্ট মীমাংসকের মত ন্যায় মতের সম্পূর্ণ বিরোধী । সেই কারণে পরতঃপ্রকাশবাদের সমর্থকদের মধ্যে ভাট্ট মীমাংসকের মতকেই নৈয়ায়িকদের পূর্বপক্ষরূপে গ্রহণ করছি । অন্যদিকে স্বপ্রকাশবাদীদের মধ্যে চরম প্রতিপক্ষ হিসাবে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দর্শনকেই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করছি । কেননা বস্তুবাদী ন্যায় মতের বিরুদ্ধে চরম ভাববাদের সমর্থক বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দর্শন । আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি তাঁরা বিজ্ঞান বা জ্ঞানাতিরিক্ত বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন । সেই কারণে জ্ঞানকে সাকার বলে স্বীকার করলেও জ্ঞানগত যে আকার সেটিকে তাঁরা বস্তুর আকার না বলে জ্ঞানেরই আকার বলেন । আবার জ্ঞানের প্রকাশের জন্য সেই জ্ঞান অতিরিক্ত অন্য কোন কিছুর অস্তিত্বও অস্বীকার করেন । অর্থাৎ জ্ঞানকে নিজেই নিজের প্রকাশকরূপে স্বীকার করে স্বপ্রকাশবাদ সমর্থন করেন । ভাববাদ প্রতিষ্ঠার্থে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধরা জ্ঞানের সাকারবাদ ও জ্ঞানের স্বপ্রপকাশত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন । আবার বস্তুবাদীরা বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠার্থে এই উভয় মতের খণ্ডন করে জ্ঞানের নিরাকারত্ব ও জ্ঞানের পরপ্রকাশত্ব স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন । অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনও ভাববাদী দর্শনরূপে পরিচিত । তবে বেদান্ত মত আমি সেই অর্থে চরম ভাববাদী হিসাবে গ্রহণ করছি না । কেননা তাঁরা এক অর্থে চৈতন্য,

যাকে জ্ঞানের সঙ্গে অভিন্ন বলেন, তাকে আকারহীন বলে বর্ণনা করেছেন । কিন্তু আবার অজ্ঞানের বিনাশক অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, তা কিন্তু কেবলমাত্র সাক্ষীবেদ্য বা চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশ্য বলেছেন । তাঁরা পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মকেই একমাত্র সৎ বলেন । কিন্তু জ্ঞানতত্ত্বের অন্যতম পূর্বস্বীকৃতি হল জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের উপায়ের মধ্যে ভেদ স্বীকার । তাই পারমার্থিক দৃষ্টি থেকে জ্ঞানের আলোচনা সম্ভব নয়। জগৎকে ব্যাবহারিক সৎ বলে স্বীকার করায় তদবস্থায় এই ভেদ স্বীকার্য এবং জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব বলে তাঁরা মনে করেছেন । পারমার্থিক দৃষ্টিতে একমাত্র সৎ পদার্থ হল ব্রহ্ম । এই ব্রহ্ম, তাঁদের মতে চৈতন্য স্বরূপ ও জ্ঞান স্বরূপ, তা স্বপ্রকাশ । অর্থাৎ এই অর্থে জ্ঞান বলতে প্রকাশ স্বরূপ চৈতন্য, যা তাঁদের মতে স্বপ্রকাশ । কিন্তু ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে অন্তঃকরণের পরিণামরূপ বৃত্তি জ্ঞানের কথাও স্বীকার করেছেন । এই বৃত্তি জ্ঞান কিন্তু তাঁদের মতে স্বপ্রকাশ নয়, সাক্ষীর দ্বারা প্রকাশিত হয় । অজ্ঞান নিবৃত্তি যে করে তাও তাঁদের মতে জ্ঞান । অদ্বৈত বেদান্ত মতে অন্তঃকরণ তৈজস পদার্থ হওয়ায় দর্পনের ন্যায় স্বচ্ছ এবং তার নিজস্ব আকার না থাকলেও বিষয়াকার গ্রহণে সমর্থ । এই অন্তঃকরণ চক্ষুরাদি দ্বার দিয়ে নির্গত হয়ে বর্হিদেশে ঘট-পটাদির আকার প্রাপ্ত হয় এবং ঘট-পটাদির আবরক যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞানের নাশক হয় । অজ্ঞানের নাশ হলে বিষয়চৈতন্য ও প্রমাতৃচৈতন্যের অভেদ সম্পাদন করে বিষয়কে প্রকাশ করে । অন্তঃকরণের বিষয়াকার পরিণাম এই বৃত্তি সেই অর্থে সবিষয়ক । যদিও তার সবিষয়ত্ব অবিদ্যাজন্য । কিন্তু সবিষয়ক হলেও বিষয়াকারে আকারিত অন্তঃকরণবৃত্তিতে অবচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান, সাক্ষীর দ্বারা প্রকাশিত হওয়ায়, তা স্বপ্রকাশ নয় । তবে বৃত্তিজ্ঞান স্বপ্রকাশ না হলেও সাক্ষী কিন্তু স্বপ্রকাশ । সুতরাং পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক এই দুই দৃষ্টিতে জ্ঞানের অর্থ তাঁদের মতে, ভিন্ন । সেই দিক বিচার করে বেদান্ত মতকে ন্যায়

দর্শনের চরম বিরোধী মত রূপে গ্রহণ করছি না । কেননা যে মূল প্রশ্নকে কেন্দ্র করে ভাববাদ ও বস্তুবাদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায় সেটি হল- বাহ্য বস্তুর জ্ঞান নিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে কি নেই । এক্ষেত্রে জ্ঞান নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করে না যাঁরা তাঁরাই মূলতঃ চরম পন্থী ভাববাদী । পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য পূর্বক 'জ্ঞান' শব্দের দ্বিবিধ অর্থ ও তাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন স্বীকারের ভিত্তিতে চরম বস্তুবাদ ও চরম ভাববাদের মধ্যে বেদান্তের অবস্থান মধ্যবর্তী । বস্তুবাদ রক্ষার পথে জ্ঞানের জ্ঞান সম্পর্কিত আলোচনায় ন্যায় মতের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসাবে তাই কুমারিল ভট্ট ও বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ মত আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে এই প্রবন্ধে। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ ভাববাদ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি রূপে জ্ঞানকে সাকার ও স্বতঃপ্রকাশ রূপে স্বীকার করেছেন । অপরপক্ষে নৈয়ায়িক বস্তুবাদ প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত উক্ত দুটি পক্ষেরই বিরোধিতা পূর্বক জ্ঞান নিরাকার ও জ্ঞান পরতঃপ্রকাশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। তাই বিজ্ঞানবাদীকে আমি নৈয়ায়িকের চরম পূর্বপক্ষ বলে গণ্য করেছি ।

জ্ঞানের জ্ঞান বিষয়ে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত খণ্ডন-

জ্ঞানের স্বপ্রকাশতত্বে বিশ্বাসী বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের জ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে ভাববাদ স্বীকার করার অন্যতম একটি কারণ হল জ্ঞানকে সাকার স্বীকার করা । তাঁদের মতে জ্ঞানের নিজস্ব আকার থাকে । আসলে তাঁরা জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে সহোপলম্ভরূপ সম্বন্ধ স্বীকার করেন । পূর্বেই বলা হয়েছে এই সম্বন্ধ একধরণের অভেদ সম্বন্ধ । এই সম্বন্ধ অনুসারে জ্ঞান থেকে বিষয়কে পৃথক্ করা যায় না । কাজেই নীলের জ্ঞান বলতে যা বোঝায় তা নীল বিষয়ের সঙ্গে অভিন্ন বলে স্বীকার করেন তাঁরা। তাই তাঁদের মতে, যা বস্তুর আকার তা আসলে জ্ঞানেরই আকার । অর্থাৎ জ্ঞানই

সাকার । উক্ত মতে, জ্ঞানকে যদি নিরাকার বলে স্বীকার করা হয় তাহলে নীলের জ্ঞান ও পীতের জ্ঞান উভয়ই নিরাকার হওয়ায় উভয়কেই অভিন্ন বলতে হয় । অর্থাৎ জ্ঞানকে নিরাকার বলে স্বীকার করলে নীল জ্ঞানের থেকে অন্যান্য পীত জ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞানকে পৃথক্ করা সম্ভব নয় । তবে জ্ঞানে যে আকার থাকে সেই আকারটি আসলে বিষয়ের আকার । বিষয়ের সঙ্গে জ্ঞানের সঙ্গতি থাকার জন্য জ্ঞান বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হয়- একথাও স্বীকার করা যায় না । কেননা সর্বদা জ্ঞান থাকলেই জ্ঞানের বিষয় থাকবে এরূপ হয় না । যেমন শুভ্র স্ফটিক লাল জবার সন্নিহিত হলে লাল বলে প্রতিভাত হয় । লালের যে জ্ঞান সেখানে হয় সেই বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে থাকে না । কাজেই জ্ঞানের যে আকার তা বিষয়ের আকার এরূপ বলা যাবে না ।

ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনে জ্ঞানের সত্যতা প্রমাণের জন্য জ্ঞানের সঙ্গে বিষয়ের স্বারূপ্য লক্ষ্য করা হয় । এখন স্বারূপ্য থাকবে তখনই যদি জ্ঞানের নিজস্ব আকার থাকে । তাই দিঙ্নাগ বলেছেন – 'বিষয়াকার এবাস্য প্রমাণম্......' ।[৩] কাজেই জ্ঞানের নিজস্ব আকার স্বীকার করতেই হবে । তাছাড়া একই বিষয় সম্পর্কে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান হয় । একই বস্তু কখনও দীর্ঘরূপে, কখনও হ্রস্বরূপে; একই ঘট একইসঙ্গে ঘটরূপে, দ্রব্যরূপে, প্রমেয়রূপে গৃহীত হয় । এসব ক্ষেত্রে জ্ঞানগত আকারকে যদি বিষয়ের আকার বলে স্বীকার করা হয় তাহলে পরস্পর বিরুদ্ধ আকার একই বিষয়ে স্বীকার করতে হয় । কিন্তু পরস্পর বিরুদ্ধ আকার তো একই বিষয়ে থাকতে পারে না । সুতরাং এই আকার জ্ঞানেরই আকার । শুধু তাই নয় আমারা আমাদের অভিজ্ঞতাতেও লক্ষ্য করি সর্বদা জ্ঞান আকার বিশিষ্টরূপে ধরা দেয় । নিরাকার জ্ঞানের অস্তিত্ব আমাদের অভিজ্ঞতায় ধরা পরে না । সুতরাং জ্ঞান নিরাকার হতে পারে না, জ্ঞান সাকার ।

ন্যায় দর্শনে বলা হয়েছে জ্ঞান অমূর্ত । জ্ঞান অমূর্ত হওয়ায় জ্ঞানে বিষয়ের আকার থাকা সম্ভব নয় । জ্ঞান দর্পনের মত নয়, যাতে বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হয় । বস্তুত জ্ঞান নিরাকার বলেই অনুভূত হয় । যদিও তা আকার যুক্ত বস্তুর গ্রহণ করতে পারে । জ্ঞান যদি বিষয়ের আকার গ্রহণ করে বলা হয় তাহলে বস্তুকে দূরে, নিকটে প্রভৃতিরূপে কীভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হবে ? জ্ঞান যদি বস্তুর মত আকারযুক্ত হয় তাহলে জ্ঞান বস্তুর স্বভাবই হবে । কিন্তু বস্তুতঃ জ্ঞানকে বস্তুর থেকে ভিন্ন বলেই জ্ঞান হয় । জ্ঞান ও বস্তুর মধ্যে স্বারূপ্য স্বীকার করলে জ্ঞানকে বস্তুতে পর্যবসিত করা হয়, যা জ্ঞানের স্বরূপের বিরোধী । কাজেই জ্ঞান বস্তুর মতই আকারযুক্ত হয় এরূপ স্বীকার করা যায় না ।

বৌদ্ধদের জ্ঞানকে সাকাররূপে স্বীকারের মূলে অন্যতম যুক্তি হল পরস্পর বিরুদ্ধ আকার বস্তুতে থাকতে পারে না । কাজেই একই বস্তু সম্পর্কে যে বিরুদ্ধ আকারের জ্ঞান হয় সেই আকারগুলি জ্ঞানেরই আকার । এর বিরুদ্ধে কুমারিল ভট্ট বলেছেন ঈশ্বর এমন কোন নিয়ম করেননি যে একটি বস্তুতে মাত্র একটি আকারই থাকবে । সব কিছু যেমনভাবে প্রত্যক্ষ হয় তেমন ভাবেই স্বীকার করা উচিত । বস্তুকে এক বা অনেক আকার সম্পন্ন বলে মানব যেমন ভাবে প্রত্যক্ষ করে তদনুসারে একই বস্তুতে বিরুদ্ধ নানা আকার থাকা সম্ভব ।[৪] এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন মানদণ্ড নেই ।

উদ্দ্যোতকরের মতে– 'ন হি কর্ম চ ক্রিয়া চ একং ভবতীতি' অর্থাৎ কর্ম ও ক্রিয়া একই পদার্থ হয় না ।[৫] গ্রহণ হল ক্রিয়া এবং গ্রাহ্য বিষয় হল কর্ম । এই গ্রাহ্য ও গ্রাহক, কর্ম ও ক্রিয়া অভিন্ন পদার্থ হতে পারে না । কাজেই উদ্দ্যোতকরের মতে জ্ঞান সাকার হতে পারে না । জ্ঞানগত আকারকে জ্ঞানেরই আকার বলে স্বীকার করায় জ্ঞান

অতিরিক্ত বস্তুর অস্তিত্ব বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন না । নৈয়ায়িক মতে জ্ঞান যেহেতু সাকার হতে পারে না সেহেতু বৌদ্ধ সম্মত ভাববাদও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না । তবে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের ভাববাদ স্বীকারের মূলে অন্যতম আরেক কারণ হল জ্ঞানের স্বপ্রকাশবাদ সমর্থন । আর এই স্বপ্রকাশবাদ ও ভাববাদ স্বীকারের মূলে অন্যতম কারণ হল জ্ঞান ও বিষয়ের অভেদ নির্ণায়ক সহোপলম্ভ নিয়ম স্বীকার করা । স্বসংবেদন প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ জ্ঞান ও বিষয়ের মধ্যে সহোপলম্ভ নিয়ম স্বীকার করেন । জ্ঞান ও বিষয় অভিন্ন হওয়ায় বৌদ্ধগণকে জ্ঞান অতিরিক্ত বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় না । বিষয় ও জ্ঞান অভিন্ন হলে বিষয়ের প্রকাশ হলেই জ্ঞানের প্রকাশ হবে । বিষয়ের প্রকাশ ও জ্ঞানের প্রকাশ অভিন্ন হওয়ায় জ্ঞানের প্রকাশের জন্য সেই জ্ঞান অতিরিক্ত জ্ঞানান্তরের স্বীকারও আবশ্যক হয় না ।

সহোপলম্ভ নিয়মের বিরুদ্ধে বলা হয় যে, নীলের জ্ঞান ও নীল যদি আবশ্যিকভাবে একত্রে থাকে তবে তাদের পৃথক্ করা সম্ভব নয় । এভাবে ভাববাদ প্রতিষ্ঠা করাই বৌদ্ধদের উদ্দেশ্য । কিন্তু নৈয়ায়িকগণ ভাববাদ প্রতিষ্ঠার এই ভিত্তিকেই খণ্ডন করেন । উক্ত মতে আমরা বলতে পারি যে ধরা যাক্ একটি শিশু । সে কোন একটি ফুলকে জানে । কিন্তু তার কশ্চিৎ ফুলজ্ঞান যে আছে সে বিষয়ে সে জ্ঞানবান্ । কিন্তু আমার কোন বিষয়ে জ্ঞান আছে অথচ ‘আমি জানিনা যে সেই বিষয়ে আমার জ্ঞান আছে’ এ পক্ষকে স্বীকার করতে আমার অস্বস্তি বোধ হয় । কারণ এক্ষেত্রে আমি দুটো বিষয়কে গুলিয়ে ফেলি । এটি সত্য যে আমি যখন বলি ‘আমি ঘটকে জানি’ তখন আমি ঘট জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন না হয়ে একথা বলতে পারি না । কিন্তু আমি তৃতীয় ব্যক্তি রাম সম্পর্কে একথা বলতে পারি যে ‘রাম ঘটকে জানে’ যদিও সে যে ঘটকে জানে তা সে জানে না । অতঃপর আমি রামের সম্পর্কে যে কথা সত্য তা অবশ্যই আমার নিজের

সম্পর্কেও সত্য বলে মনে করি । অর্থাৎ ঘটকে আমি জানতে পারি আমার ঘট জ্ঞানকে না জেনেও । যদিও আমি কিন্তু 'আমি ঘটকে জানি' একথা বলতে পারি না আমার ঘট জ্ঞানকে না জেনে । কারণ এরূপ ব্যবহার অর্থাৎ শব্দ ব্যবহার ঘটজ্ঞানের জ্ঞান পূর্বক । স্বসংবেদনের সপক্ষে আচার্য দিঙ্‌নাগ প্রদত্ত যুক্তিগুলির বিরুদ্ধে একাধিক আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে ।

আচার্য দিঙ্‌নাগ জ্ঞানের দ্বিবিধ দিকের কথা স্বীকার করেছেন– বিষয় প্রকাশ ও স্বপ্রকাশ বা নিজের প্রকাশ । নৈয়ায়িকগণও জ্ঞানের দ্বিবিধ দিকের কথাই স্বীকার করেন । তবে তাঁরা বিষয় প্রকাশক জ্ঞানকে ও জ্ঞানের প্রকাশক জ্ঞানের সঙ্গে অভিন্ন বলেন না । দিঙ্‌নাগ যেরূপে একই জ্ঞানের বিষয়াভাস ও স্বাভাস এর কথা বলেছেন নৈয়ায়িকগণও তাই বলেন । তাঁরাও স্বীকার করেন জ্ঞানের দ্বারাই কোন কিছুর প্রকাশ হয়ে থাকে । জ্ঞানের দ্বারা যেমন ঘটাদি বাহ্য বিষয় প্রকাশিত হতে পারে তেমনি জ্ঞানের দ্বারাই আন্তর বিষয় জ্ঞানেরও প্রকাশ হয়ে থাকে । কিন্তু বাহ্য বিষয় প্রকাশক জ্ঞান ও আন্তর বিষয় জ্ঞানের প্রকাশক জ্ঞানের স্বরূপ এক নয় । একথা সত্য যে আন্তর বিষয়রূপে পূর্ববর্তীক্ষণে জাত কোন জ্ঞানের জ্ঞানান্তরের দ্বারা প্রকাশকালে সেই পূর্ববর্তী জ্ঞানের বিষয়টিও প্রকাশ করে । সেই দিক থেকে দ্বিতীয় জ্ঞানটির দ্বিবিধ দিক স্বীকার করা যেতে পারে । অর্থাৎ দিঙ্‌নাগের ন্যায় এই দ্বিতীয় স্তরের জ্ঞানটির দ্বিবিধ দিক আছে বলা যেতে পারে– একটি পূর্ববর্তী জ্ঞানের বিষয় প্রকাশ ও পূর্ববর্তী জ্ঞানের প্রকাশ । কিন্তু তার দ্বারা জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব বা স্বসংবেদন সিদ্ধ হয় না, পরপ্রকাশত্বই প্রমাণিত হয় । কেননা এই পরবর্তী জ্ঞানটিতে পূর্ববর্তী জ্ঞানটি বিষয় হলেও জ্ঞানটি নিজে নিজের জ্ঞানে বিষয় হয় না । কাজেই জ্ঞানই জ্ঞানের প্রকাশক হলেও জ্ঞান স্বপ্রকাশক হয় না । অর্থাৎ নৈয়ায়িকদের মূল যুক্তিটি হল ক- ১ নামক কোন একটি

ক্ষণে একটি জ্ঞান হচ্ছে খ- ১, যা গ- ১ কে বিষয় হিসাবে গ্রহণ করছে । এবং ক- ২ ক্ষণে, খ- ২ নামক অপর একটি জ্ঞান উৎপন্ন হচ্ছে, যা খ- ১ কে যেমন গ্রহণ করছে তেমনি খ- ১ এর বিষয় গ- ১ কেও গ্রহণ করছে । অর্থাৎ খ- ২ এমন একটি জ্ঞান যার দ্বিবিধ দিক আছে । এই দ্বিবিধ দিক কিন্তু জ্ঞানমাত্রের থাকে না, যেমন এক্ষেত্রে খ- ১ এর এই দ্বিবিধ দিক থাকে না । এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে জ্ঞান বিষয়ের প্রকাশক হলেও নিজের প্রকাশক হয় না । অর্থাৎ জ্ঞান জ্ঞানান্তরের দ্বারাই প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক নৈয়ায়িক মতে জ্ঞান বিষয়রূপে বাহ্য ও আন্তর পদার্থ উভয়েরই গ্রাহক । এ বিষয়ে নৈয়ায়িকগণ বাহ্য বিষয় ও আন্তর বিষয়ক জ্ঞানের সাম্য স্বীকার করেন ।

দিঙ্‌নাগের উপস্থাপিত স্মৃতির যুক্তির বিরুদ্ধে ভাসর্বজ্ঞ বলেছেন একথা সত্য যে, আমার ‘ক’ বিষয়ে জ্ঞান হওয়ার পর আমার ‘ক’- এর স্মৃতি হয় এবং আমি স্মরণ করতে পারি যে, “আমার ‘ক’ বিষয়ে জ্ঞান আছে” । একইসঙ্গে একথাও সত্য যে, যা পূর্বানুভবের বিষয় নয় তা স্মরণ হতে পারে না । কিন্তু আমি জানি যে “আমার ‘ক’ বিষয়ে জ্ঞান আছে”– এটি স্মরণ নয় । ‘ক’- বিষয়ে জ্ঞান হওয়ার পর সেই ‘ক’ বিষয়ে স্মরণ হতে পারে । কিন্তু ‘ক’ বিষয়ক অনুভবের স্মরণ হয় না । আসলে তাঁর বক্তব্য হল বস্তুর স্মরণ হয় কিন্তু পূর্বানুভবের স্মরণ আমাদের হতে পারে না । “আমার ‘ক’ বিষয়ে জ্ঞান আছে”- এইরূপে পূর্বানুভবের স্মরণ না হলেও তা অনুমান হতে পারে । স্মরণের আকারকে অনুমাপক হেতু হিসাবে ব্যবহার করে আমরা পূর্ববর্তী জ্ঞানকে অনুমান করতে পারি । অনুমানটির আকার হচ্ছে আমার অবশ্যই আমার পূর্বানুভবের জ্ঞান ছিল, কারণ আমি সেই জ্ঞানকে স্মরণ করতে পারি । আবার এমনও লক্ষ্য করা যায় কোন পূর্ব জ্ঞানের কথা স্মরণ না করেও কেবল বস্তুকে স্মরণ করি ।[৬] যেমন ‘ক’-

এর জ্ঞান হওয়ার পর "আমার 'ক' বিষয়ে জ্ঞান আছে"– এরূপ স্মরণ হওয়ার পরিবর্তে কেবল 'ক'- এর স্মরণ হতে দেখা যায় । অর্থাৎ বস্তুর স্মরণের সঙ্গে পূর্বনুভবের স্মরণ হওয়াটা আবশ্যিক কোন ঘটনা না । কাজেই এমন কোন নিয়ম নেই যে, একই জ্ঞানের দ্বারা বস্তু প্রকাশের সঙ্গে জ্ঞান নিজেকেও প্রকাশ করবে ।

আচার্য উদয়নও স্মৃতির প্রমাত্ব আছে কিনা সেই আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, স্মৃতি কেবলমাত্র পূর্বানুভূত বিষয়কে বিষয় করে না, পূর্বানুভবকেও বিষয় করে । কেননা স্মৃতিতে পূর্বানুভব বিষয় হয় একথা যদি স্বীকার না করা হয় তাহলে 'আমি ঘট দেখেছিলাম' বা 'আমি ঐ ঘটনাটি শুনেছিলাম'– এই আকারের স্মৃতিতে যে পূর্বানুভবের আকারের উল্লেখ পাওয়া যায় বা শব্দ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তার অনুপপত্তি হয় ।[৭] তবে এর দ্বারা দিঙ্নাগের মত মেনে জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধি হয় না । কেননা উদয়নের মতে, স্মৃতি পূর্বানুভূতরূপে বিষয়কে গ্রহণ করলেও পূর্বানুভব নিজেকে বিষয় করে না । আসলে পূর্বোক্ত আকারের শব্দ প্রয়োগের কারণ হল প্রত্যভিজ্ঞাত্মক মানস প্রত্যক্ষ । যে আমি পূর্বে ঘট দেখেছিলাম বা যে আমি পূর্বে কোন ঘটনা শুনেছিলাম, সেই আমি ঘটকে স্মরণ করছি বা ঘটনাটি স্মরণ করছি– এরূপে প্রত্যভিজ্ঞার জন্য পূর্ববর্তী অনুভবটিও আমাদের ব্যবহারে উল্লিখিত হয়ে থাকে । কাজেই পূর্বোক্ত শব্দ ব্যবহারের দ্বারা জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধি হয় না ।

জ্ঞানের পরতঃপ্রকাশবাদ স্বীকার না করে স্বসংবেদন স্বীকার করলে লাঘব হয় এই যুক্তির বিরুদ্ধে গঙ্গেশোপাধ্যায় বলেছেন, এই লাঘবযুক্তি গ্রহণযোগ্য নয় । কারণ তা বাহ্য প্রত্যক্ষস্থলে কার্য-কারণ নিয়মের লঙ্ঘন ঘটায় । ধরা যাক্ আমি একটি ঘট দেখছি । ঘট হল সেই প্রত্যক্ষের বিষয় । কারণ এটি চক্ষুর সঙ্গে ঘট সন্নিকর্ষের , যা

ঐ প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করে, তার আধার । এবং এইরূপ সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষের জনক । চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ চক্ষুরিন্দ্রিয় জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় হতে পারে না কারণ তা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের জন্য উৎপন্ন জ্ঞানের বিষয় নয়[৮] যখন একটি প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় তা কেবলমাত্র অন্তরিন্দ্রিয় মনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার আন্তর প্রত্যক্ষ উৎপন্ন করতে পারে । স্বসংবেদনের পক্ষে ধর্মকীর্তি প্রদত্ত যুক্তিগুলির বিরুদ্ধেও একাধিক আপত্তি ওঠে ।

ধর্মকীর্তি প্রদত্ত প্রথম যুক্তিটি ছিল গ্রাহ্য গ্রাহকের মধ্যে পার্থক্য ভ্রম । যেহেতু তাদের সহোপলম্ভ হয় । তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে ভাসর্বজ্ঞ বলেছেন যে গ্রাহ্য ও গ্রাহক সর্বদা একত্র গৃহীত হয় এমনটি সর্বদা নয় ।[৯] এমনকি স্মরণ কেবলমাত্র পূর্বানুভূত বস্তু বিষয়ক নয় পূর্বানুভবকেও বিষয় করে এমনটিও বলা যায় না । কেবলমাত্র পূর্বানুভূত বস্তু বিষয়ক স্মরণও সম্ভব । তিনি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বোঝাতে চেয়েছেন । যেমন আমি স্মরণ করতে পারি যে, আমি আমার পিতা মাতাকে মান্য করে চলতাম । কিন্তু আমি আমার পিতা মাতাকে মান্য করে চলার অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করছি একথা তো অবান্তর । এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হচ্ছে এমন কোন নিয়ম নেই যে বস্তু ও তার জ্ঞান একত্র গৃহীত হয় । পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলে কোন বিষয়ের স্মরণ হয় না ঠিকই । কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার জ্ঞান পূর্বে থাকতে হবে এমনটি নয় । সুতরাং জ্ঞান উৎপন্ন হলেই যে আবশ্যিকভাবে তাকে জানতে হবে এমনটি নয় ।

যদিও বৌদ্ধ দার্শনিকরা আপত্তি করেন যে, উপরি উক্ত উদাহরণে আমরা কেবলমাত্র পিতামাতাকে মেনে চলতাম এটাই স্মরণ করি না । কারণ যখন এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, আমি কী করে পিতামাতার প্রতি আমার আনুগত্য স্মরণ করি ? তার উত্তরে অবশ্যই বলতে হয় যে আমি আমাকে পিতামাতার প্রতি অনুগত বলে জেনেছি ।

ভাসর্বজ্ঞ কিন্তু মনে করেন যে এর দ্বারা আবশ্যিকভাবে পূর্ব অভিজ্ঞতা বিষয়ক জ্ঞানের অস্তিত্ব সূচিত হয় না ।[১০] তাঁর মতে এটি বর্তমানের একটি অনুমানের ফলও হতে পারে। অনুমানটির আকার হচ্ছে আমার অবশ্যই আমার পিতামাতার প্রতি আনুগত্যের জ্ঞান ছিল, কারণ আমি সেই অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করতে পারি ।

দ্বিতীয় যুক্তিতে বলা হয়েছে যেমন বিজ্ঞান অতিরিক্ত ও বিজ্ঞানের প্রকাশক বিজ্ঞান বলেও কিছু নেই তেমনি নীলাকার জ্ঞান অতিরিক্ত নীল বলে কিছু নেই । কেননা আন্তর বিষয়রূপে বিজ্ঞানও তার প্রকাশক বিজ্ঞানের সঙ্গে যেমন অভিন্ন তেমনি সুখ-দুঃখ প্রভৃতি আন্তর বিষয় বিজ্ঞানের সঙ্গে অভিন্ন । তাঁদের বক্তব্য অনুসারে জ্ঞানের বিষয় আসলে জ্ঞানের আকার । বস্তুতঃ বিজ্ঞান ও বিষয়ের অভিন্নতা সাধনার্থে তাঁরা সহোপলম্ভনিয়ম স্বীকার করেছেন । বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর, তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতিমিশ্র প্রমুখ জ্ঞান ও জ্ঞেয় বিষয়ের মধ্যে অভেদের অনুমাপক হেতুরূপে উপস্থাপিত সহোপলম্ভনিয়মের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন । পূর্বেই বলা হয়েছে উদ্দ্যোতকরের মতে গ্রহণ রূপ ক্রিয়া এবং গ্রাহ্য বিষয় দুটি ভিন্ন পদার্থ । যেহেতু কর্ম ও ক্রিয়া একই পদার্থ হতে পারে না সেহেতু বিজ্ঞান ও তার কর্ম জ্ঞেয় বিষয় অভিন্ন হতে পারে না । জ্ঞান ও জ্ঞেয় পদার্থের ভেদ স্বীকৃত হওয়ায় বিজ্ঞানের উপলব্ধি ও বিষয়ের উপলব্ধি ভিন্ন বলেই স্বীকার করতে হবে । কাজেই 'সহোপলম্ভ' শব্দটি জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় এক ও অভিন্ন এরূপ অর্থ বোধের জন্য প্রয়োগ করা হলে হেতুটি অসিদ্ধ হবে । সহোপলম্ভনিয়ম অসিদ্ধ হওয়ায় তার উপর নির্ভর করে স্বপ্রকাশতত্ত্বও স্বীকৃত হতে পারে না । শুধু তাই নয় ধর্মকীর্তির মত মেনে জ্ঞান যেমন তার বাহ্য বিষয় ঘটাদির সঙ্গে অভিন্ন একথা বলা যায় না তেমনি সুখ-দুঃখাদি আন্তর বিষয়ও বিজ্ঞানের সঙ্গে এক– একথা স্বীকার করা যায় না ।

ন্যায় দর্শনে সুখ-দুঃখ প্রভৃতিকে জ্ঞানের কার্যরূপে স্বীকার করা হয়েছে । জ্ঞান হল কারণ এবং সুখ-দুঃখাদি হল তার ফল । অন্যদিকে ঘট-পটাদিকে প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের প্রতি বিষয়রূপে কারণ বলা হয়েছে । ঘট-পটাদি বিষয়রূপে পূর্বে থাকলে তবেই তদ্বিষয়ক জ্ঞান হতে পারে । কার্য ও কারণ কখনও অভিন্ন হতে পারে না । এই যুক্তিতে কারণ জ্ঞানের সঙ্গে সুখ-দুঃখাদি কার্য যেমন এক হতে পারে না তেমনি বিষয়রূপে ঘট-পটাদির সঙ্গে জ্ঞান অভিন্ন হতে পারে না । একইভাবে জ্ঞান তথা ব্যবসায়াত্মক জ্ঞান তার প্রকাশক অনুব্যবসায়ের সঙ্গে কখনই অভিন্ন হতে পারে না । প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য শালিকনাথও এই সহোপলম্ভ নিয়ম ও সাকারবাদের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেছেন । তাঁর মতে, বৌদ্ধদের সহোপলম্ভ নিয়মের মূল বক্তব্য হল জ্ঞান ও জ্ঞানের আকার একইসঙ্গে অনুভূত হয়ে থাকে । কিন্তু শালিকনাথের মতে, জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ জ্ঞানের আকার ভিন্ন পদার্থ । আসলে শালিকনাথও নৈয়ায়িকদের ন্যায় জ্ঞানের আকারের কথা বলেন না । তাঁর মতে, কোন বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান হওয়ার সময় বাহ্য বিষয়টি বা জ্ঞানের আকারটির সঙ্গে জ্ঞান সংযুক্ত হতে পারে এবং বিষটিকে প্রকাশ করতে পারে । যে বাহ্য বিষয়ের প্রকাশ হয় সেটি কিন্তু জ্ঞানের প্রকৃতির নয়, সেটি জড় । কাজেই তাঁর মতে সহোপলম্ভ নিয়ম ও অভেদতত্ত্ব গ্রহণযোগ্য হতে পারে না ।[১১] শুধু তাই নয় সুখ-দুঃখ প্রভৃতি জ্ঞানের সঙ্গে অভিন্ন– সেই মতের বিরুদ্ধেও তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন । তাঁর মতে বৌদ্ধদের সুখ-দুঃখাদির সঙ্গে জ্ঞানের অভিন্নতা প্রমাণের মূলে যুক্তি হল উভয়ের কারণ সামগ্রী এক । অর্থাৎ যে কারণসামগ্রীর দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই কারণ সামগ্রীর দ্বারাই সুখ-দুঃখাদি উৎপন্ন হয় । কিন্তু একথা শালিকনাথ স্বীকার করেন না । তাঁর মতে, জ্ঞানের কারণ হল বিষয়, সেটি হতে পারে বাহ্য বিষয় । কিন্তু সুখ-দুঃখাদির কারণ হল জ্ঞান । যেহেতু জ্ঞান ও

সুখ-দুঃখাদির কারণ ভিন্ন সেহেতু সুখ-দুঃখাদি জ্ঞানের সঙ্গে অভিন্ন তা অসিদ্ধ হয় ।[১২] কাজেই সুখ-দুঃখাদি জ্ঞানস্বরূপ বৌদ্ধদের এই মত গ্রহণযোগ্য নয় । আচার্য উদয়নের মতে সুখ, দুঃখ, ক্রোধ ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা তাদের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই জন্মে। কিন্তু তার হেতু হচ্ছে তাদের তীব্র সংবেদিতা ধর্ম ।[১৩] সুখাদি সম্পর্কে সচেতনতা সাক্ষাৎকারাত্মক হওয়ায় তা ভ্রম হতে পারে না । কিন্তু যারা সুখাদিকে জ্ঞানস্বরূপ বলে স্বীকার করেন তাঁদের দর্শনে সাক্ষাৎকারাত্মক অর্থে সুখাদি স্বীকৃত না হওয়ায় সুখাদি ভ্রম হতে পারে বলে স্বীকার করতে হয় ।[১৪] কাজেই উদয়নের মতে, সুখাদি জ্ঞান স্বরূপ হতে পারে না ।

জ্ঞান স্বপ্রকাশ বলে স্বীকার না করলে জ্ঞান জড়তে পরিণত হবে এই যুক্তির বিরুদ্ধে নৈয়ায়িকগণ বলবেন যে জ্ঞানের নিজস্ব ধর্ম স্বপ্রকাশত্ব নয় । একথা স্বীকার না করলে ভাববাদকে স্বীকার করতে হবে । কারণ সে পক্ষে জড় ও অজড় বস্তুর মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ ভেদ স্বীকার করা হয় । জ্ঞান জড়ের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারবে না যদি না জড় বস্তুটি আন্তর বস্তুতে রূপান্তরিত হয় । ফলে জড় জগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করতে হয় । তার ফলস্বরূপ বাহ্য জগৎ বা বাহ্যবস্তুর জ্ঞানের জন্য অপরিহার্যরূপে গণ্য হয় না । কিন্তু অপরের প্রকাশক হচ্ছে জ্ঞান । জড় বস্তু অপরকে প্রকাশ করতে সমর্থ নয় । তাই সেই দিক থেকে জড় ও জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য আছে স্বীকার করতে হয় ।

প্রভাকর বৌদ্ধ মতের সমর্থনে তিনরকম বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য করেন– একান্ত জড় যেমন ঘট, যার প্রকাশক দ্বিবিধ প্রদীপ এবং চক্ষু । কোন কোন বস্তু কেবলমাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল যেমন প্রদীপ । কোন কোন বিষয় আবার স্বপ্রকাশ ।

নিজের প্রকাশের জন্য বিষয়ান্তরের উপর নির্ভরশীল নয় যেমন জ্ঞান । ভাসর্বজ্ঞের মতে জ্ঞানকে যদি প্রদীপের মত বলা হয় তাহলে জ্ঞানও প্রকাশের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল বলতে হবে । কারণ তাঁর মতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ছাড়া প্রদীপাদি কোন কিছুই প্রকাশিত হতে পারে না ।[১৫] তাঁর মতে, প্রভাকরের মত অসিদ্ধ দোষে দুষ্ট। কারণ জ্ঞানের স্বপ্রকাশত্ব ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাকেই স্বীকার করে নিয়ে তার ভিত্তিতে জ্ঞান মাত্রই স্বপ্রকাশ তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন ।[১৬]

ভাট্টসম্মত জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমিতি খণ্ডন–

জ্ঞানের প্রকাশ বিষয়ে পরতঃপ্রকাশবাদের অন্যতম সমর্থক ভাট্ট মীমাংসক । ভাট্টগণ জ্ঞানের প্রকাশ বিষয়ে জ্ঞাততা লিঙ্গক অনুমিতি স্বীকার করেন । এই মতের মূল বক্তব্য গুলি হল– ১) জ্ঞান হল একধরণের ক্রিয়া ২) জ্ঞান অনুমানের দ্বারা গৃহীত হয় । ৩) জ্ঞান জন্য বিষয়ে উৎপন্ন জ্ঞাততা বা প্রকাট্যের দ্বারা জ্ঞানের অনুমান হয়ে থাকে । ৪) জ্ঞান অনুমিত হলেও জ্ঞাততা বা প্রাকট্য প্রত্যক্ষগ্রাহ্য । ৫) জ্ঞাততা জ্ঞান জন্য বিষয়ে আবির্ভূত হয় ।

জ্ঞান বিষয়ে একটি নতুন ধর্মের আবির্ভাব ঘটায় তাই জ্ঞাততা বা প্রাকট্য । জ্ঞান বিষয়ে নতুন কোন ধর্মের উৎপত্তি ঘটাতে পারে না নৈয়ায়িক পক্ষ থেকে এই আপত্তি করা যায় না । কেননা নৈয়ায়িকরাও ‘একটি ঘট’, ‘একটি ঘট’ এই আকারের অপেক্ষা বুদ্ধি জন্য দ্বিত্বের উৎপত্তি স্বীকার করেন । অপেক্ষা বুদ্ধি জন্য উৎপন্ন এই দ্বিত্ব একটি নতুন ধর্ম এবং তার ব্যবহার অস্বীকার করা যায় না । কাজেই দ্বিত্বাদি ধর্মের মত জ্ঞাততাও বিষয়ে জ্ঞান জন্য আবির্ভূত হয় একথা অস্বীকার করা যায় না । কিন্তু জ্ঞাততা বা প্রাকট্যকে ন্যায় সম্মত দ্বিত্বাদি সংখ্যার সঙ্গে অভিন্ন ধর্ম বলার বিরুদ্ধে

আপত্তি উঠতে পারে । ন্যায় সম্মত দ্বিত্বাদি ধর্ম ও ভাট্ট সম্মত প্রাকট্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য আছে । ধরা যাক্ x এবং y এই দুটি বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 'অয়ম্ একঃ' 'অয়ম্ একঃ'– এইরূপে অপেক্ষা বুদ্ধি জন্মায় । এই অপেক্ষাবুদ্ধি জন্য ঈশ্বর, অদৃষ্ট ইত্যাদি কারণ হেতু x এবং y– এ দ্বিত্ব সংখ্যা উৎপন্ন হয় । x এবং y এই দ্বিত্ব সংখ্যার সমবায়ি কারণ হল x-এ 'অয়ম্ একঃ' বুদ্ধি ও y- এ 'অয়ম্ একঃ' বুদ্ধি । এরূপ ক্ষেত্রে অপেক্ষাবুদ্ধিই x ও y নিষ্ঠ দ্বিত্ব সংখ্যার নিমিত্ত কারণ । x ও y এর প্রত্যেকটিতে যে একত্ব সংখ্যা আছে সেটি হল তার অসমবায়ী কারণ । অন্যান্য ত্রিত্বাদি সংখ্যার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য । কাজেই দেখা যাচ্ছে দ্বিত্ব ধর্ম যে দুই সংখ্যার মধ্যে উৎপন্ন হয় তা সেই দুটি সংখ্যার মধ্যে পর্যাপ্তি সম্বন্ধে থাকে । অর্থাৎ দ্বিত্বাদি ধর্ম পর্যাপ্তি সম্বন্ধে উভয় সংখ্যা নিষ্ঠ । কিন্তু প্রাকট্য বা জ্ঞাততার ক্ষেত্রে তা হয় না । ভাট্ট মতে, প্রাকট্য বা জ্ঞাততা হল বিষয় নিষ্ঠ ধর্ম । কাজেই দ্বিত্বাদি ও জ্ঞাততার মধ্যে পার্থক্য আছে । কাজেই একের দৃষ্টান্তে অন্যটিকে স্বীকার করার প্রশ্ন ওঠে না ।

ভাট্টগণ বলতে পারেন যে, ব্যবহার জ্ঞান সাপেক্ষ । কেননা একান্ত অজ্ঞাত পদার্থের ব্যবহার সম্ভব হয় না । জ্ঞানরূপ ক্রিয়া স্থলে তাই বলা যায় জ্ঞান ক্রিয়ার ফল হল বিষয়ের ব্যবহারযোগ্যতা । কাজেই তাঁরা বলতে পারেন বিষয়ের জ্ঞাততারূপ ধর্ম বলতে এই ব্যবহাররূপ অর্থকেই বুঝতে হবে । কিন্তু এরূপ যুক্তিও যথাযথ নয় । কেননা এখানে বিষয়ের ব্যবহার বলতে বিষয়ের ব্যবহারযোগ্যতাকে বোঝায়, যা জ্ঞানজন্য । কিন্তু সেই ব্যবহারযোগ্যতা বিষয়তা অতিরিক্ত । কেননা জ্ঞানের বিষয়তা বলতে বোঝায় বিষয়ের সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধকে । সেই সম্বন্ধের সম্বন্ধী হল জ্ঞান । ফলে বিষয়তারূপ সম্বন্ধ জ্ঞানের ফল বা জ্ঞাততা হতে পারে না । কারণ জ্ঞানের ফল হলে তা জ্ঞানের পরেই উৎপন্ন হত । কিন্তু জ্ঞান ও বিষয়ের সম্বন্ধ জ্ঞান উৎপত্তিকালেই থাকে ।

যদি তা জ্ঞানের ফল হোত জ্ঞানের উৎপত্তি ক্ষণে তা থাকত না । আর যদি জ্ঞান ও বিষয়ের সম্বন্ধকে জ্ঞান জন্য ফল বলা হয় তাহলে জ্ঞান উৎপত্তি ক্ষণে সেই সম্বন্ধ থাকতে পারে না বলতে হয় । কাজেই সেক্ষেত্রে জ্ঞান সেই উৎপত্তিক্ষণে বিষয় শূণ্য থাকে- একথা স্বীকার করতে হয় । কিন্তু তা স্বীকার করা যায় না । কেননা বিষয়শূণ্য জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না । কাজেই বিষয়তারূপ ধর্ম জ্ঞানজন্য বা জ্ঞানের ফল - একথা বলা যায় না । বিষয়তা অর্থাৎ জ্ঞান ও বিষয়ের সম্বন্ধ এবং জ্ঞান একই সঙ্গে উৎপন্ন হয় । জ্ঞানজন্য বিষয়ে উৎপন্ন হয় যে জ্ঞাততা সেই জ্ঞাততাকে হেতু করে অনুমানের দ্বারা জ্ঞানের প্রকাশতত্ত্ব নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক আরও বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচিত হয়েছে ।

ভাট্ট মতে, জ্ঞান প্রত্যক্ষযোগ্য নয়, যেহেতু তা ক্রিয়া এবং ক্রিয়া মাত্রই অতীন্দ্রিয়। জ্ঞান ক্রিয়া ভাট্ট স্বীকৃত এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পূর্বে জয়ন্ত ভট্টের কথা বলা হয়েছে । জয়ন্ত ভট্ট ‘ন্যায়মঞ্জরী’ গ্রন্থে বলেছেন ধাতুর অর্থ মাত্রই ক্রিয়া হবে এমম নয় । কেননা এই নিয়মের ব্যভিচার আছে । ‘গডি’ ধাতুর প্রসঙ্গ তুলে তিনি দেখিয়েছেন ‘গডি’ ধাতুর অর্থ বদনৈকদেশ, যা ক্রিয়া নয় । কাজেই ধাতুর অর্থ মাত্রই ক্রিয়া না হওয়ায় ‘জ্ঞা’ ধাতুর অর্থ জ্ঞান, ক্রিয়া হবে এরূপ স্বীকার করা যায় না । জয়ন্ত ভট্টের মতে, জ্ঞান ও ক্রিয়া দুটি সম্পূর্ণ পৃথক্ ঘটনা । তাসত্ত্বেও যদি একথা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, জ্ঞান ক্রিয়া, তাহলেও জ্ঞানের প্রকাশ জ্ঞাততা লিঙ্গক অনুমিতিগম্য এইরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত নয় । জ্ঞান ক্রিয়া হলে, ক্রিয়াজন্য জ্ঞান নিয়তই অতীন্দ্রিয় বা পরোক্ষ হবে । আর জ্ঞান মাত্রই যদি অতীন্দ্রিয় হয়, তাহলে পূর্বোক্ত জ্ঞান সাধ্যক জ্ঞাততা হেতুক অনুমিতিও সম্ভব নয় । কেননা সেক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞানই সম্ভব নয় । ব্যাপ্তি জ্ঞান হল, হেতু ও সাধ্যের সামানাধিকরণ্যরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান । এই সম্বন্ধের জ্ঞান

সাক্ষাৎ অনুভূতিলব্ধ, পরোক্ষ বা অতীন্দ্রিয় নয় । শুধু তাই নয় এইরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধের সম্বন্ধী অতীন্দ্রিয় হতে পারে না । ব্যাপ্তিরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধের জ্ঞান থেকে যা অনুমিত হয় সেটি সাক্ষাৎ প্রতীতিলব্ধ বিষয়ই হতে পারে । যদিও আত্মাদি অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অনুমান সম্ভব হয় । কিন্তু সেক্ষেত্রে সামান্যতঃ ব্যাপ্তির ভূমিকা স্বীকার করতে হয় । প্রকৃত হেতু সাধ্যের ব্যাপ্তি নিশ্চয় সম্ভব না হলে সামান্যভাবে গৃহীত উদাহরণের সাহায্যে হেতুসজাতীয়সামান্যের সঙ্গে সাধ্যসজাতীয় সামান্যের ব্যাপ্তি গৃহীত হয় । কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্রে জ্ঞানজন্য যে ফল তা অদৃষ্ট হওয়ায় তার সামান্যতঃ ব্যাপ্তির গ্রহণও সম্ভব নয় । জ্ঞান মাত্রই ক্রিয়া হওয়ায়, অনুমিতির কারণ ব্যাপ্তি জ্ঞান যা স্বরূপতঃ জ্ঞান তাও ক্রিয়া হবে । কিন্তু ক্রিয়া জন্য প্রাকট্যরূপ ফল বাহ্যকারক বা বাহ্যপদার্থগুলিতে প্রত্যক্ষগোচর হয় না । ফলস্বরূপ কোন বাহ্যকারক ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ দৃষ্টান্ত হয় না[১৭]– এই যুক্তিতে বাহ্যকারক দৃষ্টান্ত না হওয়ায়, দৃষ্টান্তের অভাবে হেতু ও সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তি গ্রহণ হয় না এবং ব্যাপ্তির অভাবে বা কারণাভাবে অনুমিতিও হতে পারে না । কাজেই জ্ঞান মাত্রকেই ক্রিয়া বলা হলে জ্ঞানের প্রকাশক অনুমিতিও সম্ভব হবে না ।

ভাট্ট মতে সকর্মক ক্রিয়া মাত্রই কর্মের মধ্যে বা বিষয়ের মধ্যে কিছু একটা বা কোন কিছু ফলের জন্ম দেয় । মূলতঃ যে অনুমানের আধারে ভাট্টগণ জ্ঞান ক্রিয়া জন্য জ্ঞাততা স্বীকার করেছেন সেটি হল– 'জ্ঞানক্রিয়া কর্মনিষ্ঠ কিঞ্চিজ্জনিকা সকর্মক ক্রিয়াত্বাৎ' । অর্থাৎ জ্ঞান ক্রিয়া কর্মের মধ্যে কিছু একটা উৎপন্ন করে যেহেতু তাতে সকর্মক ক্রিয়াত্ব আছে । সকর্মক ক্রিয়া মাত্রই কর্মের মধ্যে কিছু করে– এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপর নির্ভর করে ভাট্টগণ জ্ঞানে কিঞ্চিজ্জনিকা বা কিছু একটা উৎপন্ন করে এই অর্থে জ্ঞাততা স্বীকার করেন । কিন্তু জ্ঞানে ক্রিয়াত্ব থাকে এবং জ্ঞান ক্রিয়ার ফল হল জ্ঞাততা ভাট্টদের এরূপ যুক্তির বিরুদ্ধে ন্যায়কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নও যুক্তি

দিয়েছেন । উদয়নের মতে ‘ক্রিয়া’ শব্দের অর্থ হতে পারে– ধাত্বর্থ, স্পন্দন বা গতি, ব্যাপার, ফল, আশুবিনাশী ধর্ম, আশুকারক প্রভৃতি । কিন্তু জ্ঞানকে ক্রিয়া বলে স্বীকার করলে এই অর্থের কোনটিই জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না । আবার কোন কোন ক্রিয়াতে পূর্বোক্ত কোন ধর্ম থাকলেও সর্বদা সেই ক্রিয়া কর্মনিষ্ঠ কোন ধর্মের জনক হয় না বা ক্রিয়ার দ্বারা বিষয়ে কোন ফল জন্মায় না । কাজেই ভাট্ট মত মেনে জ্ঞান ক্রিয়া ও জ্ঞানরূপ ক্রিয়া জন্য বিষয়ে জ্ঞাততারূপ ফল স্বীকার করা যায় না । যেমন উদয়নের মতে, ধাত্বর্থ বা ধাতুর অর্থ হল ক্রিয়া– ক্রিয়ার এরূপ অর্থ স্বীকার করা হলে ‘শরেণ গগনং যুনক্তি’– এরূপ স্থলে সংযোগরূপ যে ক্রিয়া সেই ক্রিয়ায় ধাত্বর্থ থাকলেও সেই সংযোগরূপ ক্রিয়ার দ্বারা গগণে কোনরূপ ফল জন্মায় না ।[১৮] কাজেই এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যেটি ক্রিয়া অথচ তার কিঞ্চিজ্জনকত্ব থাকে না । ফলে কোন কিছু ক্রিয়া হলে সেই ক্রিয়া বিষয়ে ফল উৎপন্ন করবে – এই নিয়মের ব্যভিচার থেকে যায় ।

‘ক্রিয়া’ শব্দের অর্থ যদি হয় স্পন্দ বা গতি তাহলে জ্ঞানরূপ পক্ষে স্পন্দ বা গতিরূপ ক্রিয়াত্ব হেতু থাকে না ।[১৯] কেননা ন্যায় মতে, জ্ঞান হল গুণ পদার্থ । যে হেতু আশ্রয় বা পক্ষে থাকে না, তা স্বরূপাসিদ্ধ । কাজেই জ্ঞানকে ক্রিয়া বলে স্বীকার করলে সেই জ্ঞানরূপ পক্ষে স্পন্দরূপ ক্রিয়াত্ব হেতু না থাকায় স্বরূপাসিদ্ধি দোষ দেখা যায় ।

‘ক্রিয়া’ শব্দের অর্থ যদি করা হয় ব্যাপার তাহলে এই ব্যাপাররূপ ক্রিয়াত্ব হেতুটি ইন্দ্রিয়, অনুমান, শব্দ প্রভৃতি প্রমাণে থাকতে পারে । কিন্তু এই সমস্ত প্রমাণের ব্যাপার জ্ঞানরূপ যে ফলের জনক হয় সেই ফলের আশ্রয় হল প্রমাতা বা জ্ঞাতা । জ্ঞাতার মধ্যেই বা আত্মাতেই জ্ঞান জন্মায়, প্রমেয় বা বিষয়ে জ্ঞান জন্মায় না ।[২০] ফলে এই সমস্ত প্রমাণে ব্যাপাররূপ ক্রিয়াত্ব থাকলেও বিষয়নিষ্ঠ কিঞ্চিজ্জনকত্বরূপ ধর্ম থাকে না ।

উদয়নের মতে, 'ক্রিয়া' শব্দের অর্থ যদি ধরা হয় ফল তাহলে সেই অর্থও অভিপ্রেত নয় । কেননা সেই অর্থে ক্রিয়াকে গ্রহণ করলেও কর্মনিষ্ঠকিঞ্চিজ্জনকত্বরূপ ধর্ম দেখানো যায় না । ফলে নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ায় ব্যভিচার দোষ হয় । যেমন 'পাক্' প্রভৃতি ক্রিয়া স্থলের কথাই ধরা যাক্ । 'পাক্' ক্রিয়া বিক্লিত্যাদি ফলের জনক হয় । তাই 'পাক্' প্রভৃতি ক্রিয়াতে ফলরূপ ক্রিয়াত্ব আছে কিন্তু কর্মনিষ্ঠ কিঞ্চিজ্জনকত্ব ধর্ম নেই । কেননা সেই 'পাক্' কর্ম স্থলে বিক্লিত্যাদি ফল আছে কিন্তু কর্মনিষ্ঠ কিঞ্চিজ্জনকত্ব বা কর্মে কিছু একটা ফলের উৎপত্তি স্বীকার করা যায় না । যদি কর্মে কিছু একটা ফল জন্মায় স্বীকার করা হয় তাহলে সেই যে ফলটি উৎপন্ন হল সেটিতেও ক্রিয়াত্ব ধর্ম থাকবে । যেহেতু ক্রিয়াত্ব বলতে ফলকেই বোঝানো হয়েছে । এখন সেই ফলরূপ ক্রিয়াও পুনরায় ফলান্তরের জনক হবে এবং সেই ফলটিও কর্মে ফলের জনক হবে– এভাবে অনবস্থা দোষ দেখা দেবে ।[২১] কাজেই 'পাক্' প্রভৃতি স্থলে ফলরূপ ক্রিয়াত্ব স্বীকার করা গেলেও কর্মনিষ্ঠ কিঞ্চিজ্জনকত্ব স্বীকার করা যায় না । ফলে ক্রিয়াতে কর্মনিষ্ঠ কিঞ্চিজ্জনকত্ব থাকবে বা ক্রিয়া বিষয়ে ফল জন্মাবে এই নিয়মের ব্যভিচার দোষ দেখা যায় ।

'ক্রিয়া' শব্দের অর্থ হতে পারে আশুবিনাশী ধর্ম । যা চতুর্থক্ষণ বিনাশী তাই আশুবিনাশী এবং তাতে থাকে আশুবিনাশী ধর্ম । দ্বিত্বাদি সংখ্যা যেহেতু অপেক্ষাবুদ্ধিনাশনাশ্য কাজেই দ্বিত্বাদি সংখ্যাতে আশুবিনাশী ধর্ম থাকে । দ্বিত্বাদি সংখ্যা বিশিষ্ট বস্তুর অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ হলেই পরবর্তীক্ষণে দ্বিত্বাদি সংখ্যারও নাশ হয় । কিন্তু সেই দ্বিত্বাদি সংখ্যাতে আশুবিনাশী ধর্ম থাকলেও কর্মনিষ্ঠ কিঞ্চিজ্জনকত্ব নেই ।[২২] ফলে একইভাবে ক্রিয়াতে কর্মনিষ্ঠ কিঞ্চিজ্জনকত্ব থাকবে বলা হলে এই নিয়মের দ্বিত্বাদি সংখ্যাতে ব্যভিচার হয়ে থাকে ।

'ক্রিয়া' শব্দের অর্থ যদি করা হয় আশুকারক বা আশু উৎপাদক সেক্ষেত্রে অনুমানের আকারটি হয় 'জ্ঞান ক্রিয়া কর্মনিষ্ঠকিঞ্চিজ্জনিকা আশুকারাৎ' । এখন প্রশ্ন হল এই আশুকারত্ব কর্মনিষ্ঠ নাকি কর্তৃনিষ্ঠ ? যদি কর্মনিষ্ঠাশুকারত্বকে হেতু করা হয় তাহলে সিদ্ধসাধন দোষ হবে । কেননা উক্ত অনুমানে কর্মনিষ্ঠাশুকারত্বকে হেতু করায় তা পক্ষে সিদ্ধ না হলে সাধ্যসাধনে ব্যর্থ । পুনরায় কর্মনিষ্ঠকিঞ্চিজ্জনকত্বকে অনুমানের সাধ্য করলে সিদ্ধসাধন অনিবার্য হয় ।[২৩] অন্যদিকে কর্তৃনিষ্ঠাশুকারত্বকে হেতু করা হলে সেই হেতুর সঙ্গে কর্মনিষ্ঠকিঞ্চিজ্জনকত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ থাকে না । কেননা শব্দাদি প্রমাণ ব্যাপার কর্তৃনিষ্ঠ আশুকারক হলেও তাতে কর্মনিষ্ঠকিঞ্চিজ্জনকত্ব না থাকায় পুনরায় ব্যভিচার দোষ দেখা যায় । ব্যভিচার থাকায় উভয়ের মধ্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে 'ক্রিয়া' শব্দের যে অর্থেই গ্রহণ করা হোক না কেন ভাট্ট মত মেনে তার দ্বারা কর্মনিষ্ঠ কিঞ্চিজ্জনকত্ব প্রমাণ করা যায় না । ফলতঃ জ্ঞান রূপ ক্রিয়া বিষয়ে জ্ঞাততারূপ ফল উৎপন্ন করে এই মতও গ্রহণযোগ্য নয় ।

ভাট্টমতে, জ্ঞান অতীন্দ্রিয়– ভাট্ট মীমাংসকের এই মতই, উদয়নের মতে, সিদ্ধ নয় । আচার্য উদয়নের মতে, জ্ঞানে অতীন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধ হবে কীভাবে ? যদি বলা হয় 'জ্ঞানম্ অতীন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়েণানুপলভ্যমানত্বাৎ', তাহলেও জ্ঞানের অতীন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধ হতে পারে না । কেননা, কেবল অনুপলব্ধি নয়, যোগ্যতাবিশিষ্টের অনুপলব্ধিই, অভাব জ্ঞানের কারণ । মূল কথা এই যে, যে বস্তুর উপলব্ধির যোগ্যতা নেই, যা শশশৃঙ্গাদির ন্যায় অলীক, সেই সব বস্তু, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুপলভ্য হলেও, সেগুলির অভাব স্বীকারে বা তাদের অতীন্দ্রিয় বলার কোন অর্থই হয় না । ঘটাদি যেসমস্ত বস্তুর প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধির যোগ্যতা আছে, তাদের অনুপলব্ধি বশতঃ অভাব আছে এরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত । অন্যথায় কেবল ইন্দ্রিয়ানুপলব্ধিকে অভাবের হেতু করা হলে পরমাত্মা ঈশ্বর,

পরমাণু প্রভৃতির অভাব সিদ্ধ হয়ে যাবে । কেননা পরমাত্মা ঈশ্বর কিংবা পরমাণু প্রভৃতির ইন্দ্রিয়ানুপলব্ধি সম্ভব হয় না । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইন্দ্রিয়ানুপলব্ধি না হওয়া সত্ত্বেও এদের অস্তিত্ব আছে একথাই স্বীকৃত হয় । কাজেই কেবল ইন্দ্রিয়ানুপলব্ধি অভাবের নিশ্চায়ক নয় । যার অভাব অর্থাৎ প্রতিযোগী যদি উপলব্ধির যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তার উপলব্ধি না হয় তখন সেই পদার্থের অভাব আছে বলা হয় । এইরূপ স্বীকার করা হলে জ্ঞানের অতীন্দ্রিয়ত্ব সম্ভব নয় । কেননা, জ্ঞানকে অতীন্দ্রিয় বলা হলে প্রতিযোগী যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানের উপলব্ধিযোগ্যতারূপ বিশেষণ স্বীকার করতে হবে । জ্ঞান যদি ইন্দ্রিয় উপলব্ধিরযোগ্য হয় তখন তাকে আর অতীন্দ্রিয় বলা যাবে না । ফলে জ্ঞানে যদি উপলব্ধিযোগ্যতা স্বীকার করা হয় তাহলে জ্ঞানকে আর অতীন্দ্রিয় বলা যায় না ।[২৪] কাজেই জ্ঞান মাত্রের অতীন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধিতে তৎ তৎ জ্ঞানের উপলব্ধি বা উপলব্ধিযোগ্যতা স্বীকৃত হলে, জ্ঞান মাত্রই অতীন্দ্রিয় একথা বলা যায় না ।

জ্ঞানের অতীন্দ্রিয়ত্ব প্রমাণে ভাট্টগণ, ‘জ্ঞানম্ অতীন্দ্রিয়ং প্রত্যক্ষভূত জ্ঞাততাশ্রয়ত্বাৎ’ – এইরূপ প্রত্যক্ষভূত জ্ঞাততাশ্রয়ত্ব হেতুক অনুমানের সাহায্য নিতে পারেন । কিন্তু এক্ষেত্রে আশ্রয়াসিদ্ধ দোষ দেখা দেবে । কেননা জ্ঞান রূপ আশ্রয়ই এখানে অসিদ্ধ ।[২৫] যদি বলা হয় কোন বস্তু ব্যবহারের জন্য সেই বস্তুর জ্ঞান আবশ্যক হয় তাহলে একইভাবে জ্ঞানের ব্যবহারের জন্য জ্ঞানের জ্ঞান আবশ্যক হয় । জ্ঞানের জ্ঞান না হলে জ্ঞানের ব্যবহার সম্ভব নয় । ফলে সেই জ্ঞানকে পক্ষ করলে পক্ষাসিদ্ধ দোষ হবে না । উদয়নের মতে, সেটিও সর্বদা বলা যাবে না । কেননা জ্ঞানের হেতু দ্বারাও ব্যবহার সিদ্ধ হয় ।[২৬] অর্থাৎ যেসমস্ত কারণের দ্বারা কোন বিষয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত কারণের দ্বারাই সেই বস্তুর ব্যবহার সম্ভব হয় । কাজেই সেই সব ক্ষেত্রে বিষয়ের ব্যবহারের প্রতি জ্ঞানের কারণতা স্বীকৃত নয়, যেমন স্মরণ স্থলীয় ব্যবহার ।

তাঁর মতে, স্মৃতির কারণ যে সংস্কার, সেই সংস্কারের দ্বারাই স্মরণ ব্যবহারের উপপত্তি হয় । এই ব্যবহারের প্রতি জ্ঞান কারণ নয় । কাজেই সেই জ্ঞানকে পক্ষ করে কোন অনুমান করলে সেই অনুমানে আশ্রয়াসিদ্ধি অনিবার্য হয় । কিন্তু ভাট্টগণ বলতে পারেন সুষুপ্তিকালে জ্ঞানের কারণ আত্ম-মনঃ-সংযোগাদি থাকলেও ব্যবহার হয় না । কাজেই জ্ঞানের কারণ ব্যবহারের হেতু একথা ঠিক নয় । এর সমাধানে বলা হয় কেবল আত্ম-মনঃ-সংযোগ জ্ঞানের প্রতি কারণ নয় । অন্যান্য কারণ বিশেষের অভাব থাকায় সুষুপ্তিকালে ব্যবহার সম্ভব হয় না । কাজেই পূর্বোক্ত আশ্রয়াসিদ্ধির আপত্তির জন্য ভাট্ট কর্তৃক প্রদত্ত অনুমানের দ্বারা জ্ঞানের অতীন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয় না ।

উদয়নাচার্যের মতে, জ্ঞান মাত্রের প্রকাশের নিমিত্ত জ্ঞাততা স্বীকারে মীমাংসকগণ এই যুক্তি দিতে পারেন যে, অপ্রতীত বা অজ্ঞাত বিষয়ের ব্যবহার হতে পারে না । কাজেই জ্ঞানের ব্যবহার উপপাদনের নিমিত্তও জ্ঞানের প্রতীতি স্বীকার্য এবং সেই জ্ঞানের প্রতীতির অনুরোধে জ্ঞাততা স্বীকার্য । অর্থাৎ, জ্ঞানজন্য জ্ঞাততা স্বীকার করলে, তার দ্বারা জ্ঞানের অনুমান যেমন সম্ভব হয় তেমনি জ্ঞানের ব্যবহারও সম্পন্ন হয় । এইরূপে জ্ঞান ব্যবহারের অন্যথানুপত্তিবশতঃ জ্ঞাততাকে কল্পনা করে নিতে হয় ।[২৭] কিন্তু, উদয়নাচার্যের মতে, এই জাতীয় যুক্তিও ত্রুটিমুক্ত নয় । কেননা পূর্বোক্ত মীমাংসক ব্যাখ্যা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, জ্ঞাততা হেতুর দ্বারা যেমন জ্ঞান অনুমিত হয় তেমনি জ্ঞান অনুমিত হলে জ্ঞানের ব্যবহার হয় । সেই ব্যবহারের অন্যথানুপপত্তিবশতঃ আবার জ্ঞাততা স্বীকার্য হয় । অর্থাৎ জ্ঞাততার দ্বারা যে জ্ঞান অনুমিত হয় সেই জ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞাততার অনুমান স্বীকার্য হওয়ায় পরস্পরাশ্রয় দোষ প্রশ্রয় পায় ।[২৮]

জ্ঞাততাকে লিঙ্গ করে জ্ঞানরূপ পক্ষে প্রকাশতত্ত্ব সাধনে সমস্যা আরো আছে । জ্ঞাততা হেতুক জ্ঞানের অনুমিতিত্ব স্বীকার করলে পক্ষধর্মতার অভাববশতঃ বা জ্ঞানরূপ পক্ষে জ্ঞাততা ধর্মের অভাববশতঃ অনুমিতি সম্ভব নয় । জ্ঞানে জ্ঞাততা ধর্মের দ্বারা তার প্রকাশত্ব অনুমিতিগম্য একথা স্বীকার করলে সেই অনুমিতির অনুরোধে পক্ষধর্মতার জ্ঞান আবশ্যক হয় । কিন্তু এই জ্ঞাততারূপ ফল প্রত্যক্ষগোচর না হওয়ায়, সেই জ্ঞাততারূপ হেতুর পক্ষে বৃত্তিত্ব তথা পক্ষধর্মতা জ্ঞান সম্ভব নয় । জয়ন্ত ভট্টের মতেও,- ‘ইহ তু বাহ্যকারকেস্বপি ন তৎপূর্বকং ফলং দৃষ্টমিত্যুক্তম্’ ।[২৯] অর্থাৎ বাহ্য কারক বা পদার্থগুলির উপর জ্ঞানক্রিয়া জন্য জ্ঞাততারূপ ফল দেখা যায় না । ফলে হেতু বা জ্ঞাততারূপ ফল পক্ষে অপ্রত্যক্ষগোচর হওয়ায় পক্ষধর্মতার জ্ঞানের অভাববশতঃ অনুমিতিও সম্ভব নয় । তাছাড়া যদি জ্ঞান স্ববিষয়ে জ্ঞাততা নামক কোনো ধর্ম উৎপন্ন করে তবেই তার প্রকাশ সম্ভব হয়, তাহলে অতীত বা ভবিষ্যৎ পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানজন্য যে জ্ঞাততা তা বর্তমানে সেই সব বিষয়ের অভাববশতঃ নিরাশ্রয় রূপে গণ্য হয় । অর্থাৎ জ্ঞাততা বর্তমান বস্তুতে উৎপন্ন হলেও অতীত ও অনাগত বিষয়ক জ্ঞান বর্তমানে বিনষ্ট হয়ে যাওয়ায়, জ্ঞাততার আশ্রয়াভাব বশতঃ, তার দ্বারা ঐ সমস্ত পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানপ্রকাশ আর কখনো সম্ভব হতো না ।[৩০] কিন্তু অতীত বা ভবিষ্যৎ পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানের প্রকাশও সম্ভব হয় । কাজেই ভাট্ট স্বীকৃত জ্ঞাততাকে লিঙ্গ করে জ্ঞানের প্রকাশতত্ত্ব যুক্তি সঙ্গত নয় ।

তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায় জ্ঞাততা লিঙ্গক অনুমিতির বিরুদ্ধে ভিন্ন যুক্তির অবতারণা করেছেন । তাঁর মতে, মীমাংসক কুমারিল ভট্ট জ্ঞাততাকে প্রত্যক্ষযোগ্য বলায়, জ্ঞাততা বা প্রাকট্যরূপ হেতুটি, যার দ্বারা জ্ঞান অনুমিত হয়, তা ব্যভিচার দোষাক্রান্ত হয়েছে । কেননা ভাট্ট মতে, জ্ঞানজন্য যে জ্ঞাততা তা স্ববিষয়ক হয়ে থাকে।

এখন স্ববিষয় পদার্থে বিশেষ্য, প্রকার ও সংসর্গ বিষয়রূপে স্বীকৃত হয়ে থাকে । একই নিয়মে জ্ঞাততারও বিশেষ্য, প্রকার ও সংসর্গ এই তিনটিই বিষয় স্বীকার করতে হবে । জ্ঞানের ন্যায় জ্ঞাততারও স্ববিষয়কত্ব ও ত্রিবিষয়কত্ব অর্থাৎ বিশেষ্য, প্রকার ও সংসর্গ স্বীকৃত হওয়ায় একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে জ্ঞাততাও একটি জ্ঞান । অথচ ভাট্ট মীমাংসক ও তাঁর অনুগামীরা জ্ঞানের প্রকাশে জ্ঞাততা লিঙ্গক অনুমিতি আবশ্যক বললেও জ্ঞাততারূপ জ্ঞানের প্রকাশ জ্ঞাততা লিঙ্গক অনুমিতিগম্য বলেন না, তাকে তাঁরা প্রত্যক্ষযোগ্য বলে স্বীকার করেছেন । এমতাবস্থায় জ্ঞান মাত্রই জ্ঞাততা লিঙ্গক অনুমিতিগম্য বললে সেই অনুমান ব্যভিচার দোষে দুষ্ট হয় । কেননা যে জ্ঞাততাকে হেতু করে জ্ঞানের প্রকাশের কথা বলা হয়েছে সেই জ্ঞাততা, জ্ঞাততা রূপ ধর্ম জ্ঞানে থাকে না । সেই জ্ঞাততাকে, ভাট্ট মতে, প্রত্যক্ষগ্রাহ্য বলে স্বীকার করা হয়েছে । আর যেহেতু জ্ঞাততাকে ভাট্ট প্রত্যক্ষাত্মক বলেছেন, সেহেতু চিন্তামণিকারের মতে, সেই জ্ঞাততা লিঙ্গক অনুমিতিতে ব্যভিচার দোষ হয়েছে । এইরূপে জ্ঞাততা লিঙ্গক অনুমিতিতে ব্যভিচার থাকায় জ্ঞাততা লিঙ্গক অনুমিতি সম্ভব নয় ।[৩১]

তথ্যসূত্র

১. ঝা, গঙ্গানাথ, *দি প্রভাকর স্কুল অফ পূর্ব মীমাংসা,* ১৯১১, পৃ. ২৩-২৬.

২. প্রসঙ্গত বলা আবশ্যক জ্ঞানের প্রমাণ্য গ্রহণ প্রশ্নেও প্রভাকর স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ স্বীকার করেছেন । তাই ভ্রম ব্যবহার স্থলেও জ্ঞানকে তিনি প্রমা বলে স্বীকার করেছেন । কেননা তাঁর ব্যাখ্যা অনুযায়ী ভ্রম ব্যবহার স্থলেও জ্ঞাতার দ্বিবিধ জ্ঞান হয়ে থাকে এবং সেই দ্বিবিধ জ্ঞানই যথার্থ । ভুল হয় আমাদের ব্যবহারে । যেমন রজ্জুতে সর্প ব্যবহার স্থলে 'এটি সর্প' – এইরূপে যে ভ্রম ব্যবহার হয় প্রকৃতপক্ষে সেই স্থলে দুটি জ্ঞান আমাদের হয়ে থাকে । একটি 'এটি'-র জ্ঞান যেটি প্রত্যক্ষলব্ধ এবং যথার্থ । অন্যটি 'সর্পত্ব'-এর জ্ঞান যেটি স্মরণাত্মক জ্ঞান । সেই স্মৃত্যাত্মক জ্ঞানটিও যথার্থ । আসলে দৈর্ঘ্য, রঙ প্রভৃতি নানা সাদৃশ্যের কারণে রজ্জুত্ব বিশিষ্ট স্থলে সর্পত্বের ব্যবহার করে ভ্রম হয় । অর্থাৎ ভ্রম ব্যবহারেই হয়, জ্ঞানাংশে কোন ভ্রম থাকে না । কাজেই একইসঙ্গে বস্তুবাদী ও নিরাকারবাদী হওয়া সত্ত্বেও প্রাভাকর মীমাংসক স্বপ্রকাশবাদের সমর্থক ।

৩. দিঙ্নাগ, *প্রমাণসমুচ্চয়,* ১৯৩০ পৃ. ২৪.

৪. 'ইট ইজ কোয়াইট পসিবেল ফর কন্টাডিক্টরি ফর্মস টু বিলোংগ'– কুমারিলভট্ট, *শ্লোকবার্ত্তিক,* ১৯৮৫, পৃ. ১৭৫.

৫. উদ্যোতকর, *ন্যায়বার্ত্তিক,* ১৯৩৬-৪৪, পৃ. ১০৮২.

৬. 'কেবলস্যাপ্যর্থস্য স্মৃতিদর্শনাত্'- ভাসর্বজ্ঞ, *ন্যায়সার,* ন্যায়ভূষণম্, ২০০৪, পৃ. ১৩৬.

৭. 'পূর্বানুভবাকারোল্লেখস্মৃর্তেদৃশ্যতে, সোহন্যথা ন স্যাদিতি চেৎ...... উদয়নাচার্য, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ,* ১৯৫৭, পৃ. ৪৫৭.

৮. 'চাক্ষুষজ্ঞানং ন চক্ষুর্জন্যজ্ঞানবিষয়ঃ' - গঙ্গেশোপাধ্যায়, *তত্ত্বচিন্তামণি,* ১৯৯০, পৃ. ৭৯৮.

৯. ভাসর্বজ্ঞ, *ন্যায়সার,* ন্যায়ভূষণম্, ২০০৪, পৃ. ১৪০.

১০. ঐ, পৃ. ১৩৬.

১১. শালিকনাথ মিশ্র, *প্রকরণপঞ্চিকা,* ২০১৮, পৃ. ১৪০.

১২. 'সুখাদীনান্তু বিজ্ঞানাভিন্নহেতুকত্বমসিদ্ধম্'- ঐ, পৃ. ১৪৪.

১৩. '......সুখাদৌ সাক্ষাৎক্রিয়মাণে সুখত্বাস্যাপি গ্রহাপত্ত্যা বিশেষদর্শনেন......'- উদয়নাচার্য, *ন্যায়-বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি,* ১৯১১, পৃ. ১১৮.

১৪. 'সুখং জ্ঞানমিত্যভ্যুপগম্যতে তেষামোপত্তিকভ্রমো ন সাক্ষাৎকারীত্যর্থঃ'– ঐ।

১৫. 'চক্ষুরাদিব্যতিরেকেণ নান্যং প্রকাশকমপেক্ষেত'- ভাসর্বজ্ঞ, *ন্যায়সার,* ন্যায়ভূষণম্, ২০০৪, পৃ. ১৩৮.

১৬. শান্তরক্ষিত, *তত্ত্বসংগ্রহ*– ভো. ২, ১৯৬৮, পৃ. ৬৮৮.

১৭. 'ইহ তু বাহ্যকারকেষ্বপি ন তৎপূর্বকং ফলং দৃষ্টমিত্যুক্তম্'– জয়ন্ত ভট্ট, *ন্যায়মঞ্জরী,* ১৯৭১, পৃ. ১৯.

১৮. 'ন হি শরসংযোগেন গগণে কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে.........'- উদয়ন, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ,* ১৯৯৫, পৃ. ৩৫০.

১৯. 'স্পন্দাভিপ্রায়েণ, অসিদ্ধেঃ'- ঐ, পৃ. ৩৫১.

২০. 'ন হি তৈঃ প্রমেয়ে কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে, অপি তু প্রমাতর্যেব'– ঐ।

২১. 'অন্ততস্তেনৈবানেকান্তাৎ, অনবস্থানাচ্চ'- ঐ।

২২. 'আশুকারকাভিপ্রায়েণ, কর্মণ্যসিদ্ধেঃ'– ঐ।

২৩. 'কর্মণ্যাশুকারকং জ্ঞানমিত্যেব হি সাধ্যম্'- ঐ।

২৪. 'তদ্‌বিশেষণে তু কথমতীন্দ্রিয়ং জ্ঞানমিতি'- উদয়ন, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ*, ১৯৫৭, পৃ. ৪৬৩.

২৫. 'তথাবিধ জ্ঞাততানাশ্রয়ত্বাদিতি চেন্ন, আশ্রয়াসিদ্ধেঃ'– ঐ।

২৬. 'জ্ঞানহেতুনৈব তদুপপত্তেঃ'- ঐ, পৃ. ৩৫৭.

২৭. 'অপ্রতীতং চ কথং ব্যবহরপথবতরেদিতি জ্ঞাতব্যবহারান্যথানুপপত্ত্যা জ্ঞাততাকল্পনম্'– ঐ, পৃ. ৪৬৩.

২৮. '...তদপ্যসৎ, পরস্পরাশ্রয়প্রসঙ্গাৎ'- ঐ।

২৯. জয়ন্ত ভট্ট, *ন্যায়মঞ্জরী*, ১৯৭১, পৃ. ১৯.

৩০. 'ন হি তত্র জ্ঞাততা লিঙ্গং, অতীতানাগতয়োস্তদভাবাত্'- গঙ্গেশোপাধ্যায়, *তত্ত্বচিন্তামণি*, ১৯৯০, পৃ. ৭৮৯.

৩১. 'নাপি জ্ঞানাতীন্দ্রিয়ত্বে জ্ঞানানুমিত্যা তদ্‌গৃহ্যতে জ্ঞানমাত্রলিঙ্গস্য প্রাকট্যাদেস্তদ্ব্যভিচারাত্'- গঙ্গেশোপাধ্যায়, *তত্ত্বচিন্তামণি*, ১৯৯০, পৃ. ১২৮.

সিদ্ধান্ত

ন্যায়দর্শন সম্মত জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রকাশ বিষয়ক আলোচনায় আমরা লক্ষ্য করেছি যে, দার্শনিকদের মধ্যে জ্ঞান সংক্রান্ত যে সমস্ত বিষয়ে মত বৈচিত্র্য বর্তমান জ্ঞানের স্বরূপ কিংবা জ্ঞানের প্রকাশক জ্ঞানের স্বরূপ তাদের অন্তর্গত । জ্ঞান যে বিষয়ের প্রকাশক হয় অর্থাৎ জ্ঞেয়, জ্ঞান যার হয় অর্থাৎ জ্ঞাতা প্রভৃতি প্রসঙ্গেও দার্শনিকদের মধ্যে মতবিরোধ বিস্তর । জ্ঞান যে বিষয়ের জ্ঞাপক হয় সেই বিষয়কে কেউ বাহ্য ঘট-পটাদি বলে স্বীকার করছেন, কেউ আবার বিজ্ঞান অতিরিক্ত বাহ্য বিষয়ের অস্তিত্ব স্বীকার না করায় বিজ্ঞানকেই বিষয় বলে স্বীকার করছেন । বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব যাঁরা স্বীকার করেন তাঁদের কেউ আবার সেই বস্তু জন্য বিষয়স্বারূপ্য বা অর্থস্বারূপ্যকেই অর্থাৎ আকারকেই অর্থপ্রতীতির কারণ বলে মনে করছেন । কোন জ্ঞান যখন উৎপন্ন হচ্ছে তখন তার উৎপত্তি অবশ্যই কোন উপায় জন্য । যেমন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হলে সেই জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা উৎপন্ন । জন্য জ্ঞানটি যদি প্রমা হয় তবে তার জনক প্রমাণ নামে পরিচিত। কোন কোন দার্শনিকের মতে এই প্রমাণ হল প্রমারূপ কার্যের কারণ । কারণ ও কার্য যেরূপ অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ তেমনি তাঁদের মতে, প্রমাণ ও প্রমাও ভিন্ন পদার্থ । কিন্তু এই মত সকলে স্বীকার করে না । এই মত অস্বীকার করে কোন কোন দার্শনিক আবার প্রমাণ ও প্রমার অভিন্নতাই সিদ্ধ করছেন এবং প্রমা বা জ্ঞানকেই প্রমাণ বলে স্বীকার করেছেন । কেউ কেউ মনে করছেন জ্ঞানগত যে আকার তা বিষয়ের আকার, আবার কারও মতে জ্ঞানের আকারটি বিষয়ের নয়, জ্ঞানেরই আকার । কোন কোন দার্শনিকের মতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় আত্মায় । সেই আত্মা পূর্বাপর কালস্থায়ী নিত্য । কিন্তু দর্শনান্তরে এই অর্থে আত্মা স্বীকৃত হয়নি । তাই

যে পক্ষে উক্ত অর্থে আত্মা স্বীকৃত হয়নি সেই পক্ষে জ্ঞান উৎপন্ন হলে আত্মা তাকে জানে কিনা এই প্রশ্নের অবকাশ নেই, যেমন বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ । বিজ্ঞান ধারা অতিরিক্ত আত্মা তাঁরা স্বীকার করেন নি । তাই জ্ঞান উৎপন্ন হলে আত্মা তাকে জানে কিনা এই প্রশ্ন তাদের দর্শনে উঠতে পারে না । জ্ঞান উৎপন্ন হলে তা নিজের কাছেই নিজে প্রকাশিত হয় কিনা সেই প্রশ্ন উঠেছে । ফলে যে মূল প্রশ্নকে কেন্দ্র করে স্বতঃপ্রকাশ ও পরতঃপ্রকাশবাদের উদ্ভব, সেই প্রশ্নের আকারেও মত পার্থক্য আছে । কাজেই জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রকাশের আলোচনায় দার্শনিকদের মধ্যে মতবিরোধের অবকাশ আছে । সুতরাং সেই ‘জ্ঞান’ সংক্রান্ত বিষয়ে দার্শনিক আলোচনা হতেই পারে । জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্ঞান সংক্রান্ত ন্যায় মতটি ঠিক কিরূপ সেই বিষয়ক একটি দার্শনিক অনুসন্ধান করা হয়েছে এই প্রবন্ধে । জ্ঞান সংক্রান্ত নানা প্রশ্নে এবং জ্ঞানের জ্ঞান প্রসঙ্গে যে পরস্পর বিরোধী নানা মতের অবকাশ আছে তা আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি । প্রত্যেকটি দর্শনই নিজ মতকে যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন । প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের মতের পশ্চাতেই স্বীকৃত কতগুলি সিদ্ধান্ত ভিত্তিরূপে কাজ করছে । অধ্যাপক কালি কৃষ্ণ ব্যানার্জীর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে । অধ্যাপক ব্যানার্জীর মতে, দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি হল সুসংবদ্ধ পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর এবং দার্শনিক বচনগুলি হল পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর বচন ।[১] সেই কারণে যে কোন সম্প্রদায়ের জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্ঞান সংক্রান্ত মতামত অনুধাবন করতে গেলে সেই দার্শনিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃত নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত সমূহের প্রেক্ষিতেই তাকে অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে । একথা ন্যায়দর্শন সম্বন্ধেও একই অর্থে প্রযোজ্য । কেন, কী কারণে কোন সম্প্রদায় কোন বিষয়ে কোন পক্ষ অবলম্বন করছেন, তার ভিত্তি কী, তার পূর্বস্বীকৃতিগুলি কী কী ?- তা না বুঝতে পারা পর্যন্ত তার খণ্ডনের প্রশ্ন ওঠে না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়

পরিপ্রেক্ষিত নির্ভর হওয়ার জন্যই নৈয়ায়িকগণ কোন কিছুর জ্ঞান হওয়ার অর্থ করেছেন সেটি বিষয়রূপে জ্ঞানে প্রকাশিত হওয়া । একথা বাহ্য বস্তু সম্পর্কে যেমন প্রযোজ্য তেমনি আন্তর বস্তু সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য । বাহ্য বস্তুর ন্যায় আন্তর বিষয় জ্ঞানও বিষয়রূপেই জ্ঞানান্তরের দ্বারা প্রকাশিত হয় । আবার অন্যান্য স্বপ্রকাশবাদীগণ জ্ঞানের বিষয় স্বীকার করলেও জ্ঞান কারও বিষয় হয় না– এই নিয়ম মেনে জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া মাত্রই জ্ঞানের প্রকাশ স্বীকার করে নিয়েছেন। একইসঙ্গে অধ্যাপক ব্যানার্জী বলেছেন কোন একটা নির্দিষ্ট দার্শনিক সিদ্ধান্ত না থাকলেও অধিকারী ভেদে শাস্ত্রভেদ হয় । কাজেই ব্যক্তি তাঁর প্রকৃতি, কৌতূহল, ঝোঁক প্রভৃতি অনুসারে কোন একটি মতকে গ্রহণ করে এবং অন্যান্য মতবাদকে খণ্ডন করে । একই রকম কথা আমরা ভাসর্বজ্ঞের রচনাতেও পেয়েছি । শাস্ত্রের অধিকারী বিচার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, যে কোন শাস্ত্রই সর্বজীবের অনুগ্রহে সক্ষম নয় । যেহেতু পুরুষের সংখ্যা অসংখ্য তাদের অভিপ্রায়ও ভিন্ন ভিন্ন । ফলে সর্বজীবের অনুগ্রহ কোন একটি শাস্ত্রের পক্ষে সম্ভব নয় । যে ব্যক্তি যে শাস্ত্র নির্দিষ্ট বিশেষ উপায় অবলম্বনে অভিপ্রেত অর্থ লাভ করতে চায় সে সেই শাস্ত্রের অধিকারী ।[২] সুতরাং মানুষ দার্শনিক আলোচনায় কোন্ মতটিকে সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করবে তা অনেকাংশেই নির্ধারিত হয় তার অভিপ্রায়, প্রবণতা অনুসারে । কিন্তু কোন দর্শন সম্প্রদায়ের কোন একটি মতবাদের পশ্চাতে কোন্ কোন্ স্বীকৃত সিদ্ধান্ত কার্যকর সেগুলি অনুসন্ধানের বিষয় হতেই পারে । এই প্রবন্ধে মূলতঃ সেই প্রচেষ্টাই করা হয়েছে । জ্ঞানের জ্ঞান সংক্রান্ত দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে ন্যায়দর্শন সম্মত জ্ঞানের জ্ঞানকে সিদ্ধান্তরূপে নির্বাচন পূর্বক তার পশ্চাতে যে যে পূর্বস্বীকৃতি বর্তমান সেগুলি উপলব্ধির চেষ্টা করা হয়েছে । কিন্তু দার্শনিক আলোচনা বিরোধী মতের আলোচনা ভিন্ন সম্ভব নয় । বিরোধী মতের আলোচনাও অবশ্যই সেই পক্ষ স্বীকারের

পশ্চাতে যে প্রেক্ষিত কাজ করছে তার আলোচনাকেও অপেক্ষা করছে । কোন মতবাদকে যথার্থরূপে খণ্ডন করতে হলে সেই মতবাদের সিদ্ধান্তগুলি যে নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত থেকে করা হয়েছে সেগুলি বিষয়ে যথার্থ অবধারণ প্রয়োজন । কারণ সেগুলির উপলব্ধি ব্যতীত তার খণ্ডনের চেষ্টাও অবান্তর । বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে তাই ন্যায় দর্শনে স্বীকৃত জ্ঞান ও জ্ঞানের জ্ঞানের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য ন্যায়দর্শন স্বীকৃত মূল সিদ্ধান্ত গুলি কী কী তা যেমন অনুসন্ধান করা হয়েছে তেমনি আবার উক্ত বিষয়ে বিরোধী মত অবলম্বনকারীদের মতের উপলব্ধির জন্যও তাদের যে যে স্বীকৃত সিদ্ধান্ত এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল তা অনুসন্ধান করা হয়েছে। পরবর্তীতে ন্যায় পক্ষ থেকে সেই মতগুলি খণ্ডনের চেষ্টাও করা হয়েছে । এত অনুসন্ধনের পরেও প্রশ্ন থেকে যায় ন্যায় দর্শনে জ্ঞানের জ্ঞান তথা অনুব্যবসায় এত গুরুত্ব সহকারে আলোচনার বিশেষ হেতু কী?

ন্যায় দর্শনে ‘জ্ঞান’ সংক্রান্ত দার্শনিক অনুসন্ধান করা হয়েছে । ন্যায়দর্শন মূলতঃ চরম বস্তুবাদী দর্শন । বস্তুবাদী হওয়ায় দর্শন চর্চায় লোকব্যবহার, লোকানুভবের গুরুত্ব তারা অকপটে স্বীকার করেন । অর্থাৎ কোন শব্দ কোন্ অর্থকে নির্দেশ করবে তা অনেকাংশে লোকব্যবহারের দ্বারাই সমর্থিত । তাদের পক্ষে দর্শন চর্চা লোকব্যবহার নিরপেক্ষ কোন ভাবেই সম্ভব নয় । যদিও এই লোকব্যবহার দার্শনিক মতবাদের চরম ভিত্তিরূপে গণ্য হতে পারে না । কিন্তু সেই লোকব্যবহার যদি সাধারণ লোকের সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত হয় তাহলে তা দার্শনিক অনুসন্ধানের পক্ষে অবশ্যই প্রাথমিক স্তর বা প্রারম্ভিক স্তর হিসাবে কাজ করে । তাই অভাব পদার্থের অস্তিত্ব প্রমাণে বলা হয়েছে অভাব প্রমাণসিদ্ধ, যেহেতু অভাবের উপলব্ধি হয় । এক্ষেত্রে সাধারণ লোকের উপলব্ধির সাহায্যেই অভাবের অস্তিত্ব প্রমাণ করা হয়েছে । যেহেতু সাধারণ লোক যা

থাকে না বা যা দেখে না তা নেই বলেই বুঝে থাকে ।[৩] এই ‘নেই’ এরূপ বোধের যে বিষয় তাই অভাব পদার্থ । এরূপে লোকানুভবের দ্বারা ‘নেই’ বা অভাবের লোকব্যবহার সমর্থিত হওয়ায়, অভাবকে প্রমাণসিদ্ধ বলা হয়েছে । একইভাবে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ন্যায়শাস্ত্র বা ন্যায়বিদ্যা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছে ‘ন্যায়’ হল প্রমাণের দ্বারা অর্থের পরীক্ষা । কিন্তু সেই প্রমাণ তখনই ‘অন্বীক্ষা’ বা ‘ন্যায়’ পদবাচ্য হবে যদি তা প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরোধী হয় ।[৪] যদি সেই প্রমাণ প্রত্যক্ষ ও আগমের বিরোধী হয় তাহলে তা ন্যায়াভাস নামে পরিচিত হয় । যা ন্যায়ের মতো হলেও প্রকৃতপক্ষে ন্যায় নয় । আমরা জানি ন্যায়দর্শন মূলতঃ আগম সিদ্ধ পদার্থকে যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে চায় । সেই কারণে পরার্থানুমানের জন্য প্রয়োজনীয় যে প্রথম অবয়ব সেই প্রতিজ্ঞাকে আগম মূলক বলা হয়েছে । যেহেতু প্রতিজ্ঞা বাক্য আগমসিদ্ধ পদার্থের উপস্থাপক । কিন্তু একইসঙ্গে বলা হয়েছে সেটি প্রত্যক্ষের বিরোধী হলে হবে না । এখানে প্রত্যক্ষ বলতে মূলতঃ লোকানুভবকে বোঝান হয়েছে ।[৫] কাজেই মনে হয় ন্যায়শাস্ত্র বা ন্যায়বিদ্যায় প্রত্যক্ষ বা লোকানুভবের গুরুত্ব বেশি । সুতরাং জ্ঞান সম্বন্ধীয় দার্শনিক আলোচনা ‘জ্ঞান’ শব্দের লোকব্যবহার নির্ভর । আবার জ্ঞান সম্বন্ধীয় সেই লোকব্যবহার যদি জ্ঞান বিষয়ে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের দ্বারা সমর্থিত হয় তবে তা দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটাবার পক্ষে উপযোগীরূপে বিবেচিত হয় । জ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা কিংবা জ্ঞানের প্রকাশ বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে নৈয়ায়িকগণ সেই প্রচেষ্টাই করেছেন । জ্ঞান সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনা করতে গিয়ে তাই নৈয়ায়িকগণকে এই বিষয়টি সম্পর্কে সর্বত্রই লক্ষ্য করতে হয়েছে যে বস্তুবাদের সমর্থক হওয়ায় কোথায় কোথায় ‘জ্ঞান’ শব্দটি কীভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে ? অর্থাৎ জ্ঞানের ব্যবহার কীরূপে করা হচ্ছে ? জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা শুরুর মূলে আছে – ‘ঘটকে জানি’, ‘আমি জানি যে, আমি ঘটকে

জানি', 'আমি জানি যে, আমি পটকে জানি'– এরূপে লোকব্যবহার । লোকব্যবহারে কীরূপে 'জ্ঞান' শব্দটা প্রযুক্ত হচ্ছে সেটিই আলোচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু সেই লোকব্যবহার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত হলে তাবেই তা দার্শনিক অনুসন্ধানের প্রাথমিক পর্যায়রূপে কার্যকর ।

আমাদের ব্যবহারেই আমরা দেখতে পাই আমাদের জ্ঞান যেমন হয় 'এটি বই' এইরূপে তেমনি আবার এরূপ ব্যবহারও লক্ষ্য করি যেখানে আমাদের জ্ঞান হয় 'আমি জানি যে, এটি বই' এইরূপে । অর্থাৎ এটি ব্যবহারেই লক্ষণীয় যে জানার বিষয়টি যেমন বই প্রভৃতির মত বাহ্য পদার্থ হতে পারে তেমনি সেই বই বিষয়ক জ্ঞান বা আন্তর বিষয়ও হতে পারে । 'আমি জানি যে আমি সুখী'– এরূপ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও যেমন আমরা স্পষ্ট লক্ষ্য করে থাকি আন্তর বিষয়ক একটি অনুভূতিকেই প্রকাশ করা হচ্ছে । এই যে ব্যবহার সমর্থিত হচ্ছে লোকানুভবের দ্বারা সেই অনুভবটাই হল অনুব্যবসায় ।

জ্ঞান সংক্রান্ত দার্শনিক আলোচনার ভিত্তিরূপে তাঁরা অনুব্যবসায়কে গ্রহণ করেছেন । কিন্তু এই বিষয়ে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ভাববাদের সমর্থক মতবাদগুলির যেমন খণ্ডন করেছেন তেমনি বস্তুবাদী হওয়া সত্ত্বেও ভাট্ট মীমাংসকদের মতের বিরুদ্ধেও যুক্তি দিয়েছেন । সাধারণতঃ বস্তুবাদের মূল কথা হল জ্ঞান নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব আছে । আর এই বস্তুবাদের অন্যতম ভিত্তি দ্বয় জ্ঞান নিরাকার ও জ্ঞান পরতঃপ্রকাশ । পরতঃপ্রকাশবাদ প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত আবার জ্ঞান উক্ত জ্ঞান ভিন্ন বিষয়েরই জ্ঞাপক বা জ্ঞানের সবিষয়কত্ব স্বীকৃত হয়েছে । জ্ঞান যদি নিজ ভিন্ন বিষয়কেই বিষয় করে তবে সেই জ্ঞানের প্রকাশ সেই জ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব নয় । ফলে

জ্ঞান সেই জ্ঞান ভিন্ন জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হয় বলে স্বীকার করতে হয়েছে । অন্যদিকে জ্ঞানের স্ববিষয়কত্ব স্বীকারে জ্ঞান নিরাকার বা জ্ঞান বিষয়ের আকারকেই গ্রহণ করে এই মত স্বীকার করতে হয়েছে । কিন্তু ভাববাদে সেই জ্ঞান নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় । জ্ঞানকে পরতঃপ্রকাশ না বলে স্বপ্রকাশ বলা হলে কিংবা জ্ঞানকে নিরাকার না মেনে সাকার বলা হলে জ্ঞান নিরপেক্ষ বস্তুর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ফলে তা ভাববাদে পর্যবসিত হয় । কেননা জ্ঞান যদি সাকার হয় তাহলে জ্ঞানের ক্ষেত্রে বাহ্য বস্তুর যে ভূমিকা তা অস্বীকারের দিকে নিয়ে যায় । সেই কারণে চরম ভাববাদী বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেন । জ্ঞান সাকার হলে বা জ্ঞানগত যে আকার তা জ্ঞানেরই হলে, জ্ঞানের উৎপত্তির ক্ষেত্রে বাহ্য বস্তুর কোন ভূমিকা থাকে না। ফলে জ্ঞান নিজের প্রকাশের জন্য অন্য কোন কিছুর ওপরে নির্ভর করে একথা স্বীকার করার অবকাশ থাকে না । সেক্ষেত্রে জ্ঞান নিজেই নিজের প্রকাশক হওয়ায়, জ্ঞানকে স্বপ্রকাশ বলতে হয় । আর জ্ঞান স্বপ্রকাশ হওয়ায় জ্ঞান থাকা ও তার প্রকাশের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকে না । জ্ঞান সাকার ও জ্ঞান স্বপ্রকাশ এই দুটি হল ভাববাদের অন্যতম দুই পূর্বস্বীকৃতি । কাজেই বস্তুবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে জ্ঞান সাকার ও জ্ঞান স্বপ্রকাশ এই মতবাদের খণ্ডন যেমন আবশ্যক তেমনি জ্ঞানকে নিরাকাররূপে প্রতিষ্ঠা করা এবং জ্ঞানের পরতঃপ্রকাশবাদ মেনে নেওয়াও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । জ্ঞানের পরতঃপ্রকাশতত্ত্ব আবার জ্ঞানের সবিষয়কত্ব তথা জ্ঞানের নিরাকারত্ব স্বীকারের উপর নির্ভরশীল । তাছাড়াও বাহ্যবস্তুর ন্যায় জ্ঞান বিষয়রূপে জ্ঞাত হয় এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রতি বিষয় কারণ, কারণ কার্যের পূর্ববর্তী প্রভৃতি স্বীকৃতি গুলিও এই পক্ষ স্বীকারের পশ্চাতে ভিত্তি স্বরূপ ক্রিয়াশীল । জ্ঞান যদি অন্যান্য ঘট-পটাদি বিষয়ের ন্যায় জ্ঞানের বিষয়রূপেই প্রকাশিত হয় এবং বিষয় ও জ্ঞান ভিন্ন হয়, তাহলে সেই জ্ঞানের প্রকাশের

জন্যও জ্ঞানান্তরকে স্বীকার করে, পরতঃপ্রকাশবাদকেই সমর্থন করতে হয় । সুতরাং নৈয়ায়িকদের কাছে বস্তুবাদ স্বীকারের অন্যতম অপরিহার্য পূর্বস্বীকৃতি পরতঃপ্রকাশবাদ স্বীকার ।

জ্ঞানকে পরতঃপ্রকাশ বলে স্বীকার করার পরেও সেই প্রকাশক জ্ঞান নৈয়ায়িককে মানস প্রত্যক্ষরূপ অনুব্যবসায় বলেই স্বীকার করতে হয়েছে । যেহেতু আন্তর বিষয়গুলি মনরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকাশিত হয় । আন্তর বিষয়রূপে জ্ঞানও তাই মনরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য বলতে হয়েছে । ফলে সেক্ষেত্রে জ্ঞানের গ্রহণে মানসপ্রত্যক্ষরূপে অনুব্যবসায় স্বীকার করা আবশ্যক ।

তথ্যসূত্র

১. 'a philosophical system is a formalized perspective and a philosophical proposition is a perspective proposition' – ব্যানার্জী, কে. কে., *নলেজ অফ্ নলেজ : এ মেটা-হাইপথিটিক্যাল স্টাডি অফ্ ন্যায় থিয়োরি অফ নলেজ অফ নলেজ*, ১৯৮৮, পৃ. ২২৭.

২. 'ন হি সর্বানুগ্রহার্থং শাস্ত্রমারভ্যতে, সর্বপুরুষানুগ্রহস্যাশক্যত্বাৎ, আনন্ত্যাদব্যবস্থিতাভিপ্রায়ত্বাচ্চ প্রাণিনাম্ । কিন্তু অধিকারিপুরুষাণুগ্রহার্থম্' ।- ভাসর্বজ্ঞ, *ন্যায়ভূষণ*, ন্যায়ভূষণম্, ২০০৪, পৃ. ১১.

৩. 'ন চ দৃশ্যতে, তস্মাদর্শনাভাবান্নাস্ত্রীতি গম্যতে'- উদ্দ্যোতকর, *ন্যায়ভাষ্যবার্ত্তিক*, ১৯৩৫-৪৪, পৃ. ২৭.

৪. 'প্রমাণৈরর্থ-পরীক্ষণং ন্যায়ঃ, প্রত্যক্ষাগমাশ্রিতমনুমানম্...........'- বাৎস্যায়ন, *ন্যায়সূত্র-ভাষ্য*, ১৯৩৬-৪৪, পৃ. ৩৮-৩৯.

৫. 'তা প্রত্যক্ষ বা লোকানুভবের বিরোধী বিরোধী হলে চলবে না'– দত্ত শর্মা, রত্না, *ভাসর্বজ্ঞ সম্মত প্রমাণতত্ত্ব*, ২০২০, পৃ ১৭৩.

গ্রন্থপঞ্জী

১. অন্নং ভট্ট, *তর্কসংগ্রহঃ,* সম্পা. শ্রীরামানুজতাত ও শ্রীকৃষ্ণতাত, তর্কসংগ্রহ দীপিকা প্রকাশিকা, মদ্রপুরী বিশ্ববিদ্যালয়, মদ্রপুরী, ১৯৮০.

২. অন্নং ভট্ট, *তর্কসংগ্রহঃ অধ্যাপনাসহিতঃ,* সম্পা. শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।

৩. অন্নংভট্ট, *তর্ক-সংগ্রহঃ,* সম্পা. সৎকারিশর্মা, তর্কসংগ্রহঃ- রামরুদ্রীয়, নৃসিংপ্রকাশিকা, নীলকণ্ঠপ্রকাশিকা, পট্টাভিরামপ্রকাশিকা, তর্কসংগ্রহদীপিকা সহিত, চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ আফিস, বারাণসী, ১৯৭৬.

৪. উদয়নাচার্য, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ,* সম্পা. শ্রীপদ্মপ্রসাদোপাধ্যায় ও শ্রীঢুণ্ঢিরাজ শাস্ত্রী, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিস অফিস, বারাণসী, ১৯৫৭.

৫. উদয়নাচার্য, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ,* সম্পা. শ্রীমোহন ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, ১৯৯৫.

৬. উদয়ানাচার্য, *ন্যায়-বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি,* স. বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ এবং লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, এসিয়াটিক সোসাইটি, ক্যালকাটা, ১৯১১.

৭. উদ্দ্যোতকর, *ন্যায়ভাষ্যবার্ত্তিক,* সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ ফিলোজফিক্যাল রিসার্চ, নিউ দিল্লি, ১৯৯৭.

৮. উমাস্বামী, *তত্ত্বার্থসূত্র,* সম্পা. এ. শান্তিরাজাশাস্ত্রী, তত্ত্বার্থসূত্রম্, গভর্ণমেন্ট ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী, মহীশূর, ১৯৪৪.

৯. কর, মিনতি, *অদ্বৈত বেদান্তে জ্ঞান,* রমা আর্ট প্রেস, কলিকাতা, ১৯৮৮.

১০. কান্ট, *ক্রিটিক অফ্ পিওর রিজন,* সম্পা. রাসবিহারী দাস, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৫৮.

১১. কুমারিল ভট্ট, *মীমাংসাশ্লোকবার্ত্তিক,* সম্পা. বিজয় শর্মা, ভারতীয় বিদ্যা সংস্থান, বারাণসী, ২০০২.

১২. কুমারিল ভট্ট, *শ্লোকবার্ত্তিক,* স. গঙ্গানাথ ঝা, দি এসিয়াটিক সোসাইটি, ক্যালকাটা, ১৯৮৫.

১৩. কেশব মিশ্র, *তর্কভাষা-* প্রথম খণ্ড, সম্পা. গঙ্গাধর কর, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ২০০৮.

১৪. কেশব মিশ্র, *তর্কভাষা-* দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পা. গঙ্গাধর কর, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ২০০৯.

১৫. কেশব মিশ্র, *তর্কভাষা,* সম্পা. সুরেন্দ্রদেব শাস্ত্রী, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০০৩.

১৬. গাগাভট্ট, এম. এম., *ভাট্টচিন্তামণি- তর্কপাদ,* সম্পা. সূর্য্য নারায়ণ সুকলা, দি চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, বেনারস সিটি, ১৯৩৩.

১৭. গঙ্গেশোপাধ্যায়, *তত্ত্বচিন্তামণি,* সম্পা. কামাক্ষ্যানাথ তর্কবাগীশ, ওরিয়েন্টাল বুক সেন্টার, দিল্লি, ১৯৯০.

১৮. গঙ্গেশোপাধ্যায়, *তত্ত্বচিন্তামণি*, সম্পা. ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ, কলিকাতা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ।

১৯. গঙ্গেশোপাধ্যায়, *তত্ত্বচিন্তামণিপ্রামাণ্যবাদঃ*, সম্পা. জ্বালা প্রসাদ গৌড়, চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বারাণসী, ২০০৮.

২০. গম্ভীরানন্দ, *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী*- প্রথম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৪৮.

২১. গুপ্ত, কল্যাণ চন্দ্র, *স্টাডিজ ইন্ ফিলোজফি*, ইউরেকা বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৬৫.

২২. গোস্বামী, সীতানাথ, *বেদান্তদর্শনে পরমার্থতত্ত্ব*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৯৫৭.

২৩. চিৎসুখাচার্য, *তত্ত্বপ্রদীপিকা- চিৎসুখী*, সম্পা. কাশীনাথ শাস্ত্রী ও রঘুনাথ শাস্ত্রী, নির্ণয় সাগর প্রেস, বোম্বে, ১৯৩১.

২৪. জগদীশ তর্কালঙ্কার, *শব্দশক্তি প্রকাশিকা*, সম্পা. ধ্রুবরাজ শাস্ত্রী, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বেনারস সিটি, ১৯৩৪.

২৫. জগদীশ তর্কালঙ্কার, *শব্দশক্তি প্রকাশিকা*, সম্পা. মধুসূদন ভট্টাচার্য, সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৮০.

২৬. জয়ন্ত ভট্ট, *ন্যায়মঞ্জরী*, সম্পা. অমিত ভট্টাচার্য, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলিকাতা, ২০০৬.

২৭. জয়ন্ত ভট্ট, *ন্যায়মঞ্জরী,* সম্পা. শ্রীসূর্যনারায়ণশুক্লঃ, চৌখাম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, বারাণসী, ১৯৭১.

২৮. ঝা, গঙ্গানাথ, *দি প্রভাকর স্কুল অফ্ পূর্ব মীমাংসা,* দি ম্যানেজ ইন্ডিয়ান থট, এলাহাবাদ, ১৯১১.

২৯. তর্কতীর্থ, অমরেন্দ্রমোহন এবং তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ, *ন্যায়দর্শনম্,* মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং, ক্যালকাটা, ১৯৩৬-৪৪.

৩০. তর্কতীর্থ, শ্রীরামকৃষ্ণ, *কুসুমাঞ্জলি-সৌরভ,* হেনা প্রেস, ঢাকা, ১৯২৩.

৩১. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলিকাতা, ১৯৮১.

৩২. দত্ত শর্মা, রত্না, *ভাসর্বজ্ঞ সম্মত প্রমাণতত্ত্ব,* মহাবোধি বুক ইজেন্সী, কলকাতা, ২০২০.

৩৩. দিঙ্নাগ, *প্রমাণসমুচ্চয়,* স. এইছ. আর. রঙ্গস্বামী ইয়াঙ্গার, গভরমেন্ট ব্রাঞ্চ প্রেস, মহিসুর, ১৯৩০.

৩৪. ধর্মকীর্তি, *ন্যায়বিন্দু,* সম্পা. সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ, ন্যায়বিন্দু- ধর্মোত্তর ন্যায়বিন্দুটীকা সহ, সন্দেশ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০৭.

৩৫. ধর্মকীর্তি, *প্রমাণবার্ত্তিকম্ উইথ মনোরথনন্দী কৃত বৃত্তি,* সম্পা. দ্বারিকাদাসশাস্ত্রী, বুদ্ধভারতী, বারাণসী, ১৯৬৮.

৩৬. নাগার্জুন, *বিগ্রহব্যাবর্তনী,* স জন ওয়েস্টারহফ, দি ডিসপেলার অফ্ ডিসপিউটস, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১০.

৩৭. নাগার্জুন, *মধ্যমকশাস্ত্র উইথ দি কমেন্টারি প্রসন্নপদা বাই চন্দ্রকীর্তি,* স. পি. এল. বৈদ্য, দি মতিলাল ইন্সটিটিউট অফ্ পোস্ট গ্যাজুয়েট স্টাডিস অ্যান্ড রিসার্চ ইন্ সংস্কৃত লার্নিং, দারভাঙা, ১৯৬০.

৩৮. পার্থসারথি মিশ্র, *শাস্ত্রদীপিকা,* সম্পা. গজানন শাস্ত্রী, চৌখাম্বা, কাশী, ২০০৮.

৩৯. প্রভাকরমিশ্র, *বৃহতী- শাবরভাষ্যব্যাখ্যা,* সম্পা. এ. চিন্নস্বামী শাস্ত্রী, বৃহতী-ঋজুবিমলয়া সহ, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ, বেনারস, ১৯২৯.

৪০. প্রশস্তপাদাচার্য, *প্রশস্তপাদভাষ্য,* অনু. দীননাথ ত্রিপাঠী, *প্রশস্তপাদভাষ্য* ভাষ্যানুবাদ বিবৃতি-ন্যায়কন্দলী তদনুবাদসহিতম্- দ্বিতীয়ভাগ, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য ও দণ্ডিস্বামী দামোদরাশ্রমঃ, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০০.

৪১. বাগ্চী, যোগেন্দ্রনাথ এবং শ্রীতাংশুশেখর বাগ্চী, *প্রাচীন ন্যায় ও মীমাংসা সম্মত প্রামাণ্যবাদ,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৯৭৪.

৪২. বাচস্পতি মিশ্র, *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকা,* সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ ফিলোজফিক্যাল রিসার্চ, নিউ দিল্লি, ১৯৯৬.

৪৩. বাচস্পতি মিশ্র, *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী,* সম্পা. রামশংকর ভট্টাচার্য, মতিলাল বেনারসিদাস পাবলিশার্স, বারাণসী, ১৯৬৭.

৪৪. বাৎস্যায়ন, *ন্যায়সূত্র- ভাষ্য,* সম্পা. অনন্তলাল ঠাকুর, গৌতমীয়ন্যায়দর্শন, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ ফিলোজফিকাল রিসার্চ, নিউ দিল্লি, ১৯৯৭.

৪৫. ব্যানার্জী, কে. কে., *নলেজ অফ্ নলেজ : এ মেটা-হাইপথিটিক্যাল স্টাডি অফ্ ন্যায় থিয়োরি অফ্ নলেজ অফ্ নলেজ,* সম্পা. কল্যান সেনগুপ্ত ও কৃষ্ণা রায়, ল্যাঙ্গুয়েজ, নলেজ অ্যাণ্ড অনটোলজি, ইন্ডিয়ান কাউণ্সিল অফ্ ফিলোজফিক্যাল রিসার্চ, নিউ দিল্লি, ১৯৮৮.

৪৬. বিদ্যাভূষণ, সতীশচন্দ্র, *ন্যায়াবতারঃ,* সম্পা. সিদ্ধসেন দিবাকর, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১৯৮১.

৪৭. বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদঃ,* সম্পা. পঞ্চানন শাস্ত্রী, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ।

৪৮. বেদান্তবাগীশ, কালীবর, *বেদান্তদর্শনম্,* স. দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৭.

৪৯. বিশ্বনাথপঞ্চানন ভট্টাচার্য, *কারিকাবলী,* সম্পা. আত্মারাম নারায়ণ জেরে, কৃষ্ণদাস অ্যাকাডেমী, বারাণসী, ১৯৮২.

৫০. বিশ্বনাথপঞ্চানন ভট্টাচার্য, *ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী,* চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, বারাণসী, ২০০৩.

৫১. ভট্ট, গোবরধন. পি., *বেসিক ওয়েজ অফ্ নোয়িং,* মোতিলাল বেনারসিদাস, বারাণসী, ১৯৬২.

৫২. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, *অনুব্যবসায়,* সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা, ২০০৯.

৫৩. ভট্টাচার্য, শিবজীবন, *ডাউট, বিলিফ অ্যান্ড নলেজ,* ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ ফিলোজফিক্যাল রিসার্চ ইন্ অ্যাসোসিয়েশন উইথ অ্যালাইড পাবলিসার্স, নিউ দিল্লি, ১৯৮৭.

৫৪. ভট্টাচার্য, শ্রীমোহন ও দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতীয় দর্শন কোষ-* প্রথমখণ্ড, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, ১৯৭৮.

৫৫. ভাসর্বজ্ঞ, *ন্যায়সার,* ন্যায়ভূষণম্, স. স্বামী যোগীন্দ্রানন্দঃ, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০০৪.

৫৬. ভীমাচার্য, ঝালকীকর, *ন্যায়কোষ অর ডিকশেনারি অফ্ টেকনিক্যাল ট্রাম অফ্ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি,* সম্পা. বাসুদেব শাস্ত্রী অভয়ঙ্কর, দি ভাণ্ডারকর অরিয়েন্টাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট, পুনে, ১৯২৮.

৫৭. মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, *আমি ও আমার মন,* সম্পা. অরিন্দম চক্রবর্তী, অনুষ্টুপ্, কলকাতা, ২০১৬.

৫৮. মতিলাল, বিমলকৃষ্ণ, *পারসেপশন – এন এসে অন্ ক্লাসিকাল ইন্ডিয়ান থিওরিস অফ্ নলেজ,* ক্লেরেন্ডোন প্রেশ, অক্সফোর্ড, ১৯৮৬.

৫৯. মধুসূদন সরস্বতী, *অদ্বৈতসিদ্ধি,* সম্পা. অনন্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রী, বোম্বে, ১৯৩৭.

৬০. মহান্তি, জে. এন., *গঙ্গেশ’স্ থিয়োরি অফ্ ট্রুথ,* মতিলাল বেনারসিদাস পাবলিসার্শ, দিল্লি, ১৯৬৬.

৬১. মহান্তি, জে. এন. , *রিজন অ্যান্ড ট্রাডিশন ইন্ ইন্ডিয়ান থট – অ্যান এসে অন্ দি নেচার অফ্ ইন্ডিয়ান ফিলোজফিকাল থিঙ্কিং,* ক্ল্যাভেন্ডন প্রেস, অক্সফোর্ড, ১৯৯২

৬২. মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ-* তৃতীয়খণ্ড, সম্পা. অমিত ভট্টাচার্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১১.

৬৩. শঙ্করাচার্য, *অপরোক্ষানুভূতি,* সম্পা. বিমুক্তনন্দ, অপরোক্ষানুভূতি অফ্ সেলফ রিয়েলাইজেশন, অদ্বৈত আশ্রম, হিমালয়, ১৯৩৮.

৬৪. শঙ্করাচার্য, *ব্রহ্মসূত্র শাঙ্করভাষ্য,* সম্পা. অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, নিরণ্য সাগর প্রেস, বোম্বে, ১৯৩৮.

৬৫. শান্তরক্ষিত, *তত্ত্বসংগ্রহ-* ভো. ২, স. দ্বারিকাদাস শাস্ত্রী, বুদ্ধ ভারতী, বারাণসী, ১৯৬৮

৬৬. শালিকনাথ মিশ্র, *প্রকরণপঞ্চিকা,* সম্পা. সুব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রী, প্রকরণপঞ্চিকা উইথ ন্যায় সিদ্ধি, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, কাশী, ২০১৮.

৬৭. সদানন্দযোগীন্দ্র, *বেদান্তসার,* সম্পা. লোকনাথ চক্রবর্তী, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০১১.

৬৮. সেনগুপ্ত, কল্যাণ এবং কৃষ্ণা রায়, *ল্যাঙ্গুয়েজ, নলেজ এণ্ড অন্টোলজি- এ কালেকশন অফ্ এসেস বাই প্রফেসর কে. কে. ব্যানার্জী* , আই.সি.পি.আর., নিউ দিল্লি, ১৯৮৮.

৬৯. হাটোরি, মাসাকি, *দিঙ্‌নাগ অন পারশেপশন,* হার্বাড ইউনিভারসিটি প্রেশ, ক্রেমব্রীজ, ১৯৬৮.

৭০. হেমচন্দ্র, *প্রমাণমীমাংসা,* সম্পা. সুখলাজী সংগবি, দি সঞ্চালক সিংঘি জৈন গ্রন্থমালা, আমেদাবাদ, ১৯৩৯.

সাময়িক পত্রিকা

৭১. আশুতোষ, প্রমা প্রামাণ্য বিচার, *রিসার্চ বুলেটিন অফ্ ফিলোজফি স্পেশাল ইস্যু,* ভোল. ১, সম্পা. এস. কে. ভট্টাচার্য, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, ক্যালকাটা, মার্চ ১৯৮৪, পৃ.৮৭-৯১.

৭২. ইমারম্যান, ড্যানিয়েল, কুমারিল অ্যান্ড নোজ নোজ, *ফিলোজফি ইস্ট অ্যান্ড অয়েস্ট,* ভোল. ৬৮, নং- ২, এপ্রিল ২০১৮, পৃ. ৪০৮-৪২২, URL: https://doi.org/10.1353/pew.2018.0038.

৭৩. ওয়াং হাও, এ কোয়েশ্চেন অন নোলেজ অফ্ নোলেজ, *অ্যানালিসিস,* ভোল. ১৪, নং- ৬, জানুয়ারী, ১৯৫৪, পৃ. ১৪২-১৪৬, URL: https://www.jstor.org/stable/3326388.

৭৪. কয়ুমা, তাইকেন, শালিকনাথ’স ক্রিটিক অফ্ ধর্মকীর্তি’স “স্বসংবেদন” থিয়োরি, *জারনাল অফ্ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি,* ভোল. ৩৮, নং- ৩, স্পেশাল ইসু অন বুদ্ধিস্ট থিয়োরি অফ্ সেলফ অ্যাওয়ারনেস (স্বসংবেদন) : রিসেপশন এন্ড ক্রিটিক, জুন ২০১০, পৃ, ২৪৭-২৫৯, URL: https://www.jstor.org/stable/23497708.

৭৫. চ্যাটার্জী, তারা, এন অ্যাটেমপ্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড স্বতঃ প্রামাণ্যবাদ ইন্ অদ্বৈতবেদান্ত, *জার্নাল অফ্ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি,* ভোল. ১৯, নং- ৩, সেপ্টেম্বর ১৯৯১, পৃ. ২২৯-২৪৮, URL: https://www.jstor.org/stable/23445633.

৭৬. চ্যাটার্জী, তারা, ডিড প্রভাকর হোল্ড দি ভিউ দ্যাট নলেজ ইজ সেলফ মেনিফেস্টিং, *জার্নাল অফ্ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি,* ভোল. ৭, নং- ৩, সেপ্টেম্বর ১৯৭৯, পৃ. ২৬৭-২৭৬, URL: https://www.jstor.org/stable/23440322.

৭৭. ট্রবার, জন, কুমারিলস্ বুদ্ধিস্ট, *জারনাল অফ্ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি,* ভোল. ৩৮, নং– ৩, স্পেশাল ইসু অন বুদ্ধিস্ট থিয়োরি অফ্ সেলফ অ্যাওয়ারনেস (স্বসংবেদন) : রিসেপশন অ্যান্ড ক্রিটিক, জুন ২০১০, পৃ. ২৭৯-২৯৬, URL: https://www.jstor.org/stable/23497710.

৭৮. ডেন্টো, সি. , অন নোয়িং দ্যাট উই নো, এপিস্টিমোলজি, *নিউ এসেস ইন্ দি থিয়োরি অফ্ নলেজ,* সম্পা. আভরাম স্ট্রোল, হারপার এন্ড রো, নিউ ইয়োর্ক, ইভানস্টোন এন্ড লন্ডন, ১৯৬৭, পৃ. ৩২-৫৩. URL: http://www.jstor.org/stable/2272022.

৭৯. প্রীতি, আনল, কনসাসনেস ইন্ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি দি অদ্বৈত ডকট্রিন অফ্ অ্যাওয়ারনেস ওনলি (রিভিউ), *ফিলোজফি ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট,* ভোল. ৬১, নং- ৪, অক্টোবর ২০১১, পৃ. ৭৩০-৭৩৬, URL: https://doi.org/10.1353/pew.2011.0052.

৮০. বারনিয়ার, পল, দিঙ্নাগ অন্ রিফেলক্সিভ অ্যাওয়ারনেস, *ফিলোজফি ইস্ট অ্যান্ড অয়েস্ট,* ভোল. ৬৫, নং- ১, জানুয়ারী ২০১৫, পৃ. ১২৫-১৫৬, URL: https://doi.org/10.1353/pew.2015.0015.

৮১. ব্যানার্জী, কে. কে. , প্রমা- প্রমাণ অ্যান্ড নলেজ- জাস্টিফিকেশন, *রিসার্চ বুলেটিন অফ্ ফিলোজফি স্পেশাল ইসু,* ভোল. ১, সম্পা. এস. কে. ভট্টাচার্য, যাদবপুর ইউনিভার্সিটি, ক্যালকাটা, মার্চ ১৯৮৪, পৃ. ৩১-৪৮.

৮২. ব্যানার্জী, সর্বাণী, অনুব্যবসায় ও নৈয়ায়িকের যুক্তি, *জ্ঞান ও জ্ঞান-সংবিত্তি,* সম্পা. সংকলিতা ঘোষ ও প্রীতম ঘোষাল, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ২০১৬, পৃ. ১১৩-১২৫.

৮৩. ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু, জ্ঞানের প্রকাশ, *দর্শন বীক্ষা,* দর্শন বিভাগ- যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সংখ্যা- ২১, নং- ২, ২০১১, পৃ. ১-১৪.

৮৪. মহান্তি, জে. এন. , *কনসাশনেস অ্যান্ড নলেজ ইন্ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি,* ফিলোজফি ইস্ট অ্যান্ড অয়েস্ট, ভোল. ২৯, নং- ১, জানুয়ারী, ১৯৭৯, পৃ. ৩-১০, URL: http://www.jstor.org/stable/1398894

৮৫. মোরিয়ামা, শিনয়া, অন সেলফ অ্যাওয়ারনেস ইন্ দি সৌত্রান্তিক এপিসটিমোলজি, *জারনাল অফ্ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি,* ভোল. ৩৮, নং- ৩, স্পেশাল ইসু অন বুদ্ধিস্ট থিয়োরি অফ্ সেলফ অ্যাওয়ারনেস (স্বসংবেদন) : রিসেপশন অ্যান্ড ক্রিটিক, জুন ২০১০, পৃ. ২৬১-২৭৭, URL: https://www.jstor.org/stable/23497709.

৮৬. মুখোপাধ্যায়, পি. কে., *কগনিটিভ অ্যাক্ট, জারনাল অফ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি,* ভোল. ২, ১৯৭৩, পৃ. ১১৫-১৩৭.

৮৭. লেমন, ই. জে., ইফ আই নো, ডু আই নো দ্যাট আই নো ? *এপিস্টিমোলজি, নিউ এসেস ইন্ দি থিয়োরি অফ্ নলেজ,* সম্পা. আভরাম স্ট্রোল, হারপার এন্ড রো, নিউ ইয়োর্ক, ইভানস্টোন এণ্ড লণ্ডন, ১৯৬৭, পৃ. ৫৪-৮২. URL: http://www.jstor.org/stable/2272022.

৮৮. শাও, জে. এল., কগনিশন অফ্ কগনিশন পার্ট- I: পণ্ডিত বিশ্ববন্ধু তর্কতীর্থ ট্রান্সলেটেড ফম বেঙ্গলি উইথ এক্সপ্লেনেটরি নোটস্, *জার্নাল অফ্ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি,* ভোল. ২৪, নং- ২, এপ্রিল ১৯৯৬, পৃ. ১৬৫-২০৭, URL: https://www.jstor.org/stable/23447816.

৮৯. শাও, জে. এল., কগনিশন অফ্ কগনিশন পার্ট- II: পণ্ডিত বিশ্ববন্ধু তর্কতীর্থ ট্রান্সলেটেড ফম বেঙ্গলি উইথ এক্সপ্লেনেটরি নোটস্, *জার্নাল অফ্ ইন্ডিয়ান ফিলোজফি,* ভোল. ২৪, নং- ৩, জুন ১৯৯৬, পৃ. ২৩১-২৬৪, URL: https://www.jstor.org/stable/23448034.